সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

কাঁদো নদী কাঁদো

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক স্তম্ভপ্রতিম কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২–৭১)। 'কল্লোল'–এর ধারাবাহিকতা তাঁর ভিতরে প্রবাহিত, আবার তিনি নতুন বাংলা কথাসাহিত্যেরও এক বলিষ্ঠ উদ্‌গাতা। জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী এই লেখক অগ্রজদের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করেছেন; ক'রে এগিয়ে গিয়েছেন অনেক দূর অবধি। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যেও যে তাঁর উৎসারিত জনধারা প্রবহমাণ, এও তাঁর সৃজনী সচলতার এক সাক্ষ্য। অথচ তাঁর সমগ্র রচনা কতটুকুই–বা : দুইটি গল্পগ্রন্থ, তিনটি উপন্যাস, তিনটি নাটক, কিছু অনুবাদ, অগ্রন্থিত কিছু কবিতা–গল্প–একাঙ্ক–প্রবন্ধ–গ্রন্থালোচনা। এই গল্প ও মহার্ঘ ঐশ্বর্যই তাঁকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক কৃতী পুরুষে পরিণত করেছে, প্রথম আধুনিক বাঙালি–মুসলমান কথাসাহিত্যিক রূপে মহিমা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মীর মশাররফ হোসেন থেকে যে–বাংলা কথাসাহিত্যের ধারা উৎসারিত হয়েছে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তার উত্তরসূরী ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিক হিশেবে, নতুন রীতির নাট্যকার ও গল্পকার হিশেবেও, তাঁর অবস্থান বাংলা সাহিত্যে অমোঘ। মাত্র আটটি গ্রন্থ রচনা করে এই কৃতিত্ব বাংলা কথাসাহিত্যে আর কে অর্জন করেছেন!

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্প–উপন্যাস–নাটকের কেন্দ্রমর্মে আছে 'উন্মুখ প্রবৃত্তি' আর 'মনোভাবের বিশ্লেষণ' (জগদীশ গুপ্তের ভাষায়)। বিংশ শতাব্দীর সূচনামুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে এই বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়। বহির্জগতের রূপায়ণ তো আছে; থাকবেই; তার সঙ্গে যুক্ত হল ব্যক্তি ও সমাজের দোলাচল, ব্যক্তির আরণ্যক অন্তর্ভুবন। আধুনিক কথাসাহিত্য বাস্তবের এই অন্তঃশায়ী তল্–টিকে আবিষ্কার করেছে, 'ভিতরকার মানুষ'–এর অবিরল উন্মোচন তার অভীষ্ট।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

কাঁদো নদী কাঁদো

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

লোকটিকে যখন দেখতে পাই তখন অপরাহ্ণ, হেলে-পড়া সূর্য গা-ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে থাকা অসংখ্য যাত্রীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে দেহতাপে এমনিতে উত্তপ্ত তৃতীয়শ্রেণীকে আরো উত্তপ্ত করে তুলেছে। সে-জন্যে, এবং রোদ-ঝল্‌সানো দিগন্তবিস্তারিত পানি দেখে-দেখে চোখে শ্রান্তি এসেছিল, তন্দ্রার ভাবও দেখা দিয়েছিল। তারপর কখন নিকটে গোল হয়ে বসে তাস খেলায় মগ্ন একদল যাত্রীর মধ্যে কেউ হঠাৎ চিৎকার করে উঠলে তন্দ্রা ভাঙে, দেখি আমাদের স্টিমার প্রশস্ত নদী ছেড়ে একটি সঙ্কীর্ণ নদীতে প্রবেশ করে বাম পাশের তীরের ধার দিয়ে চলেছে। উঁচু খাড়া তীর, তীরের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে ছোট ছোট ছায়া-শীতল চালাঘর, এখানে-সেখানে সুপারিগাছের সারি, পেছনে বিস্তীর্ণ মাঠ, আরো দূরে আবার জনপদের চিহ্ন। সে-সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি এমন সময়ে কী কারণে পাশে দৃষ্টি গেলে সহসা লোকটিকে দেখতে পাই। আগে তাকে দেখি নি; নিঃসন্দেহে এতক্ষণ সে যাত্রী এবং মালপত্রের মধ্যে কেমন নিরাকার হয়ে নিদ্রাভিভূত হয়ে ছিল। বোধহয় সবেমাত্র উঠে বসেছে, ঘুমভারি চোখে এখনো রক্তাক্ত ভাব। তাছাড়া ঈষৎ কৌতূহলভরে চতুর্দিকে যাত্রীদের—যে-যাত্রীদের কেউ কেউ নাসিকাগর্জন সহকারে একনাগাড়ে ঘুমায়, কেউ কেউ মনে কোনো গুপ্ত ভাবনা-চিন্তা নিয়ে কেমন ঝিম্ ধরে বসে হয়তো পথ শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করে, কেউ কেউ আবার শূন্য-চোখে অনির্দিষ্টভাবে সুবৃহৎ পাটাতনের এক প্রান্তে সিঁড়িটা বেয়ে ওপর-নিচ করে—দেখলেও তার দেহভঙ্গিতে সদ্যজাগা মানুষের নিথর ভাব।

লোকটির বয়স চল্লিশের মতো, বা কিছু বেশি, কারণ কানের ওপর চুলে বেশ চাপ দিয়ে পাক ধরেছে। গা-এর রঙটি এমন যে মনে হয় একদা তা ফর্সা ধরনের ছিল কিন্তু আজ জ্বলে-পুড়ে মলিন হয়ে গিয়েছে। তবু চোখে-মুখে কেমন তারুণ্যের নমনীয়তা, সুশীল শান্তভাব। পরনের জামাকাপড় পুরাতন, বহু ব্যবহৃত, তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পাশে খুলে রাখা জুতা জোড়ার গোড়ালি ক্ষয়ে গিয়েছে, একটির অগ্রভাগে মেরামতের চিহ্ন, তাছাড়া দীর্ঘদিনের ব্যবহারের ফলে নিজস্ব আকৃতি হারিয়ে দুটি জুতাই মালিকের ঈষৎ বেঢপ ধরনের পায়ের আকৃতি গ্রহণ করেছে, তবু তাতে কালি-বুরুশের জৌলুশ। নিঃসন্দেহে তার স্বভাব বেশ পরিপাটি ধরনের যার প্রমাণ শুধু দেহবস্ত্রের পরিচ্ছন্নতা বা পাদুকার জৌলুশের মধ্যেই নয়, অনেক কিছুতেই ক্রমশ দেখতে পাই। ঘুমের আমেজটি কাটিয়ে ওঠার পর সহসা সে পকেট থেকে ছোট ধরনের কিছু দাঁত-ভাঙ্গা একটি চিরুনি বের করে আলগোছে কিন্তু ক্ষিপ্রহস্তে চুলটা ঠিক করে, একটু পরে শার্টের গুটানো আস্তিন খুলে আবার সযত্নে কনুইর ওপর পর্যন্ত ভাঁজ করে নেয়, কিছু মুচড়ে-যাওয়া শার্টের কলারটিও সোজা করে, অবশেষে যে-ধবধবে সাদা চাদরের ওপর বসে ছিল সেটি সজোরে হাত দিয়ে ঝেড়ে সাফ করে। তার পরিপাটি স্বভাবে একটু শৌখিনতার স্পর্শও যেন, কারণ শীঘ্র সে পকেট থেকে একটি ফুলতোলা রুমাল বের করে মুখ-চোখ সযত্নে মোছে যদিও এত গরমেও সেখানে ঘামের চিহ্নমাত্র নজরে পড়ে না। এবার তৃপ্ত সন্তুষ্ট হয়ে সে আসন-পিঁড়ে হয়ে বসে উরুর ওপর স্থাপিত পাটি দ্রুতভাবে

নাড়তে শুরু করে। শীঘ্র তার দৃষ্টি আবার ফিরে যায় যাত্রীদের দিকে। তাদের সে এবার ধীরে-সুস্থে কিন্তু তীক্ষ্ণ কৌতূহলের সঙ্গেই নিরীক্ষণ করে, চোখের কোণে ঈষৎ হাসির আভাস।

তারপর লোকটির বিষয়ে বিস্মৃত হয়ে পড়ি, আমার চোখে আবার ঘুমের আমেজ ধরে। অনেকক্ষণ পরে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পাই—নিম্ন শান্ত কণ্ঠ, কিছু সঙ্কোচের আভাস তাতে। চোখ খুলে দেখি, পরিপাটি স্বভাবের লোকটি কিছু বলছে। ধীরে ধীরে, থেমে-থেমেই সে বলে, যেন কি বলবে সে-বিষয়ে মনস্থির করতে পারে নি, শ্রোতাদের সম্বন্ধেও নিশ্চিত নয়। তারপর কখন কী করে কোথায় একটা অদৃশ্য বাধা প্রতিবন্ধক দূর হয়, কী একটা জড়তা কাটে, কণ্ঠস্বর উঁচু না করলেও এবার সে অনর্গলভাবে কথা বলতে শুরু করে। আরো পরে মনে হয় তার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে যা নিঃসৃত হয় তার ওপর সমস্ত শাসন সে হারিয়েছে, কথার ধারা রোধ করার ইচ্ছা থাকলেও রোধ করার কৌশল তার জানা নেই; বস্তুত তার বাক্যস্রোত রীতিমত একটি নদীর ধারায় পরিণত হয়। তবে এমন একটি ধারা যা মৃদুকণ্ঠে কলতান করে কিন্তু বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি করে না, দুর্বারবেগে ছুটে যায় না। সে-ধারা ক্রমশ অজানা মাঠ-প্রান্তর গ্রাম-জনপদ চড়াই-উৎরাই দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। অনেক কিছুই সে বলে, যার কিছু কানে আসে কিছু আসে না, কিছু বুঝতে পারি কিছু পারি না; মনটার ওপর তখন তন্দ্রা উড়ন্ত মেঘের মতো থেকে থেকে ছায়াসম্পাত করছিল। অনেকক্ষণ ধরে সে যেন হরতনপুর নামক একটি অখ্যাত গ্রামের মকসুদ জোলা বলে কোন অজানা মানুষের কথা বলে। লোকটি হতভাগ্য—এমনই হতভাগ্য যে এক বছর যদি বিনা বৃষ্টির দরুন তার ফসল ধ্বংস হয় অন্য বছর ধূলিসাৎ হয় শিলাবৃষ্টিতে, এ-বছর তার বাড়িঘর যদি বন্যায় ভেসে যায় অন্য বছর ভস্মীভূত হয় নিদারুণ অগ্নিকাণ্ডে, যার প্রিয়জন একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যার বিষয় সম্পত্তি হাতছাড়া হয় দুর্বৃত্ত লোকের কারসাজিতে, কাঠ কাটতে গিয়ে কাঠে না পড়ে তার পায়েই কুঠার নেবে আসে নির্মমভাবে, অবশেষে মেঘশূন্য আকাশে বজ্রাঘাতের মতো অকারণেই যেন ভাগ্য-পরাক্রান্ত লোকটি পঙ্গু হয়ে পড়ে। একবার হয়তো চোখ খুলে লোকটির দিকে তাকিয়েছিলাম, কারণ সহসা তন্দ্রাচ্ছন্ন মনে কোথাও কেমন অস্থিরতা দেখা দিয়ে থাকবে; এমন হতভাগ্য মানুষের কাহিনী শুনলে কার মনে অস্থিরতা না জাগে? লোকটির ধীর-স্থির কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, তারপর তার শান্ত মুখ, চোখের কোণে ঈষৎ হাসিটি—এসবও নজরে পড়ে, কিছু আশ্বস্ত হই। তবে তখন লোকটি কী কারণে কামারান এবং কাতবিয়ান নামক যে-ফেরেশতা দুটি মানুষের স্কন্ধে বসে তার সুকাজ-কুকাজ লিপিবদ্ধ করে তাদের কথা বলতে শুরু করেছে। তার বর্ণনায় ফেরেশতা দুটির একজন সুপরিচিত হিসাব-নবিশের চেহারা ধারণ করে—বক্র-মেরুদণ্ড শীর্ণদেহ কুটিলমনা কদাকার লোক, কানের পশ্চাতে আধা-খাওয়া বিড়ি, চোখে গোলাকার ঘোলাটে চশমা যার মধ্যে দিয়ে নয়, ওপর বা নিচে দিয়েই কখনো-কখনো সে দুনিয়াটি নিরীক্ষণ করে থাকে। সে কি কাতবিয়ান না কামারান? তন্দ্রাচ্ছন্ন মন বৃথা উত্তর সন্ধান করে। হয়তো অবশেষে আমার মনে দুজনেই হিসাব-নবিশের চেহারা ধারণ করে এবং পরে কী যাদুমন্ত্রে অর্শরোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শুধু যখন আবার ক্ষণকালের জন্যে জেগে উঠি তখন বুঝতে পারি লোকটি মকসুদ নামক হতভাগ্য জোলার বা কামারান-কাতবিয়ান নামক ফেরেশতা দুটির কথা নয়, কী দুর্বোধ্য কারণে অর্শরোগের কথা পেড়েছে। কণ্ঠস্বর পূর্ববৎ অনুচ্চ, ঈষৎ হাসিটি তেমনি চোখের প্রান্তে খেলা করে, কিন্তু অর্শরোগের বিস্তারিত বর্ণনা এবং ভুক্তভোগী কয়েকজন রোগীর নিদারুণ যন্ত্রণার বিশদ বিবরণ দিয়ে ততক্ষণে সে শ্রোতাদের মুখ ফ্যাকাসে করে তুলেছে, শ্রোতারা যেন তাদের দেহেরই বিশেষ অঞ্চলে স্ফীত-হয়ে-ওঠা কোনো শিরার অকথ্য বেদনা অনুভব করতে শুরু করেছে।

তারপর হয়তো কিছুক্ষণ তার কথা শুনি নি, হয়তো সে নীরব হয়ে পড়েছিল। তবে নিশ্চয় বেশিক্ষণের জন্যে নয়। এবার তার কণ্ঠস্বর আমার অর্ধঘুমন্ত কানে এসে পৌঁছালে তা

BanglaBook.org

গুঞ্জনের মতো শোনায়, যে-গুঞ্জনে ঈষৎ রহস্যের ভাব, একটু গাম্ভীর্যের আভাস। মনে হয় সে যেন জিজ্ঞাসা করছে কোথা থেকে মানুষ আসে, কোথায় সে ফিরে যায়। শ্রোতাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই না, পরে দূরে কোথাও একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর কান্নার আওয়াজ জেগে উঠলে তাতে লোকটির গলার শব্দও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ততক্ষণে দিগন্তে হেলে-পড়া সূর্যের ওপর মেঘ উঠেছে, কিছু শীতল হাওয়াও বইতে শুরু করেছে, এবং মুখে-চোখে সে-শীতল হাওয়া এসে লাগলে তন্দ্রার ভাবটা বেশ জমে উঠে থাকবে। হাওয়া দেখতে-না-দেখতে প্রবল হয়ে ওঠে এবং আঘাতে ছাদের প্রান্তে গুটানো তেরপলের ঝুলে-পড়া একটি অংশ সশব্দে দুলতে থাকে। কখনো সে-শব্দ, কখনো লোকটির ধীর-মন্থর কণ্ঠস্বর ঢেউয়ের মতো কানে এসে বাজে। তবে আবার তার কণ্ঠস্বর কানে এসে পৌঁছালে বিস্মিত হই, কারণ ছালাম মিঞা নামক জোতদারটির সঙ্গে দর্শনমূলক বিষয়টির যোগসূত্র ঠিক বুঝতে পারি না। যে-টুকু বুঝতে সক্ষম হই তা এই যে, জোতদারটি বড় উদ্যোগ আয়োজন করে বহুদিনের বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়েছিল মক্কা দেশে কিন্তু কোনো কারণে কাবাশরীফে পৌঁছে আচম্বিতে অন্ধ হয়ে পড়ে। কেন? সে কি ঘোর গুনাহ্‌গারি যে-গুনাহ্‌র মাফ নেই? শীঘ্র একটি কান্না শুনতে পাই। কান্না নয়, আর্তনাদ। হয়তো জোতদারটিই আর্তনাদ করে। হঠাৎ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়া মানুষটির অন্তরে যে-প্রগাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে দিশেহারাভাবে সে হয়তো পথ সন্ধান করছে, একটু আলো খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোথাও পথ বা আলো দেখতে পাচ্ছে না। জোতদার আর্তনাদ করে চলে, যে-আর্তনাদ অতল কোনো গহ্বর থেকে উঠে এসে অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে : অন্ধকার অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

হয়তো সে-অন্ধকারেই আমার শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয় বলে হঠাৎ জেগে উঠি। তখন সূর্যের ওপর থেকে মেঘ সরে গিয়েছে, গুমোট গরমটা আবার অসহ্য রূপ গ্রহণ করেছে। সে-গরম যেন শুধু বাইরে নয়, মানুষের বস্ত্রের ভাঁজে-ভাঁজেও আশ্রয় নিয়েছে, অসংখ্য পিপীলিকার মতো তার দেহ বেয়ে ওঠা-নাবা করছে। দূরে কোথাও আবার একটি শিশু কাঁদে। তখন তার কান্নাই কি ছালাম মিঞা নামক জোতদারের আর্তনাদে পরিণত হয়েছিল? শিশুটি, এবং তার ঘোমটা দেয়া অল্পবয়স্কা মাকে দেখতে পাই। রেলিং থেকে অনেক দূরে হলেও যেখানে শিশুকোলে মেয়েলোকটি বসেছিল সেখান পর্যন্ত শেষ-অপরাহ্ণের সূর্য এসে পৌঁছেছে। রোদের দিকে পিঠ দিয়ে কোলের শিশুটির জন্যে ছায়া সৃষ্টি করে মেয়েটি নত মাথায় মূর্তিবৎ নিশ্চল হয়ে বসে।

লোকটি তখনো থামে নি। সে কি জোতদার মানুষটির কাহিনী শেষ করে নি? তারপর কী হয়েছিল তার? তার গুনাহ্‌ কি মাফ হয়েছিল, সে কি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল? কয়েক মুহূর্ত কান পেতে শোনার পর বুঝতে পারি ছালাম মিঞা নামক জোতদারের কাহিনী নয়, বড় কৌতূহলী ধরনের অন্য কোনো মানুষের কথা বলছে সে, এবং তার নাম-ধাম-সাকিনের খবর জানা সম্ভব না হলেও আরেকটু শোনার পর সন্দেহ থাকে না যে কৌতূহলী লোকটি সে নিজেই : অবশেষে সে নিজের কথা বলতে শুরু করেছে। কী কারণে আমার ঘুমতন্দ্রা এবার সম্পূর্ণভাবেই কাটে, চোখ-মন স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে ওঠে, লোকটির কণ্ঠস্বরও এবার পরিষ্কারভাবে শুনতে পাই।

"ছোটবেলায় নাম পড়েছিল পেঁচা। লোকেরা পেঁচা বলত।" শ্রোতাদের দৃষ্টি তার খুদে ধরনের চোখের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে দেখে সে আবার বলে, "না, চোখের জন্যে নয়, স্বভাবের জন্যে।"

পূর্ববৎ নিম্নকণ্ঠে, হয়তো-বা ঈষৎ লজ্জিতভাবে লোকটি তার কৌতূহলী স্বভাবের কথা বলে। ছোটবেলাতেই লোকটির মধ্যে কৌতূহলটা দেখা দিয়েছিল। তার সমবয়সী ছেলেরা যখন মাঠে-মাঠে খেলা করে গৃহস্থের বাড়ির ফলমূল চুরি করে নদী-পুকুরে সাঁতার কেটে সময় কাটাত তখন সে সবকিছু ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষের জীবনযাত্রা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখত।

BanglaBook.org

সে-সময়ে কত দেউড়ি-খিড়কির পথ দিয়ে সে যে ছায়ার মতো আসা-যাওয়া করেছে, এ-বাড়ি সে-বাড়ি গিয়ে কত নরনারীর দৈনন্দিন জীবন-নাটকে মশগুল হয়ে সময় কাটিয়েছে—তার ইয়ত্তা নেই। সে-জন্যেই চক্ষুসর্বস্ব নিশাচর পাখির নাম পেয়েছিল।

বিচিত্র নেশাটি শুরু হয় এক ভরা গ্রীষ্মে। হয়তো কাঠ-ফাটানো জ্যৈষ্ঠ মাস। তখনো সে বেশ ছোট, বোধহয় পাঁচে, বড়জোর ছয়ে পড়েছে। এ-সময়ে সহসা একটি প্রতিবেশী গৃহস্থের বাড়ির উঠানে প্রতি দুপুরে নিয়মিতভাবে হাজির হতে শুরু করে। সে-বাড়িতে কী যে তাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করত আজ তার মনে নেই, তবে খুব সম্ভব আকর্ষণের বিশেষ কোনো কারণ ছিল না। তাছাড়া যতদূর মনে পড়ে, সে-বাড়ির সাংসারিক কাজকর্মে আত্মমগ্ন মেয়ে-পুরুষেরা তার চোখের সামনে যে-চলচ্চিত্র সৃষ্টি করত সে-চলচ্চিত্রে না ছিল কোনো নায়ক বা নায়িকা, না কোনো কাহিনী। ঢেঁকিশালে ধানভানা, দাওয়ায় চুলবিনুনির পালা, পেছনের পুকুর থেকে সিক্তবসনে মেয়েদের প্রত্যাবর্তন, রান্না-ঘরের সামনে কুলা দিয়ে চাল-ঝাড়ার পর্ব, স্বল্পভাষী পুরুষদের আনাগোনা বা অটুট গাম্ভীর্যে জমাট হয়ে বসে ধূমপান করা—এ-সব গতানুগতিক দৃশ্যই তার কচি মনে মায়াজাল সৃষ্টি করত, নিত্য একই দৃশ্য দেখে তার সাধ মিটত না, মোহ ভাঙত না। আরো পরে, যখন কিছু বুদ্ধি হয়েছে, বুঝবার ক্ষমতা পেয়েছে, তখন পুনঃকৃত প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যে সে বৃহত্তর কিছু আবিষ্কার করে। সে-দিন থেকে বুঝতে পারে যে-মেয়েমানুষ সকালের দিকে উঠানে বসে চাল ঝাড়ে বা যে-লোক নির্দিষ্ট সময়ে ছাতা মাথায় বাজার অভিমুখে রওনা হয় সে-মেয়েমানুষ বা সে-লোক প্রতিদিন একই কাজ করেও সমগ্র জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একটি সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী রচনা করে, পদে-পদে, তিলে-তিলে। সে-দিন থেকে তার পেঁচা-চোখে আর পলক পড়ে নি।

তবু বহুদিন ধরে সে যেন কেবল দর্শকই ছিল—যে-দর্শক দেখে কিন্তু কিছু অনুভব করে না, যা দেখে তার অর্থ বুঝলেও সে-অর্থ তার হৃদয় স্পর্শ করে না, সহসা চোখে অশ্রুর আভাস দেখা দিলেও সে-অশ্রু চোখ থেকেই নাবে অন্তর থেকে উঠে আসে না। নূতন বধূটির ব্যথায় অকস্মাৎ তার চোখে পানি আসার কথা এখনো তার মনে পড়ে।

দুদু মিঞার বাড়িতে নূতন বউ এসেছে শুনতে পেয়ে সেখানে উপস্থিত হতে তার দেরি হয় নি। টকটকে লাল শাড়ি পরে নূতন বউ সুদৃশ্য একটি চাটাইর ওপর বসে ছিল, মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা, গায়ে অলঙ্কার, হাতে-পায়ে মেহেদি। প্রথমে দূর থেকে তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে, কখনো কখনো তার উজ্জ্বল লাল শাড়ি লেলিহান শিখার মতো আচমকা জেগে উঠে তার চোখে ধাঁধা লাগায়। পরে নিকটে এসে মাথা নিচু করে ঘোমটা-ঢাকা মুখের দিকে তাকায়। সে-সময়ে তার চোখে পানি দেখতে পায় : চোখ-মুখ নিথর, গাল বেয়ে বধূ ব্যথায় নিঃশব্দ অশ্রুধারা নেবে আসছে। কৌতূহলী দৃষ্টি সম্বন্ধে সজ্ঞান হলে নূতন বউ হঠাৎ লজ্জিত হয়ে ভেঙচি কাটে। তার মুখ-ভেঙচানিতে সে বিব্রত বোধ করে নি, তবে তার চোখে-গালের অশ্রুধারার দিকে তাকিয়ে তার চোখও সহসা অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। অজানা মেয়েটির দুঃখে সে যে বুকে কোথাও ব্যথা বোধ করেছিল তা নয়, মেয়েটির চোখের অশ্রু পুষ্পরেণুর মতো অদৃশ্যভাবে ভেসে এসে তার চোখ ভিজিয়ে দিয়েছিল কেবল। সে-অশ্রু চোখেরই অশ্রু, হৃদয়ের অশ্রু নয়; হৃদয়ের অশ্রু দেখা দিতে সময় লাগে।

এমনি অনেক বাড়ির উঠানে দাওয়ায় অন্দরমহলে দাঁড়িয়ে বা খাটুমালা হয়ে বসে পেঁচা-চোখ মেলে সে সময় কাটাত, নিঃশব্দে, ছায়ার মতো। কোনো বাড়িতে এন্তেকাল ঘটলে ক্রন্দনরত শোকাকুল পরিবারের অজান্তে অলক্ষিতে সে যেমন সেখানে উপস্থিত হত তেমনি কোথাও নবজাত শিশু আকস্মিক কান্নার সাহায্যে তার আগমন-বার্তা ঘোষণা করতেই তার সান্নিধ্যে হাজির হত। সে দেখত, শুনত—কিছুই তার চোখ-কান এড়াত না। দেখে-দেখে শুনে-শুনে এক সময়ে মানুষের জীবন সম্বন্ধে এমনই পারদর্শী হয়ে পড়ে যে দূর থেকে কেবল মুখভঙ্গি দেখেই বলতে পারত কে ধানের কথা বলছে কে-বা বলছে খাজনার কথা।

BanglaBook.org

বাল্যকালের সে-কৌতূহল বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে কমে না গিয়ে দিন-দিন বেড়েই চলে। তবে যা বাল্যকালে সম্ভব, পরে সম্ভব নয়; বড় হয়ে উঠলে পেঁচা-চোখ লোকেরা সহ্য করে না। তাই ধীরে ধীরে সে নানাপ্রকার ছলনা-কৌশলের শরণাপন্ন হয়, এবং কীভাবে আলগোছে-অলক্ষিতে মানুষের অন্তরের গভীরতম কক্ষে প্রবেশ করে কেউ কিছু সন্দেহ করার আগেই যা জানবার তা জেনে নিতে হয়—এ-সব কায়দা শিখে নেয়। না নিয়ে উপায় কী? ততদিনে কৌতূহলটি নেশার মতো পেয়ে বসেছে তাকে।

"সে-জন্যেই জীবনে কিছু হয় নি। পরের জীবনের দিকে তাকিয়ে দিন কাটিয়েছি, নিজের জীবনের কথা ভাবার সময় হয়ে ওঠে নি।" হঠাৎ একটু আফসোসের সঙ্গেই যেন লোকটি বলে।

বাল্যকালে সে মেধাবী ছাত্র ছিল। বর্ষান্তের পরীক্ষায় প্রতিবছর প্রথম স্থান দখল করত, প্রাইজ-পুরস্কার পেত। তার পেশকার বাপ আশা করেছিল ছেলে যথাসময়ে ক্ষুদ্র মফস্বল শহরের সঙ্কীর্ণ সীমানা অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় উপস্থিত হবে, পরে জজ-হাকিম বা উকিল-ডাক্তার হবে। বাপের প্রতি আদর্শ-বাধ্যতা প্রদর্শন করে স্টিমারে সওয়ার হয়ে একদিন উচ্চশিক্ষার্থে অন্যত্র গিয়েছিলও, কিন্তু উচ্চাশার অভাবেই হোক, নিজের ক্ষুদ্র শহরের জীবনধারা থেকে বেশিদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সম্ভব হয় নি বলেই হোক, স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে তার দেরি লাগে নি। বাপকে নয়, বন্ধুবান্ধবকে বলেছিল : গাঁদা-ফুল গাঁদা-ফুলই হয়ে থাকবে, গোলাপ ফুল হবে না কখনো। এই বলে পূর্ণ উদ্যমে তার সুপরিচিত জীবনযাত্রায় আবার পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, কোনো ক্ষোভ-মনস্তাপ অনুভব করেছিল কিনা সন্দেহ। তবে মানুষকে জীবিকার ব্যবস্থা করতে হয়। তাই বাপের মৃত্যু ঘটলে কিছু তদবির করে প্রথমে স্থানীয় স্টিমারঘাটে টিকেট-কেরানির পদে নিযুক্ত হয়, পরে স্টিমারঘাট বন্ধ হলে কাছারি-আদালতেই ছোটখাটো একটি কলম-ঠেসার কাজ নিয়ে নেয়। বলতে গেলে শ্রদ্ধেয় জন্মদাতার পদাঙ্কানুসরণই করে; তাতে খেদ-দুঃখের কিছু সে দেখতে পায় না। স্টিমারঘাটে চাকুরি নিয়ে একটি বিয়েও করে নিয়েছিল। বউ-এর সন্ধানে নদী পাড়ি দিয়ে হাসনাতপুর নামক একটি গ্রামে চলে গিয়েছিল; হয়তো তার ক্ষুদ্র শহরের সব ঘরের খবর-বৃত্তান্ত তার জানা ছিল বলে বউ খুঁজতে অন্যত্র যাওয়া তার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল। তবে তার মনে পড়ে, বিয়ে করতে যাবার সময়ে একটি কথা বুঝতে পেরে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। সেটি এই যে, বয়ঃপ্রাপ্তির পর যে-সব বাড়ির অন্দরমহলে তার গতিবিধি বন্ধ হয়ে পড়েছিল সে-সব অস্পষ্ট-হয়ে-ওঠা অন্দরমহলের অভ্যন্তর তার স্ত্রীর দৃষ্টির সাহায্যে আবার পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে। তখন বউ সুন্দরী হবে কিনা তা নয়, তার সঙ্গে মন মিলবে কিনা—এই চিন্তায় সে বড় অধীর হয়ে পড়ে। তার চিন্তা দূর হয় তখন যখন সে দেখতে পায় একজোড়া সপ্রতিভ কৌতুকোজ্জ্বল চোখ যে-চোখে নিমিষেই হাসি জেগে ওঠে; সলজ্জ অপ্রস্তুত হাসি নয়, মন-খোলা হাসি, যেন ঘোমটা তোলার রসমটি পুরানো বন্ধুর মধ্যে লুকোচুরির খেলা মাত্র। তখনই বুঝেছিল বউ-এর সঙ্গে মন মিলবে। তারপর সব ভালো লেগেছিল। হয়তো প্রচলিত রেওয়াজ একেবারে উপেক্ষা করা উচিত হবে না মনে করে স্ত্রী যখন মান-অভিমানের খেলা করেছিল তখন তাও ভালো লেগেছিল। একবার মনের মিল হলে মান-অভিমানের পালা ফলবৃক্ষে ফলের ওপর ফুলের বাহারের মতো, সুন্দরী নারীর দেহে মণিমুক্তার বিচ্ছুরণের মতো, অপরূপ সূর্যাস্তের সময়ে রঙধনুর বর্ণশোভার মতো উপরিলভ্য; সে-সব ফাউ।

লোকটির কথা মন দিয়ে শুনছিলাম। একবার মনে হয়, তার কথা আমার স্মৃতির পর্দায় কোথায় যেন ঈষৎ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তবে ধারণাটির কোনো যথার্থ কারণ দেখতে না পেলে ভাবি, অন্যের জীবন সম্বন্ধে গভীরভাবে কৌতূহলী মানুষের প্রতি আমি কি বরাবর কেমন একটা

BanglaBook.org

আকর্ষণ বোধ করি না? তেমন মানুষ নিয়ে কত প্রশ্ন জাগে মনে : এই কৌতূহলের পশ্চাতে কী, মানুষের জীবনে কী তারা সন্ধান করে, এবং অবশেষে কীই-বা খুঁজে পায়? নিরন্তর মানুষের মনে নিরাশা দেখে তাদের কৌতূহল কি বালুচরে হারিয়ে-যাওয়া নদীর মতো সহসা অদৃশ্য হয়ে যায় না, মানুষের কুচিন্তা-কুকাজের প্রভূত প্রমাণে তাদের মনে কি অবশেষে একটি গভীর বিতৃষ্ণা জাগে না? কখনো-কখনো সহজ এবং সম্ভবত সত্য উত্তরটিই গ্রহণ করি। অন্য মানুষের মনের কথা জানা কিছুতেই সম্ভব নয় তা সন্ধানকারী যতই কৌশলী-কারসাজিবাজ হোক না কেন, এবং যারা জানে বলে দাবি করে তারা বড়াই করে কেবল। সে-জন্যেই মানুষের মধ্যে সমাজের মধ্যে তারা সুস্থ মনে বসবাস করতে পারে, নিশ্চিন্ত মনে রাতে ঘুমাতে পারে, হাসতে পারে, বন্ধুত্ব করতে পারে অন্যের সঙ্গে।

লোকটিও বড়াই করে থাকবে—এ-বিশ্বাস সত্ত্বেও সে কী বলছে তা শুনবার জন্যে আবার সকর্ণ হয়েছি এমন সময়ে বুঝতে পারি সমগ্র স্টিমারময় কেমন নীরবতা নেবেছে। তখন সূর্যাস্ত শুরু হয়েছে। যারা স্টিমারযোগে নিয়মিতভাবে ভ্রমণ করে তারা জানে এ-সময়ে যাত্রীদের মধ্যে তাদের অজান্তেই নীরবতা নেবে আসে, যে-নীরবতার মধ্যে এবার স্টিমারের ঘূর্ণ্যমান মস্ত পাখা দুটির, সে-পাখা দুটির নির্মম আঘাতে ক্ষতবিক্ষত পানির, এবং নিচে জীবন্ত ইঞ্জিনের আওয়াজ হঠাৎ সুস্পষ্টভাবে শোনা যায়। যাত্রীরা সহসা নীরব হয়ে গিয়ে সে-সব আওয়াজ শোনে যেন তা আগে শোনে নি। এ-সময়ে যাত্রীরা স্টিমারের দেহের স্পন্দন এবং গতি সম্বন্ধেও যেন সর্বপ্রথম সজ্ঞান হয়, তারপর তাদের দৃষ্টি যায় দূরে তীরের দিকে দিগন্তের দিকে ম্লান নিষ্প্রভ আকাশের দিকে; উন্মুক্ত আকাশের তলে দিন-রাতের সন্ধিক্ষণে যে-বিচিত্র অসীমতা প্রকাশ পায় তারই স্পর্শে তারা বিমূঢ় হয়ে পড়ে। নীরবতা আরো ঘনীভূত হয়। এবার শুধু নিকটের পানির গর্জন নয়, দূরে যে-ঢেউ দীর্ঘশ্বাসের মতো অস্ফুট শব্দ করে ছড়িয়ে পড়ে তার ক্ষীণ শব্দও শুনতে পায়, আরো দূরের ঢেউ—যে-ঢেউ-এর শব্দ শোনা যায় না—সে ঢেউ সহসা দৃষ্টিগোচর হয়, হয়তো-বা ছায়াচ্ছন্ন আকাশে দৃষ্টিহীনভাবে উড়তে থাকা পথ-হারা কোনো পাখিও নজরে পড়ে।

তবে শীঘ্র বুঝতে পারি, শুধু সূর্যাস্তের জন্যে নয়, মাঝ-নদীতে স্টিমারটি হঠাৎ ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে বলেও যেন যাত্রীরা নীরব হয়ে পড়েছে। এ-স্থানে নদীর গভীরতা বেশ কম হবে। স্টিমারটি কিছুক্ষণ গভীরতা মেপে মেপে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, তারপর থেমেই পড়ে, যেন আর এগুতে সাহস হয় না। স্টিমারটি আবার যখন চলতে শুরু করে তখন বেশ সাবধানতার সঙ্গে চলে, কখনো এদিক-ওদিক মোড় নিয়ে, কখনো একটু পশ্চাতে হটে, কখনো-বা পুনরায় অল্প সময়ের জন্যে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে ক্রমান্বয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, যে-অন্ধকারে তেরপলের ঝুলে-পড়া অংশটি সশব্দে আন্দোলিত করে আবার প্রবলবেগে হাওয়া ছুটতে শুরু করে।

একবার লোকটির দিকে দৃষ্টি দেই। ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছি যে বেশিক্ষণ নীরব হয়ে থাকা তার পক্ষে সহজ নয়; কী সে বলে কেনই-বা বলে—তা নিজেও সব সময়ে না বুঝলেও তাকে কথা বলতেই হয়, না বললে হয়তো কেমন নিঃসহায় এবং নিরস্ত্র বোধ করে। কিন্তু এখন সে-লোকের মুখে কথা নেই। মনে হয় গভীর মনোযোগ-সহকারে স্টিমারের সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও নিরাপদ পথ খুঁজছে, অনেকটা রুদ্ধশ্বাসে। তার চোখের হাসিটি মিলিয়ে গিয়েছে, দৃষ্টি নদীর দিকে, হাসিশূন্য কথাশূন্য মুখে অপেক্ষার, কিছু আশঙ্কার ভাব।

অবশেষে স্টিমারটি বিপদজনক অঞ্চলটি নিরাপদে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। তেজ বাড়িয়ে স্টিমার পূর্ণোদ্যমে চলতে শুরু করলে মুক্তি-পাওয়ার আনন্দেই যেন তার সমগ্র দেহ কাঁপতে শুরু করে থরথর করে; তার চতুষ্পার্শ্বে পানির গর্জন আর্তনাদের মতো নয়, শৃঙ্খলমুক্ত প্রাণীর উল্লাসধ্বনির মতো শোনায়। যাত্রীদের মধ্যে আবার গুঞ্জন জাগে। সামনের ঘাট আর দূরে নয়।

BanglaBook.org

লোকটি আরো কয়েকমুহূর্ত নীরব হয়ে থাকে। তারপর সহসা সে একটি শহরের নাম নেয় যে-নাম শুনে প্রথমে চমকিত হই, তারপর এ-কথা বুঝতে পারি যে তখন স্মৃতির পর্দায় অকারণে দোলা লাগে নি। তবে লোকটি কি তবারক ভুইঞা? তাকে কখনো স্বচক্ষে দেখি নি, কিন্তু সহসা কেমন নিঃসন্দেহ হয়ে পড়ি যে সে তবারক ভুইঞাই হবে। সে-বিষয়ে নিশ্চিত হলে মনে-মনে বড় উত্তেজিত হয়ে পড়ি, একটি মানুষের স্মৃতি অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সহসা। স্মৃতি নয়, একটি ভার, যে-ভার এত বছরেও হাল্কা হয় নি। উত্তেজিত হয়ে ভাবি : তবে লোকটির মুখে মুহাম্মদ মুস্তফার কথা শুনতে পাব কি? আমি জানি মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে লোকটির পরিচয় হয়েছিল। শুধু তাই নয়; যে-বিচিত্র দ্বন্দ্বে সে-সময় মুহাম্মদ মুস্তফা সমগ্র মনে-প্রাণে নিপীড়িত হয়েছিল সে-দ্বন্দ্বের কথা এবং সে-দ্বন্দ্বের কারণের কথাও জানতে পেরেছিল। তখন শিক্ষানবিশী শেষ হবার পর মুহাম্মদ মুস্তফা সবেমাত্র সে-শহরে ছোট হাকিমের পদে নিযুক্ত হয়েছে এবং তবারক ভুইঞা সে-শহরেরই স্টিমারঘাটে টিকেট-কেরানির কাজ করত। কীভাবে তবারক ভুইঞা মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে পরিচয় করে নিয়েছিল জানি না, তবে তবারক ভুইঞার মতো লোকের পক্ষে কাজটি তেমন কিছু কঠিন নয়। প্রথমে পরিচয়, তারপর একরকম ঘনিষ্ঠতার মতো। হয়তো ঘনিষ্ঠতা কথাটা ঠিক নয়, কারণ যাদের সঙ্গে সমানে-সমানে মেলামেশা করা যায় না, পদমর্যাদায় যারা তার চেয়ে উঁচু স্থান রাখে, তাদের সঙ্গে হয়তো সে ভাবমিতালি করে না, ভাবমিতালির প্রয়োজনও বোধ করে না। তবে তেমন কোনো লোকের নিকটবর্তী হবার প্রয়োজন বোধ করলে সে কেবল আলগোছে কোথাও একটি দেউড়ি পেরিয়ে যায় যার পর সে-লোকটির অন্তরের গভীরতম অঞ্চলেও দৃষ্টি দিতে আর বাধে না, এবং সহসা তার সান্নিধ্য সম্বন্ধে লোকটি যদি সচেতন হয়ে কেমন আশঙ্কিত হয়ে পড়ে তখন তার দিকে একবার দৃষ্টি দিলে আবার আশ্বস্ত হতে দেরি হয় না। মুহাম্মদ মুস্তফাও অবিলম্বে আশ্বস্ত হয়েছিল। অল্পবয়স্ক টিকেট-কেরানির দিকে তাকালে সে দেখতে পায়, বিশ্বস্ততার আদর্শ চিরশ্রদ্ধ মানুষটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় নি, তার চোখের অন্তরস্পর্শী সরলতায়, মুখের নিরীহ ভাবে থুতনির পরিচ্ছন্ন রেখাতে বা নিত্যকার সজ্জনতায় কোনো কিছুতেই তারতম্য ঘটে নি, তাছাড়া এত কাছে বসেও সে যেন অনেক দূরে, এমনকি সে যে কিছু শুনছে তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না; বস্তুত সে এমনই মানুষ যার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা যায় যদিও কী কারণে নির্ভর করা যায় তা বলা মুশকিল। তবু সে ভয়ানক জ্বরে না পড়লে হয়তো তবারক ভুইঞা কথাটা জানতে পারত না।

অকস্মাৎ মুহাম্মদ মুস্তফার প্রবল জ্বর শুরু হয়। তবারক ভুইঞা পূর্ণ উদ্যমে জ্বরাক্রান্ত নিঃসঙ্গ মুহাম্মদ মুস্তফার সেবা-শুশ্রূষায় লেগে যায়। একদিন রাতে মুহাম্মদ মুস্তফা দেখতে পায় তবারক ভুইঞা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সহসা সে একটি কণ্ঠস্বরও শুনতে পায়। তবে সে বুঝতে পারে, কণ্ঠস্বরটি তবারক ভুইঞার নয়, নিজেরই কণ্ঠস্বর। অকারণেই সে যেন চমকিত হয়ে পড়ে, অকারণে এ-জন্যে যে নিজের কণ্ঠস্বর শুনলে চমকিত হবার কোনো যথার্থ কারণ নেই। তারপর ঘরময় সহসা নীরবতা নাবে। অনেকক্ষণ সে-নীরবতা জমাট হয়ে থাকে, যে-নীরবতার মধ্যে বাইরে কোথাও বিদ্যুৎগতিতে চক্কর দিতে থাকা একটি বাদুড়ের আবির্ভাব হলে সে-বাদুড়ের শব্দ, পরে দূরে কোথাও একটি বিড়াল-ছানা ক্ষীণ-কাতর কণ্ঠে কাঁদতে শুরু করলে সে-কান্নার শব্দ—এ সব উচ্চরব ধারণ করে। তবারক ভুইঞা কেমন চঞ্চল হয়ে একবার হাত-পাখাটি তুলে নেয়, পরক্ষণে রোগীর তৃষ্ণা পেয়ে থাকবে ভেবে পুঁতি-ঝোলানো জালি দিয়ে ঢাকা পানির গেলাসটি ওঠায়। জালিটা তার বউ-এর হাতের কাজ, দুদিন হল মুহাম্মদ মুস্তফাকে এনে দিয়েছে। "থাক পানি।" মুহাম্মদ মুস্তফা বলেছিল। ততক্ষণে সে বুঝে নিয়েছে, শ্যাওলাপড়া ডোবার মতো ক্ষুদ্র পুকুরে খোদেজার মৃত্যুর কথা তবারক ভুইঞা বলে ফেলেছে। এবার সে অপেক্ষা করে। তার বিশ্বাস হয় তবারক ভুইঞা বলবে : মেয়েমানুষেরা কত আজে-বাজে কথা বলে। অবশেষে লণ্ঠনের তেজ কমিয়ে

BanglaBook.org

তবারক ভুইঞা বলেছিল, "ওসব কথা এখন ভাববেন না।"

তবারক ভুইঞা চলে যাবার পর মুহাম্মদ মুস্তফা কিছুক্ষণ নিথর হয়ে থাকে। জ্বর কমে নি, কিন্তু মাথাটি কেমন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। প্রথমে সে একটু লজ্জা বোধ করে। তার মনে হয় সে যেন জ্বরের অজুহাতেই শ্যাওলা-আবৃত ডোবার মতো পুকুরে যে-ঘটনা ঘটেছিল সে-ঘটনার কথা তবারক ভুইঞাকে বলেছে। লজ্জার সঙ্গে-সঙ্গে কিছু স্বস্তিও যেন পায়। হয়তো কথাটি কাউকে বলতেই হত। তাছাড়া, তবারক ভুইঞা লোকটি যেন ভালো, বিশ্বাসী, এবং বয়স তেমন না হলেও কেমন সমঝদার, দরদবানও, তাকে বলায় কোনো ক্ষতি নেই। তবে একটি কথায় মনটা কেমন খচখচ করে। সে তবারক ভুইঞাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কথাটি বিশ্বাসযোগ্য কিনা। তবারক ভুইঞা হাঁ-না কিছু বলে নি, কোনো মতও প্রকাশ করে নি। তবারক ভুইঞার প্রতিক্রিয়াটি ঠিক বুঝতে পারে না। অথচ সব কথাই সে যেন তাকে বলেছে, কিছুই ঢাকে নি।

মনের অধীরতা চেপে আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, কারণ জলাপাড়া নামক একটি ঘাটে স্টিমার থামলে লোকটি যাত্রীদের ওঠা-নাবায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তবে তেমন ওঠা-নাবা যে হয় তা নয়; ঘাটটি ছোটখাটো ধরনের হবে। সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে কয়েকজন যাত্রী অদৃশ্য হয়ে যায়, সে-অন্ধকার থেকে আবার কয়েকজন নূতন যাত্রী স্বল্পালোকিত স্টিমারের পাটাতনে মূর্তিমান হয়।

স্টিমারটি পুনরায় মাঝ-নদীতে এসে পথ ধরেছে এমন সময়ে লোকটি কুমুরডাঙ্গা নামক ক্ষুদ্র একটি শহরের কথা বলতে শুরু করে; জলাপাড়া ঘাটের আগে স্টিমার যখন নদীর অগভীর স্থানটি সন্তর্পণে পার হয়ে আবার পূর্ণবেগে চলতে শুরু করেছে তখন সে-শহরের নামই লোকটির মুখে শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিলাম; সে-শহরে মুহাম্মদ মুস্তফা ছোট হাকিমের পদে নিযুক্ত হয়েছিল। লোকটি বলে : অনেক মহকুমা শহর ক্ষুদ্র হয় কিন্তু কোনোটাই হয়তো কুমুরডাঙ্গার মতো ভাগ্যহীন নয়। জলাপাড়া ঘাটের আগে নদী যেমন অগভীর হয়ে উঠেছে তেমনি সে-শহরের পাশে দিয়ে প্রবাহিত বাকাল নদীটি একদিন অগভীর হয়ে ওঠে শহরবাসীদের অজান্তেই এবং তারপর স্টিমার চলাচলের জন্যে অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কুমুরডাঙ্গা শহর এমনই এক অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে রেলগাড়ির মতো লৌহদানব তো দূরের কথা, তেমন একটি সড়কও কল্পনাতীত যে-সড়ক বর্ষাকালে তলিয়ে যাবে না, বৃষ্টিতে ভেসে যাবে না। নদী-খাল-বিল এবং বিস্তীর্ণ জলাভূমি পরিবেষ্টিত শহরটির জন্যে দ্রুত যানবাহন হিসেবে যে-স্টিমার ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না সে-স্টিমারও বন্ধ হয়ে যায়। শহরের আর্থিক অবস্থা এমনিতে ভালো ছিল না। তার সমৃদ্ধি শুধু যে স্তব্ধ হয়েছিল তা নয়, দিন-দিন অবনতির দিকেই যাচ্ছিল। অনেকদিন ধরে ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘুণ ধরেছিল, উকিল-মোক্তার, হেকিম-ডাক্তারের তেমন পসার ছিল না; কাছারি-আদালত, ছোট একটি হাসাপাতাল, হাই স্কুল, এমনকি মেয়েদের জন্যে একটি মাইনর স্কুল নিয়ে গর্ব করতে পারলেও যে-রহস্যময় কল্যাণস্পর্শে একটি জায়গা জীবিত থাকে, তার উন্নতি হয়, সে-কল্যাণস্পর্শ থেকে শহরটি সদা বঞ্চিত। তার ওপর স্টিমারঘাটও বন্ধ হলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ে আর কি।

লোকটির চোখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে কী একটা ভাব জাগে। সে বলে, সে যখন সর্বপ্রথম শুনতে পায় বাকাল নদীতে চরা পড়েছে তখন সহসা তার মানস-চোখে বাল্যকালে দেখা একটি নদীর চিত্রই ভেসে উঠেছিল। সেটি একটি অতিশয় খরধার বিশাল নদী যার অপর তীরে প্রতি শরৎকালে মাঠের পর মাঠ ঢেকে বিস্তৃত কাশবন রূপালি শুভ্রতায় ধবধব করত, যার দ্রুতগতি স্রোতে ভেসে যেত জোটবাঁধা অজস্র কচুরিপানার দল এবং নূতন হাঁড়ি-পাতিলে বোঝাই ডুবু-ডুবুপ্রায় অসংখ্য কুমোর-নৌকা, মধ্যে-মধ্যে ঝড় এসে যার পানিতে তুমুল

BanglaBook.org

তরঙ্গমালা সৃষ্টি করত আর যার গভীরতাসূচক গাঢ় রঙ দ্বিপ্রহরের সূর্যালোকেও হাল্কা হত না। তবে সে-নদীর বিশালতা, তার অপর তীরের রহস্যময় অস্পষ্টতা, সে-তীরের শরৎকালীন বিস্তৃত কাশবন বা তার পানির রঙ—এ-সব লক্ষ্য করলেও যা বালকমনকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করত তা নদীটির অবিরাম বলিষ্ঠ ধারা। সে-কারণেই হয়তো বালক-চোখ যখন কুমোর-নৌকা বা কচুরিপানার দিকে তাকাত তখন তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পেত না, সে-চোখ কেবল লক্ষ্য করত তাদের ভেসে যাওয়া, যে-ভেসে যাওয়ার মধ্যে নৌকাগুলি এবং গাঢ় সবুজ জলজ-উদ্ভিদ তাদের আকার-আকৃতি হারিয়ে একাকার হয়ে পড়ত, মনে এ-প্রশ্নও জাগত না কোথায় সে-সব উদ্ভিদের জন্ম কোথায়-বা তা যায়, কোন ঘাটেগঞ্জেই বা কুমোর-নৌকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হয়। শুধু সে-সব বস্তুর মধ্যেই নয়, সে-সব বস্তু এবং স্রোতের মধ্যেও বালক-চোখে কোনো পার্থক্য ধরা পড়ত না : স্রোত, নৌকা, কচুরিপানা, বর্ষার দিনের অন্যান্য জিনিস—গাছের শাখা বা গৃহপালিত কোনো জীবজন্তুর মৃতদেহ, সবই ভেসে যায়, নিরন্তরভাবে, মানুষের জীবন সম্বন্ধে একটি দৃষ্টিহীন গভীর উদাসীনতায়। সে ভেসে-যাওয়া বালক-মনে অবশেষে একটি দুর্বোধ্য ভাবের সৃষ্টি করত, সুপরিচিত মাঠঘাট জনপদ ছেড়ে অস্পষ্ট তবু নিত্য দেখা দিগন্ত পেরিয়ে সে-মন তীরহীন কোনো নদীতে হারিয়ে যেত যে-নদীতেও সব কিছু ভাসত। এবং সেও ভাসত, প্রশ্ন না করে, সম্মুখে বা পশ্চাতে না তাকিয়ে, ভয় না পেয়ে; বালক-মন আদি বা অন্তের সন্ধান করে না বলে ভীত হয় না। তারপর এক সময়ে নদীতে সহসা রাত নেমে আসত যে-রাতে কুমোর-নৌকা, কচুরিপানার দল, বর্ষাকালে ভাসমান অন্যান্য বস্তু, এমনকি শরৎকালের অপর তীরের ধবধব-করা কাশবনও নিমজ্জিত হত যেমন দিনান্তে রক্তিমাভাও নিশ্চিহ্ন করে নদীগর্ভে সূর্য নিমজ্জিত হয়। তখনো সে ভেসে-যাওয়া ক্ষান্ত হত না, যদিও সময়টা অপেক্ষার সময়—ঘুমের মধ্যে দিয়ে, কালো রাতে মৃদু আলো জ্বালিয়ে নদীর বুকে জাল ফেলে বসে, স্বপ্নের জন্যে নয় মাছের জন্যেও নয়, সূর্য ওঠার জন্যে যাতে সে-নিরন্তর ভেসে-যাওয়া আবার দৃষ্টিগত হয়—স্রোতের কুমোর-নৌকার, কচুরিপানার, বর্ষার দিনে অন্যান্য অপ্রত্যাশিত বস্তুর। হয়তো কখনো এমন নদীর মৃত্যু হয় না। তাই একদিন বাল্যকালের বিশাল নদীটি ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে-হয়ে একটি ছোটখাটো শাখানদীতে পরিণত হলেও দুই নদীর মধ্যে কোনো সংঘাত সৃষ্টি হয় নি, পূর্ণবয়স্ক চোখ স্বাভাবিকভাবেই এ-কথা মেনে নেয় যে বাস্তব নদীটির অপর তীর তেমন দূরে নয়, অস্পষ্টও নয়, সেখানে শরৎকালে যে-কাশবন দেখা দেয় তা দিগন্তপ্রসারী নয়, দুরন্ত ঝড় জাগলেও তার পানিতে তুমুল তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয় না বা আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার হলেও সে-পানি গাঢ় রঙ ধরে না, তার ধারাও দ্রুতগামী নয়, তাছাড়া এখনো সে-পথে কুমোর-নৌকা ভেসে গেলেও তাদের সংখ্যা অগণিত নয়। কোনো আক্ষেপ না করে সে-সব কথা সে গ্রহণ করে নেয় : বাকাল নদী ছোটখাটো শাখা নদী মাত্র।

"কুমুরডাঙ্গার ষ্টিমারঘাটের ফ্ল্যাটটি শহরের ছেলেদের জন্যে অন্ত আকর্ষণের বস্তু ছিল। লুকিয়ে-লুকিয়ে তাতে চড়ে আমরা দুঃসাহসের এবং বীরত্বের পরিচয় দিতাম। ধরা পড়লে লস্কর-সর্দার বাদশা মিঞা বাঘের মতো গর্জন করে উঠত যে-গর্জনে বুকের পানি জমে যেত", লোকটি বলে, চোখের কোণে হাসিটায় যেন দূরত্বের অস্পষ্টতা।

লস্কর-সর্দার বাদশা মিঞা শহরে বড় একটা দেখা দিত না। শহরবাসীদের প্রতি তার ছিল নাকউঁচু ভাব। ষ্টিমারের মতো অত্যাশ্চর্য কলের বস্তুর সে একটি অংশ; তার আত্মগর্ব অযথার্থ মনে হত না। তার শরীরটা ছিল তাগড়া-বলিষ্ঠ, লম্বাতেও কম ছিল না। মুখে ছিল বাহারি ধরনের গোঁফ যা সে তার গর্বিত ব্যক্তিত্বের ঝাণ্ডার মতোই ব্যবহার করত। তার খৈনি খাবার অভ্যাস ছিল। সে যখন কালে-ভদ্রে মুখে খৈনি পুরে অতি ধীরে-ধীরে চোয়াল নেড়ে দৃষ্টি ঊর্ধ্বে রেখে শহরের পথে দেখা দিত তখন মনে হত হেলাফেলা করবার মতো লোক সে নয়। বস্তুত তার মুখভাব, হাঁটার ভঙ্গি, শরীরের গঠন, খৈনিরসসিঞ্চিত চোয়ালের শ্লথ সঞ্চালন, তার বাহারি

BanglaBook.org

গোঁফ—এসব জনসাধারণের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত সমীহের ভাবই জাগাত। তবে সমীহটা কিছু ভাঙত যখন সে-কথা বলতে বাধ্য হত, কারণ তার জবানটি ছিল নিতান্ত স্থানীয়। প্রকৃতপক্ষে, নদীর অপর তীরে একটি গ্রামে সে জন্মগ্রহণ করেছিল, এবং কয়েক বছর ধরে স্টিমারঘাটে নোকরি করলেও কখনো স্টিমারে ভ্রমণ করে নি।

স্টিমারঘাটে যে-ফ্ল্যাটের নিচের তলায় লস্কর-সর্দার সপরিবারে বসবাস করত কোম্পানির সম্পত্তির পাহারাদারের অধিকারে এবং যে-ফ্ল্যাট কুমুরডাঙ্গার ছেলেদের নিত্য হাতছানি দিয়ে ডাকত, তাদের কল্পনায় উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করত, সেটি আবার তাদের চোখে ডানা-কাটা পাখির মতোও ঠেকত। নিঃসন্দেহে সেটি একদিন রীতিমত স্টিমারই ছিল। তখন নিঃসন্দেহে অনেক কিছু তাতে শোভা পেত : ঝকঝকে পাটাতনের ওপর সুদৃশ্য ক্যাবিন-কামরা, ধুঁয়াত্যাগের জন্যে গোলাকার উত্তুঙ্গ চুঙ্গা, দু-পাশে মস্ত দুটি পাখা, ছাদে সারেঙ্গের ঘর, বিশাল নদীর বুকে ঢেউ তুলে মাল ও যাত্রী বহন করে দূর-দূর ঘাট-বন্দরে যাতায়াত করবার জন্যে যথাবিধি কলকব্জা—আমূল পরিবর্তনের ফলে যে-সবের আর কোনো চিহ্ন ছিল না। কেবল একটি বসতবাটি সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হলেও মাটিতে যেমন তার ভিতের একটু আভাস-ইঙ্গিত থেকে যায় তেমনি ফ্ল্যাটটির পূর্ব-চেহারার ঈষৎ আভাস-ইঙ্গিত ধরা পড়ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি দর্শকের চোখে। কতগুলি অস্পষ্ট রেখা থেকে সে অনুমান করতে পারত কোথায় ক্যাবিন-কামরা ছিল, কোথায় ছিল কলকব্জা যে-সব কলকব্জা সারেঙ্গের সঙ্কেতে নিমেষে জীবন্ত হয়ে উঠত, কোথা দিয়ে ধুঁয়াত্যাগের চুঙ্গাটি ঊর্ধ্বগামী হত। অনেকদিন আগে শেষ হয়ে যাওয়া গৌরবময় জীবনের যা তখনো বিদ্যমান ছিল তা তার লৌহনির্মিত চ্যাপ্টা ধরনের তলদেশ এবং তার কাঠামো। তলদেশ অক্ষত ছিল এবং সে-কারণে ভেসে থাকার ক্ষমতা তখনো হারায় নি, কিন্তু তার কাঠামোটিকে যে-ভাবে স্থাবর জীবনের প্রয়োজনানুসারে কামরা কুঠরির নিমিত্তে বাঁশবাখারি টিনকাঠে বা নলখাগড়ার বেড়ার সাহায্যে আবৃত করা হয়েছিল তাতে তার চেহারা অনেকটা গ্রাম্য কুটিরের রূপই গ্রহণ করেছিল; আদি বস্তুটির কঙ্কাল যেন তাচ্ছিল্য এবং অযত্নের সঙ্গে কোনো প্রকারে পুনরাচ্ছাদিত করা হয়েছিল। কেবল একটি কথা অস্বীকার করা যেত না। সমস্ত গতিশক্তি হারিয়ে নিতান্ত স্থবির-অথর্ব হয়ে পড়লেও তখনো তা অকেজো হয়ে পড়ে নি, যাত্রী নিয়ে কোথাও আর না গেলেও তাদের পদস্পর্শ থেকেও বঞ্চিত হয় নি; প্রতিদিন যাত্রারম্ভে বা যাত্রাশেষে তারই বুকে যাত্রীরা কিছু সময়ের জন্যে আশ্রয় গ্রহণ করত। তাছাড়া তার দৌরাত্ম্য শেষ হয়েছিল, স্বাধীনতা বলশক্তির অবসান ঘটেছিল, যৌবনের রূপছটাও আর ছিল না, কিন্তু নদীর সঙ্গে আজীবনের সম্বন্ধ তখনো ছিন্ন হয় নি, কারণ নদনদী আর পাড়ি না দিলেও তখনো তার চতুষ্পার্শ্বে সে-নদনদীর শাশ্বত ধারা কলতান করত, বহুদিনের সহবাসের কথা স্মরণ করে হয়তো স্নেহভরেই তার অক্ষম দেহটি আলিঙ্গনে বদ্ধ করে রাখত।

"ঘাটের কথায় একটি কথা মনে পড়ে গেল", লোকটি একটু থেমে আবার বলে। "ঘাটের জন্যেই কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের একটা দুর্নাম। তারা নাকি অতিশয় হিংস্র প্রকৃতির লোক।"

কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা অতিশয় হিংস্রপ্রকৃতির লোক—এই বলে সমগ্র অঞ্চলে যে-একটা কুখ্যাতি সে-কুখ্যাতির উৎপত্তি হয় তাদের সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ স্টিমার কোম্পানির একটি গুপ্ত মতে যা একদিন কী করে প্রকাশ পেয়ে মুখে-মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। যে-ঘটনার জন্যে কোম্পানি সমগ্র কুমুরডাঙ্গাকে জড়িয়ে এ-অন্যায্য মতটি লিপিবদ্ধ করেছিল সে-ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় আশি বছর আগে। সেদিনই সে-শহরে সর্বপ্রথম স্টিমারঘাট খোলা হয়েছিল।

ঘাট খোলার উপলক্ষটিকে একটি স্মরণীয় ব্যাপারে পরিণত করার জন্যে কোম্পানি বেশ জাঁকজমক-সমারোহের ব্যবস্থা করেছিল। তখনো ঘাটে ফ্ল্যাটটি বসানো হয় নি, তবে

BanglaBook.org

নদীতীরে উঁচু দরওয়াজা তৈরি করে সেটি নানা রঙের কাগজে আবৃত করে পতাকা ঝুলিয়ে শোভিত করেছিল, তারপর জেলা থেকে আমদানি করেছিল পুলিশের বাদ্যকদল চমকপ্রদ রণবাদ্যের ঝঙ্কার তুলে শহরবাসীদের আমোদিত করার জন্যে। নির্দিষ্ট দিনে স্টিমার আসার অনেক আগে ঘাট লোকে-লোকারণ্য হয়ে পড়ে। শুধু শহর থেকে নয়, কোম্পানি দশ গ্রামে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ঘাট প্রতিষ্ঠানের খবরটি সাড়ম্বরে প্রচার করেছিল বলে সারা অঞ্চল থেকে মিছিল করে লোকেরা ঘাটে উপস্থিত হয়েছিল তামাশা দেখবার জন্য। দেখতে-না-দেখতে ঘাটের সামনে রীতিমত হাট-বাজারও বসে গিয়েছিল; জনতার সমাগম ব্যবসায়ী মানুষের মনে অবিলম্বে অর্থলিপ্সা জাগায়। বস্তুত সব কিছু মিলে সদ্য-খোলা ঘাটটি একটি বৃহৎ মেলার রূপ ধারণ করে, আনন্দোৎফুল্ল উদ্দীপনা উল্লাস-উত্তেজনায় স্থানটি সরগরম হয়ে ওঠে। বলতে গেলে তখন এ-অঞ্চলে কারো বাষ্পীয় জাহাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, মুষ্টিমেয় যারা অত্যাশ্চর্য বস্তুটিকে সচক্ষে দেখেছিল তারা দূর থেকেই দেখেছিল কেবল, কখনো তাতে চড়ে নি। এক-আধজন সৌভাগ্যবান যারা শুধু দেখে নি তাতে আরোহণ করে ভ্রমণও করেছে, তারা এ-সুযোগে আসন্ন যন্ত্রদৈত্যের সম্বন্ধে চটকদার বিবরণ দিয়ে অজ্ঞদের ঔৎসুক্য মাত্রাতিরিক্তভাবে শাণিত করে তোলে।

স্টিমারের আগমন নিরীহ আমোদ-উল্লাসের মধ্যে দিয়ে নিরুপদ্রবেই কাটত যদি কোম্পানির কর্তৃপক্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের স্টিমারের ডেক-এ চা-পানের দাওয়াতে মেহমানদের তালিকায় হিন্দু জমিদারবাবুর নাম অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলে না যেত। ভুলটা হয়তো এই কারণেই ঘটেছিল যে সমগ্র অঞ্চলে অশেষ প্রতাপ-প্রতিপত্তি রাখলেও জমিদারবাবুর বাসস্থান ছিল শহর থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ দূরে। তাছাড়া জমিদারবাবু কদাচিৎই তার বাসস্থানে থাকত; শস্যসংগ্রহকাল ছাড়া বা অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে দেশের বাড়িতে ডাক না পড়লে অধিকাংশ সময়ে শৌখিনহালে কলকাতার নেশায় মৌজ হয়ে সে-বৃহৎ শহরেই দিন কাটাত। ঘাট খোলার পূর্ব রাতে সে যে আচমকা দেশের বাড়িতে ফিরে এসেছে তা কেউ জানতে পায় নি।

দাওয়াত নেই দেখে জমিদারবাবু গভীরভাবে অপমানিত বোধ করে। তখন বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের জন্যে ইংরেজ এবং হিন্দুদের মধ্যে প্রচণ্ড মনোমালিন্যের ভাব বলে তার ধারণা হয়, কোম্পানির ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করেই মেহমানদের তালিকা থেকে তাকে বাদ দিয়েছে। জমিদারবাবু তাগড়া-তাগড়া চেহারার বেহারি লাঠিয়াল পুষত। নির্ভেজাল খাঁটি দুধ-ঘি খেয়ে কুস্তি-বৈঠক-মল্লযুদ্ধ করে অন্য সময়ে নিষ্কর্মা আলস্যে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে তারা তৃপ্ত বোধ করত না, একটু দাঙ্গা-হাঙ্গামা মারপিটের জন্য তাদের হাত সর্বদা নিশপিশ করত। জমিদারবাবু তাদেরই পাঠিয়ে দেয় কুমুরডাঙ্গার ঘাটে, ডাণ্ডাবাজির গন্ধ পেয়ে তারাও তিনলাফে যথাস্থানে উপস্থিত হয়। স্টিমার আসে, পুলিশের বাদ্যকদল রণবাদ্য শুরু করে, ঘাটে সমবেত জনতার মধ্যে ভয়শ্রদ্ধামিশ্রিত গভীর স্তব্ধতা নাবে। সমস্ত কিছু ঠিকভাবে চলছে এমন সময় রণবাদ্যে বিভিন্ন সুর ঢুকিয়ে জমিদারবাবুর লাঠিয়ালরা রৈ-রৈ আওয়াজ তুলে স্টিমারে ওঠার সুসজ্জিত পুলের ওপর দিয়ে স্টিমারে চড়ে তার ধ্বংসকার্যে লিপ্ত হয়। পুলিশ আসার আগেই স্টিমারের আসবাবপত্র জানলা-দরজা ভেঙে-চুরে তারা যে-কাণ্ড করেছিল তার জন্যে স্টিমারটি মাস কয়েক এ-পথে মুখ দেখাতে পারে নি।

সরকার ঘটনাটির তদন্ত করেছিল এবং লাঠিয়ালদের যথাবিহিত শাস্তি দিয়েছিল। তবে তাদের পশ্চাতে কে ছিল তা অনুমান করা সহজ হলেও সাক্ষীর অভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি; লাঠিয়ালরা জমিদারবাবুর নাম নিতে অস্বীকার করেছিল। একমুখে কেবল বলেছিল, শত-শত দর্শকের মতো তামাশা দেখবার জন্যই তারা কয়েক ক্রোশ পথ ভেঙে স্টিমারঘাটে উপস্থিত হয়েছিল এবং বিচিত্র যন্ত্রদানবটি দেখে উত্তেজনায় সম্বিৎ হারিয়ে কী করেছিল বলতে পারবে না। একজন এ-কথাও বলেছিল যে, পুলিশের বাজনার জন্যে তার মতিভ্রম

BanglaBook.org

হয়েছিল; সে-বাজনা শুনে তার সমস্ত শরীরে রক্তস্রোত এমন টগবগ করে উঠেছিল যে সে নিজেকে সামলাতে পারে নি। নিঃসন্দেহে সেদিন জমিদাররা তাদের লাঠিয়ালদের খাঁটি দুধ-ঘিই দিত।

স্টিমারের ওপর আক্রমণের বিষয়ে রিপোর্ট লিখতে গিয়ে কোম্পানি সে-মতটি প্রকাশ করেছিল : কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের চরিত্রটা অতিশয় হিংস্র প্রকৃতির। হয়তো জমিদারবাবু এবং তার দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালরা কোম্পানির নজরে পড়ে নি, বা পড়লেও আসল আসামিকে যখন সরকার পর্যন্ত ধরতে পারে নি, চেলাসমেত তার নামও উহ্য রাখা তারা বুদ্ধিসঙ্গত মনে করে থাকবে; মানহানির আইনের বিষয়ে উচ্চ ব্যবসায়ীরা সদাসতর্ক, যে-সতর্কতার প্রয়োজন গোপন-রিপোর্ট লিখতে বসেও তারা ভোলে না। তাছাড়া, সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত এ-সব গুপ্ত মন্তব্য কদাচিৎ সত্যের পথ অনুসরণ করে। মাস কয়েক পরে অনেক গবেষণা-আলোচনার পর কোম্পানি যেদিন কুমুরডাঙ্গা নামক ভয়ানক স্থানে আবার স্টিমার পাঠায় সেদিন সাবধানতার অন্ত থাকে নি। সেদিন স্টিমার অভ্যর্থনার জন্যে তারা কোনো জাঁকজমক-সমারোহের ব্যবস্থা তো করেই নি, বরঞ্চ পুলিশের এমন কড়াকড়ি করেছিল যে দু-একজন ন্যায্য যাত্রী ছাড়া আর কেউ ঘাটের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে নি। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নয়, সেদিন বন্দুক নিয়েই পুলিশ ঘাটে মোতায়েন ছিল।

আজ সে-জমিদারবাবু নেই তার লাঠিয়ালরাও নেই। লাঠিয়ালদের কেউ কোথাও বেঁচে থাকলেও এতদিনে বার্ধক্যের প্রকোপে লাঠি ছেড়ে ছড়ি ধরে থাকবে। কেবল জমিদারবাবুর আদেশে লাঠিয়ালরা যে-কীর্তি করেছিল সে-কীর্তি কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের স্মৃতির বুকে বীরত্বের স্বর্ণপদকের মতো উজ্জ্বলভাবে শোভা পায়। তবে সেটি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা পদকই বটে।

কুমুরডাঙ্গায় যাবার সময়ে একজন দারোগার মুখে মুহাম্মদ মুস্তফা স্টিমারের ওপর আক্রমণের কাহিনীটা শুনেছিল। সদরে কোনো মামলায় সাক্ষী দিয়ে দারোগাটি কর্মস্থলে ফিরছিল, একই স্টিমারে মুহাম্মদ মুস্তফা কুমুরডাঙ্গার ছোট হাকিমের পদ গ্রহণ করতে যাচ্ছে সে-খবর পেয়ে দারোগাটি অবিলম্বে সালাম জানাবার জন্যে তার নিকট হাজির হয়; কর্মভার নেবার আগে একটি হাকিমের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার সুযোগ দারোগাটির কাছে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে হয়ে থাকবে। তারপর কুমুরডাঙ্গা কী রকম জায়গা তা জানবার জন্যে নূতন হাকিম উদ্‌গ্রীব ভেবে সে-শহর সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভালো-মন্দ খবরাখবর দিয়ে তাকে যথাসম্ভব ওয়াকিবহাল করার লোভও সম্বরণ করতে পারে নি। সে বলেছিল : কুমুরডাঙ্গা সম্বন্ধে কিছু বলা কি সম্ভব? সে অনেক জায়গা দেখেছে, অনেক ঘাটে পানি খেয়েছে—তার চাকুরিটি অনেক দিনের—কিন্তু কুমুরডাঙ্গার মতো এমন জায়গা বেশি দেখে নি। বহুদিন আগে স্টিমারঘাটের ওপর আক্রমণের উল্লেখ করে বলেছিল, কুমুরডাঙ্গার লোকেরা এমনই হিংসুটে এবং নীচমনা যে নিজের নাক কেটেও পরের ক্ষতি করতে তারা সদা প্রস্তুত। অবশ্য কুমুরডাঙ্গার অর্থনৈতিক অবস্থাটা ভালো নয়, কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস, একটি সমাজে তখনই দারিদ্র দেখা দেয় যখন সে-সমাজে ধর্ম-দুর্বলতা এসে পড়ে; দারিদ্র হল অধার্মিকতার ফল, রাহাজানি খুনখারাবি নারীধর্ষণ এ-সবের মতো দারিদ্রও নৈতিক অবনতির একটি লক্ষণ। এরপর খাকি রঙের পুলিশি পোশাকের আড়াল থেকে দারোগাটির ধর্মপ্রাণ উঁকি মারতে সময় লাগে নি এবং এ-সময়ে তার গোঁফ-কামানো মাথা-মুড়ানো কিন্তু দীর্ঘ দাড়ি-শোভিত মুখাবয়বটিও মুহাম্মদ মুস্তফা প্রথম লক্ষ করে। গভীর দুঃখের সঙ্গে দারোগাটি বলে চলে : সে যদি কুমুরডাঙ্গার নিন্দা করে থাকে তার কারণ সে-শহরের ধর্মাভাব, যে-ধর্মাভাব শুধু জনসাধারণের মধ্যে নয়, শহরের নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত এলেমদার লোকেদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। বাইরে তারা ধার্মিক, কিন্তু সে-ধার্মিকতা একটি মুখোশ মাত্র। খোদা তাদের যা দিয়েছেন তার জন্যে তারা যখন

BanglaBook.org

উচ্চৈঃস্বরে শোকর আদায় করে তখন তাদের কণ্ঠে আন্তরিকতার অভাব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে যেন খোদার রহমতে তাদের সম্পূর্ণ আস্থা নেই, যেন খোদা ভুল করেই তাদের তাঁর অপার দয়ার পাত্র করেছেন এবং সে-ভুল ভাঙলে আচম্বিতে সে-দয়া থেকে তাদের বঞ্চিত করবেন। তাদের নেতৃত্বে জুমাবারে শহরের মসজিদে এত নামাজির সমাগম হয় যে উঠানেও জায়গা হয় না, ঈদের দিনে ঈদগাহ এমনভাবে লোকে-লোকারণ্য হয়ে পড়ে যে প্রতিবছর ভিড়ের ঠেলায় একটা-দুটো দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। তারপর মিলাদ পড়ানো, শিন্নি-জাকাত দেওয়া, নামাজ কালামের শিক্ষার ব্যবস্থা—কোনোদিকে গাফিলতি দেখা যায় না। তবু সব কিছুর মধ্যে কেমন দ্বিধা-সংশয়, কী-একটা সদাজাগ্রত ভয়। যেন খোদাকে নয় খোদার সৃষ্টিকে তাদের ভয়, দোজখকে নয় নশ্বর জীবনকে তাদের ভয়! নশ্বর জীবনকে যে ভয় করে তার মনে কি শান্তি থাকা সম্ভব? এবং যাদের অন্তরে শান্তি নেই তারা কি ন্যায়জ্ঞান এবং বুদ্ধিবিবেচনার সাথে নিজের বা পরিবারের বা সমাজের জীবন পরিচালিত করতে পারে?

মুহাম্মদ মুস্তফা মনোযোগ দিয়েই দারোগাটির কথা শোনে। ক্রমশ তার মনে হয়, কুমুরডাঙ্গা নামক শহরের কথা বলছে ভাবলেও দারোগাটি আসলে মানুষ সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত মতামতই প্রকাশ করছে। কোনো বিশেষ স্থান বা সমাজে তার হয়তো আর কৌতূহল নেই, এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে এ-শহর থেকে সে-শহরে ঘোরাফিরি করলেও সে আর কিছুই দেখে না, কারণ তার নিজস্ব মতামতের উঁচু শক্ত দেয়ালে সে বন্দী হয়ে পড়েছে। অবশ্য মুহাম্মদ মুস্তফা মানুষের মতামতে কদাচিৎ দোষের বা আপত্তির কিছু দেখতে পায়, কারো মত তার নিজস্ব মতের বিরুদ্ধে গেলেও বিচলিত হয় না, সে-বিরুদ্ধ মতটিকে ধ্বংস করার ইচ্ছাও জাগে না তার মনে। সে ভাবে, অন্যের ভুলত্রুটি শুধরিয়ে কী লাভ? ছাত্র বয়সে তারুণ্যের আতিশয্যে নবলব্ধ জ্ঞানের মাদকতায় অন্যেরা যখন তুমুল তর্কবিতর্কে লিপ্ত হয় সে-বয়সেও সে কোনোদিন এ-পক্ষে সে-পক্ষে কোনো মত প্রকাশ করে নি। বলতে গেলে, এ-পর্যন্ত তার জীবনটা একটি গভীর নীরবতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। অনেক ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কোনো মত থাকেও না। জীবনসমুদ্র পার হতে হলে মুষ্টিমেয় কয়েকটি সহজবোধ্য বিশ্বাসই কি যথেষ্ট নয়? দাঁড়-হাল-পাল এবং সম্মুখে একটিমাত্র ধ্রুবতারা থাকলেই গহিন রাতে অকূল সমুদ্র পার হয়ে যাওয়া যায়; বোঝার ভার ডুবে মরার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে কেবল। তার চিন্তাধারা এমনই যে তার যদি ধারণা হয় বিভিন্ন ফুলের নাম-বিবরণ জানা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় তবে ফুলের দিকে একবার ফিরেও তাকাবে না, কেউ গোলাপকে সূর্যমুখী বলে ভুল করলে বিস্মিত হবে না, প্রতিবাদও করবে না। সে আমার চাচাতো ভাই, আমাদের বয়সে তেমন প্রভেদও নেই, একই বাড়িতে আমাদের জন্ম। তার কথা আমি জানব না তো কে জানবে?

মুহাম্মদ মুস্তফার শান্ত সশ্রদ্ধ—দারোগার ধর্মপরায়ণতা সম্বন্ধে সজ্ঞান হবার পর আপনা থেকেই তার প্রতি মুহাম্মদ মুস্তফার মনে শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠেছিল—চোখ নিবদ্ধ থাকে পুলিশের কর্মচারীটির ওপর, মনোযোগ-সহকারেই তার মুখে সে কুমুরডাঙ্গার খবরাখবর শোনে। সে-শহরে কখনো যায় নি, সে-শহরে যাচ্ছে হাকিমগিরি করতে যে-কাজও পূর্বে কখনো করে নি। বস্তুত, সে-শহরে তার জীবনের একেবারে নূতন একটি অধ্যায় শুরু হবে। তবু সে যে মনে কোনো উত্তেজনা বোধ করে তা নয়, বরঞ্চ জীবনের একটি নূতন অধ্যায় শুরু করবার জন্যে অজানা অপরিচিত একটি শহরের অভিমুখে যাওয়া তার কাছে নিতান্ত স্বাভাবিক মনে হয়। সবকিছু সে অতি সহজে গ্রহণ করে নেয়—ছোট-বড় ঘটনা, সাধারণ-অসাধারণ ঘটনা। সর্বদা সে ভাগ্যের নৌকায় একটি আরোহীর মতোই বোধ করে, যে-নৌকা সে চালনা করে না, যার দিক-গতিপথ স্থির করে না। সে যে একাকী কুমুরডাঙ্গা অভিমুখে চলেছে, তাও তার নিকট স্বাভাবিক মনে হয়। একা যাওয়ার কথা ছিল না, ব্যবস্থা হয়েছিল প্রথমে বিয়ে হবে, তারপর কুমুরডাঙ্গায় যাবে স্ত্রীকে নিয়ে। কিন্তু বিয়ে হয় নি, খোদেজার আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে বিয়েটা কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। হয়তো তার প্রয়োজন ছিল না।

BanglaBook.org

তবু বিয়ের পাকা দিনটা না ভেঙে পারে নি। সে কি তবে বাড়ির লোকদের বিচিত্র, উদ্ভট কথায় তারই অজান্তে কিছু বিচলিত হয়ে পড়েছিল? সে-সম্ভাবনা তাকে ক্ষণকালের জন্যে ঈষৎ চিন্তিত করে, কিন্তু ধারণাটি যে নিতান্ত অহেতুক তা বুঝে শীঘ্র তা মন থেকে তাড়িয়ে দেয়। না, সে যে সস্ত্রীক নয়, একাকীই কুমুরডাঙ্গার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ব্যবস্থায় যে একটু গোলযোগ হয়েছে—তাও সে নির্বিবাদে গ্রহণ করে নিয়েছে। যা হবার হয়েছে, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা খেদ-দুঃখ করা বৃথা।

যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে সত্যিই কখনো সে ভাবে না। মনে আছে, একবার বাড়ি থেকে চাঁদবরণঘাট পর্যন্ত তাকে পৌঁছিয়ে দিতে গিয়েছিলাম। গ্রীষ্মের ছুটির পর সে শহরে ফিরে যাচ্ছিল। খালের পথে নৌকায় করে কিছু দূর এগিয়ে গিয়েছি এমন সময় সহসা তার স্মরণ হয় একটি বড় দরকারি বই বাড়িতে ভুলে এসেছে। সারা ছুটিতে উঠানে গাছের তলায়, পুকুরের ধারে, ক্ষেতের পাশে বসে বা বিছানায় শুয়ে বইটি পড়েছে, এক মুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করে নি, এমনকি শোবার সময়েও বইটি তার বালিশের নিচে রাখত যাতে সকালে ঘুম ভাঙলেই সেটি খুলে চোখের সামনে ধরতে পারে।

ছোট টিনের সুটকেসে বইটা নেই তা জেনেও সে ক্ষিপ্রহস্তে সেটি খুলে একবার তার ভেতরটা হাতড়ে দেখে, মুখে গভীর উৎকণ্ঠার ছায়া। তবে সুটকেসটি বন্ধ করেছে কি অমনি ছায়াটি মিলিয়ে যায়। সারা পথে বইটির কথা একবার বলেও নি, ভাবেও নি। যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে ভেবে লাভ কী? তবে এটি একটি ছোট উদাহরণ। একবার তার বৃত্তি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন আমাদের দক্ষিণ-বাড়ি উত্তর-বাড়ি দুই বাড়িরই সংসারে বড় অনটন, একটি কলেজের ছাত্র পোষার সাধ্য কারো নেই। তার ওপর তখন আমার চাচা, অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তফার বাপ, আর জীবিত নেই। সে বুঝতে পারে, পড়াশুনা চালানো সম্ভব নয়। এক রাত ভেবে পরদিন স্থির করে, আর কলেজে ফিরে যাবে না। কথাটি শান্তকণ্ঠে জানায়, মুখে কোনো রকম দুঃখ বা আফসোসের ক্ষীণতম চিহ্ন দেখা যায় না। অনেকে মনের কথা ঢাকে, সমগ্র হৃদয় দিয়ে যা কামনা করে তাতে বিফল মনোরথ হলেও তাদের দুঃখ প্রকাশ করে না। মুহাম্মদ মুস্তফা যে তার দুঃখ হতাশা ঢাকে তা নয়, অতি দুঃখের কথাও সম্পূর্ণচিত্তে গ্রহণ করে বলে দুঃখবোধের অবকাশই ঘটে না তার।

ভাগ্যবশত সেবার মুহাম্মদ মুস্তফাকে পড়াশুনা বন্ধ করতে হয় নি; বৃত্তির কর্তৃপক্ষ নামে ভুল করেছিল।

সহসা তীরের দিকে তাকিয়ে দারোগা বলে, "এই যে, কুমুরডাঙ্গা এসে পড়েছে।"

ঈষৎ ঔৎসুক্যের সঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফা দারোগার দৃষ্টি অনুসরণ করে তীরের দিকে তাকায়, কিন্তু কোথাও কোনো শহরের চিহ্ন দেখতে পায় না।

"ঝাউগাছটি দেখতে পাচ্ছেন?" খোলা দরজা দিয়ে হাত প্রসারিত করে দারোগা জিজ্ঞাসা করে। "ঝাউগাছটি কুমুরডাঙ্গার নিশানা। তারপর একটি বাঁক, বাঁকের পরে কুমুরডাঙ্গা।"

যথাসময়ে একটি বাঁক পেরিয়ে স্টিমার কুমুরডাঙ্গার নিকটবর্তী হয়। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। নদীর তীরে যে-স্টিমারঘাটটি সহসা দৃশ্যমান হয় সে-ঘাট দিনান্তের ধূসর আলোয় বিষণ্ন, একটু নিঃসঙ্গ দেখায়।

তবারক ভুইঞা (সে যে তবারক ভুইঞা—সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনোই কারণ দেখতে পাই না) বলছিল : যেদিন স্টিমার-চলাচল বন্ধ হয় সেদিন স্টিমারঘাটের ফ্ল্যাটের ওপর-তলায় নদীর ধারে তার ছোট আপিস-ঘরে স্টেশনমাস্টার খতিব মিঞা স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল, মুখে দুশ্চিন্তার রেখা। এ-সময়ে সূর্যের আলো নদীর পানি থেকে আপিস-ঘরের ছাদে প্রতিফলিত হয়ে নিঃশব্দে নৃত্য করে; তারই ছিটেফোঁটা তার মুখে। বস্তুত সে-আলোর ঝলকানি তার মুখের দুশ্চিন্তার রেখাগুলি নিয়ে নির্মমভাবে খেলা করে যেন।

BanglaBook.org

ঘণ্টাখানেক আগে কোম্পানির সদর-দফতর থেকে যে-সংক্ষিপ্ত তার এসে পৌঁছেছে, সে-তারের সংবাদ অপ্রত্যাশিত না-হলেও তা স্টেশনমাস্টার খতিব মিঞাকে কেমন বিচলিত করে ফেলেছে। সংবাদটি এই যে, স্টিমার আসবে না। কেন আসবে না—তার কোনো উল্লেখ নেই সে-সংক্ষিপ্ত তারে।

স্টিমার আসবে না—সে-কথাই স্টেশনমাস্টার বার বার ভাবে : নিত্য একবার উজানে একবার ভাটিতে দু-দুবার ঘাটে জীবন-স্পন্দন জাগিয়ে অব্যর্থভাবে যে-স্টিমার এসেছে সে-স্টিমার আসবে না। সুগম্ভীর সুরে বাঁশি বাজিয়ে দূরত্বের বিচিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করে স্টিমারের আগমন, ঢেউ-এর উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য, যাত্রীদের ত্রস্তব্যস্ত ওঠা-নাবা, লস্করদের কর্মতৎপরতা, অবশেষে স্টিমারের প্রস্থানের পর আকস্মিক নীরবতা, আরো পরে উল্টো পথের স্টিমারের জন্যে প্রতীক্ষা—এ-সব দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর নিতান্ত গতানুগতিক মনে হলেও খতিব মিঞার জন্যে একটি সত্যের পুনরোচ্চারণের মতোই : সে ঘাটের স্টেশনমাস্টার। তাছাড়া মানুষ জীবনের যে-ছন্দ শ্বসনের মতো স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে নেয় তাতে অকস্মাৎ বাধা পড়লে নিরাপত্তার শত আশ্বাস সত্ত্বেও তার মনের অতলে লুক্কায়িত যে-শঙ্কাভীতি চিরজাগ্রত, সে-শঙ্কাভীতি অকারণেই মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে : অস্বাভাবিক কোনো আওয়াজে বিবরবাসী জীব যেন সভয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

খতিব মিঞা নিজেকে কিছু সংযত করে। তবু অনভিজ্ঞ শিক্ষানবিশীর মতো অসহায় বোধ না করে পারে না। সে বুঝতে পারে না কী করবে : সহসা যেন কিছু করার নেই। করবার কীই-বা রয়েছে? একটু আগে একবার নিচে গিয়েছিল। তখন সে অল্পবয়স্ক টিকিট-কেরানিকে নোটিশ টাঙিয়ে দিতে বলেছে; অধিকাংশ যাত্রী নিরক্ষর হলেও লিখিত নোটিশ জারি করা একটি অলঙ্ঘনীয় আইন। তারপর অনির্দিষ্টভাবে নিচে কিছু ঘোরাঘুরি করে ওপরে উঠে এসেছে। আসবার সময় কী কারণে যাত্রীদের কথা নয়, মালঘরে স্তূপাকার করে রাখা চালানি কলার কথাই একবার তার মনে পড়েছিল। কুমুরডাঙ্গা থেকে রাশি-রাশি কলা চালান যায়, যার জন্যে মাল-ঘরে সে-ফলের গন্ধ ভারি হয়ে থাকে সর্বক্ষণ, নদী থেকে অনবরত ভেসে-আসা হাওয়ায়ও তা দূর হয় না। খতিব মিঞা মনে-মনে বলেছিল, কলাগুলো পচবে। তারপর সিঁড়িতে পা দিয়ে ইতিমধ্যে সমাগত কয়েকজন নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি একবার দৃষ্টি দিয়েছিল, তবে তাদের ঠিক দেখতে পায় নি। হয়তো কেবল তার মনে হয়েছিল, যাত্রীরা আজ বেশ সকালে-সকালেই এসে পড়েছে। কোনো কোনোদিন তারা অসময়েই ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। অধিকাংশ লোক ঘড়ি দেখে স্টিমার ধরতে আসে না, মেঘশূন্য দিনে আকাশের সূর্যের দিকে চেয়ে সময় নির্ণয় করে এবং ঝড়বাদলের দিনে সময়-আন্দাজ করে ঘাটে অভিমুখে রওনা হয়। তবে সময়ের বিষয়ে কখনো নিশ্চিত হতে পারে না বলে বা যাত্রায় একবার মনস্থির করে ফেলার পর আর দেরি সয় না বলে আগে-ভাগেই এসে পড়ে। তাছাড়া শহরের বাইরে থেকে এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে হেঁটে গরুগাড়ি করে নৌকায় নদী পাড়ি দিয়ে যারা আসে তারাও অসময়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। তারা যে এসে পড়েছে সে-কথা মাল-ঘরে বা ওপরের আপিস-ঘরে থাকলেও খতিব মিঞা বুঝতে পারে, কারণ নিত্য একইভাবে ঘাটে তাদের আগমন ঘোষিত হয় : সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে হঠাৎ আতসবাজির মতো আকস্মিক হাঁক-ডাক শোনা যায়, যে-হাঁক-ডাক পরে একটি অস্পষ্ট গুঞ্জনে, আরো পরে একটি অবিচ্ছিন্ন কোলাহলে পরিণত হয়। তবে সে কেবল প্রথম হাঁক-ডাকটাই শোনে, এবং তখন চমকিত হয়ে পকেট থেকে জেবঘড়ি বের করে সময়টা যাচাই করে নেয়, কিন্তু পরে যাত্রীদের কোলাহল আর তার কর্ণগোচর হয় না : দূর থেকে শোনা স্টিমারের বংশীধ্বনি বা স্টিমার কাছে এলে তার পাখার আঘাতে নির্মমভাবে আন্দোলিত মথিত পানির আর্তনাদের মতোই যাত্রীদের কোলাহল ঘাটের অন্যতম সুপরিচিত আওয়াজ মাত্র।

ওপরে এসে আপিস-ঘরে প্রবেশ করার আগে নদীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কতক্ষণ

স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল যদিও সে জানে নদীর বুকে যে-রহস্যময় লীলাখেলা চলে থাকবে তার কোনো চিহ্ন সেখানে নেই; নদীর উপরিভাগে এখনো কিছু দৃশ্যমান হয় নি। তবু সামনে নদীর বুকে সে কী যেন দেখবার চেষ্টা করে। তার সে-চেষ্টা অর্থহীন বুঝে দূরে নদীর অপর তীরের দিকে দৃষ্টি দেয়। এ-ধারে কড়া রোদের বর্ষণ, কিন্তু ওপারে দিগন্তের কাছে আকাশ কালো করে মেঘ সঞ্চার হয়েছে। সে দাঁড়িয়েই থাকে, নদীর দিক থেকে যে-হাওয়া ভেসে আসে সে-হাওয়ায় তার পায়জামার নিম্নাংশ পতাকার মতো ফৎফৎ করে আন্দোলিত হয়। খতিব মিঞা ছোটখাটো মানুষ, তবে চওড়া কপালের তলে অস্থিসর্বস্ব মুখটিতে দায়িত্বশীল মানুষের সহজ-গাম্ভীর্য : দীর্ঘদিন ধরে কোম্পানি তার ওপর যে-আস্থা প্রদর্শন করেছে সে-আস্থা তার ব্যক্তিত্বে প্রতিফলিত হয়ে-হয়ে এক সময়ে সে-ব্যক্তিত্বের একটি অবিভাজ্য অংশে পরিণত হয়েছে যেন।

আপিস-ঘরে ঢুকে কিছু-ভাঙ্গা একটি কাঠের চেয়ারে বসে পিঠদাঁড়া খাড়া করে সামনের টেবিলের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর সে স্থির করে, না, কিছুই করবার নেই, অন্য দিন এ-সময়ে মাল-ঘরে তালা দিয়ে টিকিট-ঘরে গিয়ে বসত, আজ মাল-ঘরে বা টিকিট-ঘরে কোনো কাজ নেই। ষ্টিমার আসবে না সে-খবর প্রচার করবার জন্যে টিকিট-ঘরের জানলার সামনে টাঙ্গানো নোটিশটি যথেষ্ট না হলে অল্পবয়স্ক কেরানিটি এবং হেঁড়ে-কণ্ঠ লস্কর-সর্দার বাদশা মিঞা রয়েছে। বাদশা মিঞার বয়স হয়েছে, কিন্তু তার গলা কমজোর হয় নি।

খতিব মিঞা যখন একবার স্থির করে তার কিছুই করবার নেই তখন তার দুশ্চিন্তাটা কিছু লাঘব হয়, এবং এ-সময়ে সহসা সে অনুভব করে হাওয়াটা আর্দ্র-শীতল হয়ে উঠেছে। পার্শ্ববর্তী জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে, অদূরে নদীর বুকেও একটা কালো ছায়ার সঞ্চার হয়েছে। মেঘ এদিকে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে কতক্ষণ সে নিচে থেকে ভেসে-আসা কোলাহলের প্রতি কান দেয়। সে বুঝতে পারে, কোলাহলটি অন্য দিনের মতো নয়, কারণ তাতে যেন যাত্রা-উন্মুখ লোকদের সুপরিচিত ব্যাকুলতা উত্তেজনা নয়, বিস্ময় বিহ্বলতার সঙ্গে মিশ্রিত একটি গভীর অসহায়তা প্রকাশ পায়; যেন যাত্রীর নয়, মানুষের অসহায়তাই। তবে কথাটি তার মনে স্পষ্ট রূপ ধারণ করে না : তেমন কোনো কথা স্পষ্টরূপে বুঝবার ক্ষমতা কোনোদিন সে রাখলেও আজ রাখে না। তাছাড়া, এ-সময়ে হয়তো আর্দ্র-শীতল হাওয়ার জন্যে তার চোখটা লালচে হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে-সঙ্গে দেহে যে-আমেজ ধরে সে-আমেজের রস সন্ধানে সে মনোনিবেশ করে। নিদ্রা আলো-হাওয়ার মতো খোদাই নেয়ামত : সুযোগ-সুবিধা পেলে ষ্টেশনমাস্টার সে-নেয়ামত উপভোগ করে থাকে। এবং নিশ্চিন্তভাবেই উপভোগ করে এই কারণে যে দরকার হলে নিমেষের মধ্যে সে পাখির মতো জড়তাশূন্য দৃষ্টি নিয়ে জেগে উঠতে পারে, সে-চোখে ঘুমের লেশ পর্যন্ত দেখা যায় না তখন।

তার নিদ্রাভঙ্গ হতে দেরি হয় না। বিলম্বিত ঢেউ-এ ভর করে লস্কর-সর্দার বাদশা মিঞার হেঁড়ে-গলা, তারপর তার পশ্চাতে আরেকটি গলা এবার সহসা তার কর্ণগোচর হয়। দ্বিতীয় গলা শহরের গণ্যমান্য উকিল কফিলউদ্দিনের হবে; উকিলের কণ্ঠস্বর ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সিঁড়ি থেকে একবার তার জুতার এবং লাঠির শব্দ আসে : নিঃসন্দেহে সে ওপরের দিকেই আসছে। তারপর আরো পদধ্বনি শোনা যায়; হয়তো কুমুরডাঙ্গার গণ্যমান্য উকিলকে অনুসরণ করে অনেক লোক ওপরের পথ ধরেছে।

দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধবয়সী উকিল কফিলউদ্দিন অবশেষে ওপরে যখন দৃশ্যমান হয় তখন খতিব মিঞা সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ভালো-মন্দ সর্বপ্রকারের পরিস্থিতির জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে, তার চোখ পাখির চোখের মতো জড়তাশূন্য।

"ষ্টিমারের কী হল?" উকিল সাহেব জিজ্ঞাসা করে। প্রশ্নে আশঙ্কা নয়, গভীর বিরক্তি প্রকাশ পায়।

BanglaBook.org

খতিব মিঞা কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন সে মুখের কথা হারিয়েছে। সে ভাবে, তারযোগে যে-সংবাদ এসেছে তার বেশি বলা উচিত হবে কিনা। কী উচিত কী উচিত নয়—সে-বিষয়ে কখনো সে মনস্থির করতে পারে না। কালেভদ্রে উচ্চপদস্থ কোনো কর্মচারী ঘাট পরিদর্শন করতে আসছে খবর পেলে সে কেমন বেসামাল হয়ে পড়ে। কখনো তার মনে হয়, পরিদর্শনকারী কর্মচারী ফ্ল্যাটটিকে নোংরা অবস্থায় পেলে তার মান-ইজ্জত যাবে। সবকিছু তুলে সে ফ্ল্যাটের পরিচ্ছন্নতার কাজে উঠে-পড়ে লেগে যায়, কতবার সে ওপরের অসমতল কালের হাওয়ায় বিবর্ণ, চামচিকা-বাদুড়ের মল-বিষ্ঠায় চিত্রিত পাটাতনটি সাফ করায় তার ঠিক নেই; পরিদর্শনকারী কর্মচারী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ সচরাচর ওখানেই বসে। অন্যবার ফ্ল্যাটের স্বাভাবিক অপরিচ্ছন্নতার কথা ভুলে গিয়ে হিসাবপত্রের দিকে মন দেয়। আবার কোনোবার মালপত্রের দিকে তার দৃষ্টি যায়। সেবার তার মনে সন্ত্রাস উপস্থিত হয় এই ভেবে যে পরিদর্শনকারী কর্মচারী হঠাৎ আবিষ্কার করবে তার দায়িত্বে সোপর্দকরা কোনো জিনিস গুম হয়ে গিয়েছে। মান-ইজ্জত কীভাবে যায় সে-বিষয়ে প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব মতামত পোষণ করে থাকে। তহবিল তছরূপ করেছে—এমন অভিযোগে যে-মানুষ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, সে আবার অধার্মিকতার অভিযোগে গভীরভাবে আহত হয়, যে-মানুষ চরিত্রহীনতার অপবাদে অবিচল থাকে সেই আবার মিথ্যাবাদের অভিযোগে ক্রোধে অপমানে আত্মহারা হয়ে পড়ে। হয়তো খতিব মিঞা কখনো বুঝে উঠতে পারে নি তার মান-ইজ্জতটা ঠিক কোথায়। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে সমস্যাটি বড়ই জটিল মনে হয় এই কারণে যে সে দেখতে পায় তার মান-ইজ্জত নয়, কোম্পানির মান-ইজ্জতই সঙ্কটাপন্ন। কোম্পানির নামে সে যদি অন্যায় কিছু বলে ফেলে তাহলে কোম্পানির মান-ইজ্জত যাবে না কি?

খতিব মিঞা উত্তরের জন্যে অপেক্ষমাণ উকিল কফিলউদ্দিনের দিকে তাকায়, লোকটি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তাই যেন জানবার চেষ্টা করে। তবে মানুষের স্বভাবচরিত্র বা অন্তরের কথা বোঝা তার পক্ষে সহজ নয়। বহুদিন হল তারই অজান্তে দুনিয়াটি কখন সঙ্কীর্ণ হয়ে কর্মজীবন ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং মানুষ এখন একটি রূপেই দেখা দেয় তার চোখে—যাত্রীর, এবং দু-দণ্ডের জন্য দেখা সে-যাত্রীও ভালো-মন্দ আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখ মিশ্রিত রক্তমাংসের মানুষে পরিণত হবার সুযোগ পায় না : যাত্রীরা ছায়া, উড়ন্ত পাখির ছায়া, যে-ছায়া দিনে দুবার দেখা দেয় তার কর্মজীবনের প্রাঙ্গণে; কে কী-রকমের লোক তা বোঝার ক্ষমতা সে সত্যিই হারিয়েছে। তবে সব ছায়া এক নয়, ছায়ার মধ্যেও প্রভেদ রয়েছে, সে-ছায়া শ্রেণীবিভক্ত—যে-কথা বুঝবার জন্য তাকে কারো চেহারা পোশাক-পরিচ্ছদ আচরণ-ব্যবহার লক্ষ করে দেখতে হয় না। হয়তো পায়ের শব্দে বা গলার আওয়াজেই সে বুঝে নেয় কোন যাত্রী উচ্চ-শ্রেণীর, মধ্যম-শ্রেণীর বা নিম্ন-শ্রেণীর এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি আপনা থেকেই তার আচরণ ভিন্নরূপ ধারণ করে। অতএব সে যখন উকিল কফিলউদ্দিনের দিকে তাকায় তখন সে তার সম্ভ্রান্ত চেহারা বা তার কপালে বিরক্তির রেখা ঠিক দেখতে পায় না, একথাই তার স্মরণ হয় যে সে উচ্চ-শ্রেণীতে ভ্রমণ করে, তার দাবিদাওয়া বেশি, তাকে হেলা করাও সম্ভব নয়। নিচে যে-নোটিশ টাঙ্গানো হয়েছে সে-নোটিশের শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করেই কি এ-যাত্রীকে সন্তুষ্ট করা যাবে?

খতিব মিঞা দ্রুতভাবে কিন্তু গোপনে একটি বড় ধরনের নিঃশ্বাস নেয়, তার নাসারন্ধ্র কেঁপে ওঠে। দ্রুতভাবে একবার ভাবে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ঝড়-তুফান বা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্যে স্টিমার আসছে না, তা নয়। সে-সব কারণে ক্বচিৎ কখনো স্টিমার আসতে দেরি করে বৈকি। বছর তিনেক আগে কুমুরডাঙ্গা থেকে দশ ক্রোশ দূরে উজানের স্টিমারে একবার আগুন ধরেছিল। আগুন ঠিক নয়, তার একটি সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র যা দমন করতে বেগ পেতে হয় নি। তবে মাঝ-দরিয়ায় দোজখি অগ্নিকাণ্ডে নির্মমভাবে প্রাণ যাবে এই ভয়ে দু-একজন যাত্রী তারস্বরে খোদার নাম নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লে তাদের

BanglaBook.org

আবার আশ্বাস দিয়ে তুলে নিতে কিছু সময় লাগে, তারপর একটি ভাসন্ত নারকেলকে মনুষ্যমস্তক বলে ভুল করে কেউ বেহুদা হুজুগ তুললে কল্পনার মানুষটির সন্ধানে আরেক দফা বিলম্ব হয়। তবে আজকার ঘটনা তেমন কিছু নয়, ঝড়-তুফান বা আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনার জন্যে যে স্টিমার আসবে না, তা নয়। তাছাড়া আসল কথা কি সে জানে না? গত এক মাসের মধ্যে কতবার সাদা-সবুজ রঙের লঞ্চটিকে সদরের দিক থেকে এসে বাঁক পেরিয়ে ঘাটের সামনে দিয়ে উজানের পথে যেতে দেখেছে, তার আওয়াজও শুনেছে; কর্কশ অমসৃণ আওয়াজ যেন ইচ্ছা থাকলেও চলার ক্ষমতা নেই, আনুগত্যের অভাব না থাকলেও যৌবনের তেজশক্তি নেই নূতন করে রঙ-দেয়া সেই অতি পুরানো লঞ্চের। গতকাল লঞ্চটি আবার দেখা দিয়েছিল। সেটি যখন ফিরে যায় তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। কেন লঞ্চটি একমাস ধরে এ-পথে আসা-যাওয়া করেছে তা অনুমান করা কঠিন নয়। তাছাড়া সেদিন দুপুরে সদরগামী স্টিমার এলে সারেঙ্গের মুখে শুনেছিল যে, কুমুরডাঙ্গা থেকে কিছু আগে উজানের পথে নদীর ধারা যেখানে বরাবর বেশ সঙ্কীর্ণ এবং যেখানে শীতের দিনে স্টিমারকে বড় হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হয়, সেখানে সেই সঙ্কীর্ণ স্থানটিও নাকি মস্ত চড়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে, যে-টুকু এখনো স্টিমার গমনোপযোগী আছে সে-টুকুও শীঘ্র ঢেকে যাবে। সারেঙ্গ বলেছিল, ধাঁ-ধাঁ করে চড়াটা জাগছে। এ-সব কথা কি কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের কানে পৌছায় নি? নদীটি তাদেরই নদী।

"স্টিমার আসবে না, নদীতে চড়া পড়েছে।" খতিব মিঞা অবশেষে বলে। একটু থেমে, কোম্পানি যে সত্যিই নির্দোষ সে-বিষয়ে সর্ব সন্দেহ দূর করবার জন্যে আবার বলে, "নদীর বুক জুড়ে মস্ত চড়া পড়েছে, নদীর শ্বাসরোধ হবার আর দেরি নেই।"

একটি কথা লক্ষ্য করে বিস্মিত হই : তবারক ভুইঞা মুহাম্মদ মুস্তফার নাম উল্লেখ করে নি। অথচ সেদিন সে-ও ঘাটে উপস্থিত হয়েছিল স্টিমার ধরবার জন্যে, ধরতে পারে নি। যদিও সে-সময়ে তবারক ভুইঞা শ্যাওলা-আবৃত বদ্ধ ডোবার মতো পুকুরে খোদেজার মৃত্যুর কথা জানত না, তবু সে যে স্টিমারঘাটে মুহাম্মদ মুস্তফার আগমন, তারপর বিফল মনোরথ হয়ে ঘাট থেকে বাড়ি প্রত্যাবর্তন—এ-সব যে লক্ষ্য করে নি তা সম্ভব নয়। মুহাম্মদ মুস্তফা বেশ সময় হাতে নিয়ে ঘাটে উপস্থিত হয়েছিল; অন্ততপক্ষে তখনো উকিল কফিলউদ্দিন সেখানে দেখা দেয় নি। নিচে স্টিমার না আসার খবর পেয়ে ওপরেও এসেছিল, এবং যতদূর মনে পড়ে সে বসেছিল, সামনের ডেকে বসে সে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছিল, পাশে ছিল স্টেশনমাস্টার খতিব মিঞা। চড়ার কথা এবং স্টিমার না-আসার কথা সে নির্বিবাদেই মেনে নিয়েছিল। সে স্বল্পভাষী মানুষ, বস্তুত বিশেষ প্রয়োজন না হলে কথা বলতে কদাচিৎ শোনা যায় তাকে। হয়তো নদীর দিকে চেয়ে চুপচাপ বসেছিল, তার নীরবতা লক্ষ্য করে খতিব মিঞাও হয়তো নীরব হয়ে পড়েছিল, এবং এমত অবস্থায় এক সময়ে কখন একটু তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিল তার চোখে। তার তন্দ্রা ভাঙে তখন যখন সে উকিল সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। তারপর, মুহাম্মদ মুস্তফা যখন প্রস্থান করে, সে-সময়েও তবারক ভুইঞা তাকে কৌতূহল ভরে চেয়ে-চেয়ে দেখে থাকবে : লম্বা কিন্তু শীর্ণ-পাতলা লোক, মাথাটি শরীরের তুলনায় একটু বড় যা দেহের শীর্ণতার জন্যে অযথার্থভাবে বড় মনে হয়, নীরস মুখ, চোখে কেমন সতর্কতা, চলার ভঙ্গিতে একটু অনিশ্চিত ভাব যেন কোথায় যাচ্ছে তা ঠিক জানে না, বাঁ-হাতটা ঈষৎ ঘোরানো (সে যখন চেয়ারে-চৌকিতে বসে তখন সে-হাতেই ভর দিয়ে দেহটা একটু হেলিয়ে বসে যেন অদৃশ্য কোনো দেয়ালে ঠেস দিয়ে রয়েছে), অন্তরে-অন্তরে লাজুক প্রকৃতির মানুষ যে-লাজুকতা তার জীবনে আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে সাময়িকভাবে কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল এই কারণে যে তখনো সে তার নূতন এবং পুরাতন অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সক্ষম হয় নি; দুটির মধ্যে বিরোধিতা ছিল না, কেবল দুটি তখনো পৃথক সত্তাই ছিল। আরেক কারণেও ঘাটে তার আগমন এবং ঘাট হতে প্রস্থান তবারক ভুইঞা লক্ষ্য করে থাকবে। সাধারণ কোনো উপলক্ষে

BanglaBook.org

মুহাম্মদ মুস্তফা স্টিমার ধরতে আসে নি; যে-শুভকাজটি খোদেজার আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল সে-শুভকাজটি সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যেই স্টিমার ধরতে এসেছিল। সব বৃত্তান্ত না জানলেও সে-কথা তবারক ভুইঞা জানত। মুহাম্মদ মুস্তফার বন্ধু তসলিম লিখেছিল, আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেব হজ করে নানা দেশে পীর-দরবেশের দরগাহ্-মাজারে জেয়ারত করে দেশে ফিরেছেন, আর দেরি করা ঠিক হবে না। এমনিতে দেরি হয়ে গিয়েছে, খোদেজার মৃত্যুর জন্যে তখন বিয়েটা শোভনীয় হত না বলে পাকা দিনটা ভাঙতে হল, তারপর তোমার ভাবী শ্বশুরকেও হজে রওনা হতে হল। এবার তিনি ফিরেছেন, আর বিলম্ব নয়। তিনি একটু অধীর হয়েই পড়েছেন শুভকাজটি সম্পন্ন করবার জন্যে। বলছেন, আর বেশিদিন বাঁচবেন না। হজ-ওম্‌রাহ্ দরগাহ্-মাজার করার পর এমন ভাবটি অস্বাভাবিক নয়, মনে-প্রাণে শুদ্ধ পবিত্র বোধ করলে মানুষ মৃত্যু কামনা করে থাকে, কারণ এ-সময়ে বেহেস্ত সম্বন্ধে মানুষ যতটা নিশ্চিত বোধ করে অন্য কোনো সময় ততটা করে না। তবে মনের ইচ্ছা যাই হোক না কেন, তিনি বিদেশ থেকে বেশ উত্তম স্বাস্থ্য নিয়েই ফিরেছেন; বিদেশে সস্তায় ভালো ফলমূল পাওয়া যায়। লোকেরা এমনও বলে যে, কবরখানার দিকে নয়, শীঘ্র তিনি মন্ত্রীসভার দিকেই যাবেন। সেটা সম্ভব। অবসর গ্রহণ করলেও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট, নানা উঁচু দরবারে তাঁর অবারিত দ্বার, যাতায়াতও কম নয়। আর তোমার ভাবী স্ত্রীর কথা কী আবার বলতে হবে? এমন মেয়ে সত্যি দুটি হয় না—শিক্ষায় বল, দেখতে-শুনতে বল, লেহাজ-নম্রতায় বল। আর যাতে দেরি না হয়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি তাই নিজেই একটি দিন ঠিক করেছি, দিনটি তোমার ভাবী-শ্বশুরেরও পছন্দ। তারযোগে সম্মতি জানাও। মুহাম্মদ মুস্তফা অকারণে একদিন সময় নিয়ে তারযোগে তার সম্মতি জানিয়েছিল, তারপর নির্দিষ্ট দিনটি কাছে এলে ক-দিনের ছুটি নিয়ে ঢাকায় যাবার জন্যে স্টিমারঘাটে উপস্থিত হয়েছিল।

সে-কথা তবারক ভুইঞা উত্তমরূপেই জানত। সে-জন্যেই কি সেদিন সন্ধ্যা বেলায় নৌকায় করে যাবার উপদেশ দেয় নি তাকে? ততক্ষণে মুহাম্মদ মুস্তফার কেমন খেয়াল হয়েছিল, হয়তো দু-একদিনের মধ্যে স্টিমার ফিরে আসবে। তবারক ভুইঞাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, স্টিমারঘাটে নূতন কোনো খবর এসেছে কিনা। তবারক ভুইঞা বলেছিল, না, কোনো খবর নেই, তবে দু-একদিনের মধ্যে স্টিমার আসবে কিনা সন্দেহ। তখনই নৌকার কথা তুলেছিল। নৌকায় করে যেতে কষ্ট হবে, সময়ও নেবে। পথটা উজানের। স্টিমারে যে-পথ বারো ঘণ্টার মাত্র, নৌকায় সে-পথ অতিক্রম করতে দু-দিন লাগবে। তবু বিলম্ব না করে সে যদি রওনা হয়ে পড়ে তবে সময়মতো ঢাকায় পৌঁছুতে পারবে।

"কাল সকালের জন্যে একটি নৌকা ঠিক করে দেন", মুহাম্মদ মুস্তফা বলেছিল। তবে নৌকায় করেও তার যাওয়া হয় নি, সেদিন রাতে তার ভয়ানক জ্বর ওঠে। এবং দুদিন পরে তবারক ভুইঞা খোদেজার মৃত্যুর কথা জানতে পায়।

কুমুরডাঙ্গায় আসার কিছুদিন আগে মুহাম্মদ মুস্তফার দেশের বাড়ির শ্যাওলা-আবৃত লতাপাতা জলজ-আগাছায় ভরা ডোবার মতো পুকুরে খোদেজার মৃত্যু ঘটে। তখন মুহাম্মদ মুস্তফার শিক্ষানবিশী সবেমাত্র শেষ হয়েছে।

খোদেজার মৃত্যুর খবর আসে গ্রামের চৌধুরীদের ছেলের হাতে লেখা একটি পত্রে; আমি বাড়ি না থাকলে বাড়ির লোকেরা তাকে দিয়েই পত্রাদি লিখিয়ে নিত। খোদেজার মৃত্যুর খবর ছাড়া সে-চিঠিতে আরেকটি কথা ছিল যা মুহাম্মদ মুস্তফা প্রথমবার লক্ষ্য করে নি, কী কারণে চিঠিটা আবার পড়ছে তখন তা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পত্রলেখক যার মুখের কথা অক্ষর-নিবদ্ধ করেছে তার উদ্দেশ্য হয়তো প্রথমে ঠিক বুঝতে পারে নি। পরে বুঝতে পারলেও লিখতে গিয়ে কেমন একটি লজ্জা বোধ করে থাকবে, কারণ দুবার লিখে দুবার কেটে হঠাৎ যেন লজ্জাশরম জয় করে দৃঢ়হস্তে বড়-বড় করে লিখেছে তা। তবে লজ্জাশরম সম্পূর্ণভাবে

BanglaBook.org

জয় করতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ, কারণ ছোট বাক্যটি লিখতে গিয়ে সচরাচর যার বানানে ভুল হয় না তার বানান-জ্ঞান কেমন যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে।

বাক্যটি এবার মুহাম্মদ মুস্তফার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে কিন্তু তার অর্থ সে বুঝতে পারে না, দু-একবার অর্থোদ্ধার করার চেষ্টা করে স্থির করে তা অর্থহীন হবে; কখনো-কখনো গ্রাম্য চিঠিতে অসংলগ্ন বা নিতান্ত অর্থহীন এক-আধটা বাক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়, কারণ অন্যের মুখের কথা বুঝতে পারলেও ভাষার দীনতার জন্যে পত্রলেখক সে-কথা যেভাবে প্রকাশ করে তাতে তা সব সময়ে বুদ্ধিগম্য হয় না।

দু-দিনের ছুটি নিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা যখন বাড়ি অভিমুখে রওনা হয় তখন দুর্বোধ্য বাক্যটি তো বটেই, যে-মৃত্যুর খবরে মনে একটু ঈষৎ আঘাত পেয়েছিল বা সামান্য ব্যথা বোধ করেছিল সে-মৃত্যু সম্বন্ধেও বিস্মৃত হয়ে পড়েছে : জীবন-মৃত্যু দুটিই সে অতি সহজে গ্রহণ করে। আলো-অন্ধকারের মতো জীবন এবং মৃত্যু পাশাপাশি বসবাস করে একই নদীতে মিলিত দুটি ধারার মতো গলাগলি হয়ে প্রবাহিত হয়; দুটিই বিনা বাক্যে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় তার কাছে।

অন্যবারের মতো স্টিমারে করে প্রথমে চাঁদবরণ ঘাটে, তারপর সে-ঘাটে স্টিমার ছেড়ে যথারীতি নৌকার পথ ধরে। ছোট খালের পথ। কখনো ঝুলে-পড়া গাছপালার শাখাপল্লবে ছায়াচ্ছন্ন কখনো উন্মুক্ত স্থানে মেঘনীলাম্বর-প্রতিফলিত স্রোতো হীনপ্রায় সে-খাল মাঠক্ষেত জনপদের মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে, কখনো তীরের বেশ নিচে দিয়ে কখনো তীরের সঙ্গে সমতল হয়ে। পানিতে সোঁদালো গন্ধ, বদ্ধপ্রায় ধারায় নীরবতা, অন্যবারের মতোই লগির ধাক্কায়-ধাক্কায় ছাপরবিহীন খোলা নৌকা এগিয়ে চলে, প্রতিবারই পানিতে তরল আওয়াজ জাগে, প্রতিবারই গলুইর নিশানা কেমন দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে আবার আপনা থেকেই সোজা হয়ে পড়ে। নৌকার মাঝখানে কোনোদিন ছাতার তলে, কোনোদিন শূন্য মাথায় হাঁটু তুলে পিঠ খাড়া করে বসে মুহাম্মদ মুস্তফা এ-পথে কতবার গিয়েছে কোনো দিকে না তাকিয়ে নৌকার গতি লক্ষ্য না করে, খাল থেকে যে-সোঁদালো গন্ধ উঠে ধীরে-ধীরে তার নাসারন্ধ্র ভরে দিয়েছে সে-গন্ধ সম্বন্ধে সজ্ঞান না হয়ে, পানির রঙ হঠাৎ রৌদ্রদীপ্ত আকাশের তলে আকস্মিক উজ্জ্বলতায় ঝল্‌মল করে উঠলেও তাতে চমকিত না হয়ে। সেদিনও সে কিছুই লক্ষ্য করে নি, কিছুই দেখে নি। শুধু তাই নয়। যে-বাড়ি অভিমুখে সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যায় সে-বাড়ির কথাও ভাবে নি।

খালের পর এবার পায়ের পথ। হাতে ছোট বাক্স, যে-বাক্সে অন্যবার বাপ-জান মা-জান তাদের আশ্রিতা বিধবা চাচী এবং চাচীর মেয়ে খোদেজা—সকলের জন্যেই কিছু না-কিছু টুকিটাকি উপহার থাকত। কোনো-কোনোবার অর্থাভাবে বড়দের জন্যে কিছু না থাকলেও খোদেজার জন্যে কিছু থাকত। অনেক সময় বেশ ফ্যান্‌সি ধরনের জিনিস : সখের রঙিন ফিতা বা চিরুনি, বা ছোট হাত-আয়না, কোনোদিন-বা সুগন্ধ তেলের শিশি। সেদিন কারো জন্যে কিছু ছিল না, খোদেজার জন্যেও নয়; মৃত মানুষের জন্যে কেউ উপহার বহন করে নিয়ে যায় না। পায়ের পথের পর আইলের পথ, যে-পথ কোথাও শুষ্ক, কোথাও কর্দমাক্ত, কোথাও দলাবাঁধা। তারপর একটি বাঁশের পুল, শেষ অপরাহ্নের সোনালি আলোয় স্নাত তন্দ্রাচ্ছন্ন জনহীন একটা ঘাটলা। ঘাটলার পর নূতন ছাদের টিনে সুশোভিত ঝুনু মিঞাদের বাড়ি; তারপর পুকুর-মসজিদ, আবার ধানক্ষেত, আবার একটি পুকুর যার উত্তর পাড়ে বরকতপুরের হাট সেদিন শূন্যতায় খাঁখাঁ করে। হাটটি বসে সপ্তাহে দু-দিন : বুধবার আর শনিবার। কোনো-কোনোবার শহর থেকে খোদেজার জন্যে উপহার আনা সম্ভব না হলে এবং দিনটি হাটের দিন হলে সে হাট থেকেই কিছু কিনে নিয়ে গিয়েছে খোদেজার জন্যে। বস্তুত খোদেজার জন্যে কিছু-না-কিছু নিয়ে যায় নি—এমন দিনের কথা মনে পড়ে না। ক্ষণকালের জন্যে তার কথা স্মরণ হয়, তবে শীঘ্র তা ভারহীন সারশূন্য তুলাসম মেঘখণ্ডের মতো মনাকাশে দেখা দিয়ে আবার উড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

BanglaBook.org

পথ শেষ হয়ে এসেছে। আসফ তরফদারের কলাবাগানের পাশে অল্পক্ষণ হাঁটার পর হিজলগাছের দক্ষিণ দিকে সহসা বাড়িটা জেগে ওঠে।

মুরুব্বিদের সালাম কদমবুচি জানিয়ে সেদিন সে অন্যবারের মতো স্বাভাবিক শুষ্ক নিম্নকণ্ঠে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে নি, তবে অভ্যাসমত ঘর্মাক্ত শার্ট-গেঞ্জি এবং ধুলাচ্ছন্ন কর্দমাক্ত জুতা খুলে উঠানে হাত-পা ধুয়ে শীতল হয়। তারপর অন্যবারের মতো ডাবের পানি আসে। কেবল খোদেজা নয়, তার মা-ই আনে। সন্ধ্যা কাটলে অন্যবারের মতো তার আগমন উপলক্ষে জ্বালানো বড় হ্যারিকেনের লণ্ঠনের আলোয় খেতে বসলে কেবল দুই জোড়া চোখই তার খাওয়া পরিদর্শন করে—মা এবং চাচীর, পেছনে স্বল্প-আলোকিত স্থানটি খোদেজার অভাবে শূন্য থাকে। খাওয়া শেষ হলে যে-উঠানের প্রান্তে তখন গাছগাছালি ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে জোনাকিরা জ্যোতিষ্মান হয়ে বা অর্ধঘুমন্ত পাখিরা মধ্যে-মধ্যে অকস্মাৎ ডানা ঝাপটিয়ে প্রাণসঞ্চারের বৃথা চেষ্টা করছিল সে-উঠানে নেবে সজোরে গলা সাফ করে একাই হাতমুখ ধোয়, খোদেজা সে-রাতে বদনা থেকে পানি ঢেলে তাকে সাহায্য করে না। বাড়িতে ফেরা অবধি একবারও সে খোদেজার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে নি, এবারও করে না; ঘরে বা আঙ্গিনায় কোথাও যে মেয়েটির দেহ আর ছায়া ফেলে না, সে যে আর নেই, বাড়ি পৌঁছার পর যে-মাটির ঢিবির সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া-দরুদ পড়ে তার রুহের জন্যে শান্তি কামনা করেছে সে-মাটির তলে সে যে চিরনিদ্রায় শায়িতা—এসব কথা পত্রযোগে তার মৃত্যুর সংবাদটি যখন জানতে পায় তখনই মেনে নিয়েছিল। পরদিন সকালে বাড়ির পশ্চাতে শ্যাওলা-ঢাকা লতাপাতা-উদ্ভিদে সমাকীর্ণ ডোবার মতো পুকুরের পাড়ে যখন হাতমুখ ধোবার জন্যে উপস্থিত হয় তখন সেখানে সে কিছু সন্ধান করে না; সেখানে যা ঘটে গিয়েছে তার কোনো চিহ্ন থাকার কথা নয় : একটি জীবন যে-ভাবেই শেষ হোক না কেন সে-জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর পুকুরের পিছল ঘাটে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে নাস্তাপানি করে রীতিমাফিক উত্তর-ঘরে কথালাপের জন্যে উপস্থিত হয়। আমার মা, অর্থাৎ তার বড় চাচী পান সাজিয়ে তার সামনে ধরে, তারপর মুখে পান পুরে তা রসালো করে নেবার জন্যে তাকে একটু সময় দিয়ে সহসা কথাটি বলে—যে-কথা চৌধুরীদের ছেলে দু-বার লিখে দু-বার কেটে তৃতীয় বার বানানে গোলযোগ করে বড়-বড় সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখেছিল। আমার মায়ের মুখটা সুচালো; তাই সে যখন কথা বলে তখন অনেক সময় মনে হয় সে বুঝি মস্করা করছে। তবে তার চোখের দিকে তাকালেই নিমেষে ভ্রম ভাঙে। সমস্ত জীবনের ব্যথা-বেদনা সে-চোখে যেন কেন্দ্রীভূত।

আমার মা বলে, মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যে খোদেজা পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।

তবারক ভুইঞা (সে কি সত্যিই তবারক ভুইঞা? আমার ভুল হয় নি তো?) বলছিল : সুসংবাদের চেয়ে দুঃসংবাদে, সুখের চেয়ে দুঃখেই কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের বেশি বিশ্বাস। বস্তুত সর্বপ্রকার মছিবতের জন্যে তারা সদা-তৈরি, এবং একবার কোনো মছিবত এলে তার অস্তিত্ব বা ন্যায্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না। তারা এ-ও জানে যে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন রূপে মানুষের জীবনে মছিবত দেখা দেয় : কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে, কখনো ধ্বংসাত্মক ঝড়-তুফানের মতো সগর্জনে, কখনো ফসল-পোড়ানো অনাবৃষ্টির মতো নিঃশব্দে, কখনো মহামারীর মতো অদৃশ্যভাবে, কখনো প্লাবনের মতো প্রকাশ্যভাবে, কখনো তৈলাক্তদেহ রাতচোরের বেশে, কখনো শস্ত্রসজ্জিত নিষ্ঠুর ডাকাতের মূর্তিতে। অতএব নদীতে চড়া পড়েছে এবং সে-জন্যে স্টিমার চলাচল বন্ধ হয়েছে—এ-সব ঘটনার মধ্যে সুপরিচিত মছিবতের চেহারাই দেখতে পায় তারা, তাদের অসহায়তা সম্বন্ধেও তাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না। অবশ্য ঘটনাটি বড়ই দুঃখের, যারা স্টিমারে কখনো চড়ে নি তারাও স্টিমারঘাটের আকস্মিক নীরবতায় দুঃখবোধ করে; স্টিমারে চড়ে কোনোদিন কোথাও যাবার সৌভাগ্য না হলেও তারা আজীবন প্রতিদিন তার বংশীধ্বনি শুনেছে, ঘাটে উপস্থিত না থাকলেও

BanglaBook.org

জানতে পেরেছে কখন স্টিমার এসেছে, কখন যাত্রী নাবিয়ে যাত্রী তুলে আবার আপন-পথে চলে গিয়েছে : দিনের পর দিন বছরের পর বছর, বস্তুত যতদূর স্মৃতি যায় শ্রুতি পৌঁছায় ততদিন এমনি চলেছে, কখনো অন্যথা হয় নি। এবং যাদের জন্যে স্টিমারটি অপরিহার্য বস্তু, ব্যবসা-বাণিজ্য মামলা-মকদ্দমা এবং শতপ্রকারের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে তা ব্যবহার করে থাকে, তাদের কাছে ঘটনাটি নিতান্ত শোচনীয় বলে মনে হয়। তবু নদীতে চড়া পড়লে কী আর করা যায়, কপাল মন্দ হলে কাকেই-বা দোষ দেওয়া যায়?

তবে সে-বার একটি বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে, কারণ দু-দিন পরে সহসা কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা স্থির করে নদীতে চড়া পড়েছে তা সত্য নয়, অতএব স্টিমার না আসারও কোনো যুক্তি নেই। হয়তো শহরের নেতৃস্থানীয় প্রবীণ উকিল কফিলউদ্দিন সাহেব নিজেই এ-বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ না করলে এমনটি ঘটত না; যা শহরের নেতৃস্থানীয় মুরুব্বি মানুষ বিশ্বাস করে না তা অন্যেরাই বা বিশ্বাস করবে কেন? এমন লোক রাতকে দিন বললে অনেকেই যে তমসাচ্ছন্ন রাতেও সূর্যালোক দেখতে পায়, তেমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

সেদিন স্টিমারঘাট থেকে উকিল কফিলউদ্দিন সোজা বার-লাইব্রেরি চলে গিয়েছিল। ততক্ষণে স্টিমার না-আসার খবর সেখানে পৌঁছে গেছে এবং সে-বিষয়ে উত্তেজিতকণ্ঠে আলাপ-আলোচনা চলছে। তাতে অল্পসময়ের জন্যে অন্যমনস্কভাবে যোগ দিয়ে উকিল সাহেব নীরব হয়ে পড়ে; আকস্মিক কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সে-বিষয়ে প্রথমে আপন মনে ভেবে দেখতে সে ভালোবাসে, কারণ পরের বুদ্ধিমত্তা বা মতামতের ওপর তার বিশ্বাসটি কম। নীরবতার আরেক কারণ ছিল। সে বুঝতে পারে কুমুরডাঙ্গা শহরের বা তার অধিবাসীদের ক্ষতি-অসুবিধার কথায় নয়, নিতান্ত একটি ব্যক্তিগত কারণে সে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। স্টিমার-চলাচল যদি সত্যিই বন্ধ হয় তবে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে কি একটি বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হবে না? সকলের পক্ষে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে একই স্থানে বসবাস করা সম্ভব নয়, ঘটনাচক্রে কার্যোপলক্ষে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবু কোনো আপদ-বিপদ ঘটলে তারা মিলিত হয় এবং রেল-স্টিমার থাকলে সহজে এবং অবিলম্বেই পরস্পরের নিকটবর্তী হতে পারে। কুমুরডাঙ্গা থেকে স্টিমার উঠে গেলে সেটি কী একটি সমস্যায় পরিণত হবে না? এবং তেমন চিন্তা যে অহেতুক নয়, তার জ্বলন্ত প্রমাণও সে কি ইতিমধ্যে পায় নি? কোনো জরুরি মামলা-মকদ্দমার কাজে যাচ্ছে—এ-কথা সকলকে বলে থাকলেও আসলে সে তার সদর শহরবাসিনী অতি আদুরে মেয়ে হোসনাকে দেখবার জন্যেই স্টিমার ধরতে গিয়েছিল। আসল কথা লুকিয়েছিল দুই কারণে। প্রথমত, যে-উকিল এ-স্থানে সে-স্থানে ছুটাছুটি করে, মক্কেলের চোখে তার দাম বেশি। দ্বিতীয়ত, স্নেহকাতর উকিলের ওপর মক্কেলদের বিশ্বাস কম হয় : উকিলের মধ্যে হৃদয়হীন চরিত্রেরই সন্ধান করে তারা। তবে শুধু মক্কেলদের কাছ থেকে নয়, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও সে মেয়েটির প্রতি তার গভীর স্নেহ-ভালোবাসার কথা সযত্নে লুকিয়ে রাখে : যে-স্নেহ পুষ্পের মতো পবিত্র এবং সৌরভময়, সে-স্নেহকে সূর্যালোকে প্রকাশ করতে নেই বলে তার বিশ্বাস।

বিয়ের পর থেকে আজ তিন বছর যাবৎ তার মেয়ে হোসনা স্বামীর সঙ্গে সদর শহরে বাস করে এবং এ-উছিলা সে-উছিলায় প্রায়ই উকিল কফিলউদ্দিন সেখানে হাজির হয় মেয়েটিকে দেখতে। ক-দিন ধরে কেমন খেয়াল, মেয়েটির সুমি শরীরটা ভালো নয়। তেমন খেয়ালের কারণ নেই, তবু যে-কথা আপনা থেকেই মনে জাগে সে-কথা সচরাচর সে হেলা করে না।

"কী বলেন উকিল সাহেব?" একজন অল্পবয়স্ক সহযোগী জিজ্ঞাসা করে।

"ভাবছি।" গলা কেশে, রহস্যময়ভাবে সে উত্তর দেয়!

দু-দিন পরে সন্ধ্যার পর উকিল কফিলউদ্দিন তার বাড়ির বৈঠকখানায় বসে ছিল, সামনে দু-চারজন মক্কেল।

উকিল কফিলউদ্দিনের নদীমুখো দোতলা বাড়িটি শহরের অন্যান্য বাড়ির তুলনায় মস্ত বড়

BanglaBook.org

মনে হয়, বাড়িটি নিয়ে উকিলের গর্বও কম নয়। বাড়িটি হালের নয়। সেটি যখন তৈরি হয় তখন দোতলা বাড়ি তো দূরের কথা, গুটি কয়েক সরকারি দালান-কোঠা ছাড়া সারা শহরে আর কোনো বে-সরকারি পাকা বাড়ি ছিল না। একদা শহরের একজন নামকরা হিন্দু উকিল বাড়িটি তৈরি করেছিল, বহুদিন তাতে বসবাসও করেছিল। বৃদ্ধ বয়সে সে-উকিলের মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী কলকাতায় চলে গেলে একটি দরিদ্র আত্মীয় পরিবার অনেকটা পাহারাদার হিসেবেই বাড়িটিতে বসবাস করে। তখন সে-বাড়িতে রাতের বেলায় আলো দেখা যেত না, দিনে বা রাতে সেখান থেকে কোনো সাড়াও আসত না। এ-সময়ে অনাদরে প্রেতপুরীসম বাড়িটির বাইরের আস্তর খসে পড়তে শুরু করে; যারা রাতে প্রদীপ জ্বালায় না তারা দেয়ালে কলি ফেরাবে কেন? তবে এ-সময়েই কফিলউদ্দিনের দৃষ্টি পড়ে বাড়িটির ওপর। তখন সে নবীন উকিল, মুখে দাড়ি নেই কিন্তু মস্ত বড় ঝুলে-পড়া কাস্তের মতো বাঁকা গোঁফ, পরে কয়েক বছরের জন্যে যার বিপরীতটাই ঘটে; তার গোঁফ অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু মস্ত একটি দাড়ি দেখা দেয় বুক জুড়ে। বর্তমানে তার মুখ দাড়িগোঁফ শূন্য। যুবক উকিলের চোখে বাড়িটি প্রাসাদের মতো *ঠেকে*। তাছাড়া তার মনে হয় বাড়িটির ক্ষুদ্র জানালাগুলি কী গভীর রহস্যের ইঙ্গিত দেয়, স্বল্পপরিসর বারান্দাটির সামনে গোলাকার স্থূল, উত্তুঙ্গ খামগুলিতে যেন আভিজাত্যের পরিচয়, আস্তর খসে পড়লেও দেয়ালের অনাবৃত অংশে অবিনশ্বরতার প্রমাণ। সে-পথে আসতে-যেতে প্রথমে সে কেবল বাড়িটি তাকিয়ে দেখত, ইতিমধ্যে মনের কোথাও অস্ফুট কোনো আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়ে থাকলে তা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সাহস পেত না। তারপর একদিন দুস্থ বা কৃপণ পরিবারটির অভিভাবক স্থানীয় একমাত্র পুরুষটির মৃত্যুর পর অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অন্য একটি পরিবার সে-বাড়িতে স্থান পায়। এ-সময়ে সন্ধ্যার পর আলো দেখা যেতে শুরু করে, কখনো-কখনো তার অভ্যন্তর থেকে বীণা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কারও শোনা যেতে থাকে। ততদিনে উকিল কফিলউদ্দিনের মনের অস্ফুট আকাঙ্ক্ষাটি স্পষ্টরূপ ধারণ করেছে, পসারও বেশ হতে শুরু করেছে। শীঘ্র তার মনে হয়, বাড়িটির অভ্যন্তর থেকে সন্ধ্যার পর যে-বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার ভেসে আসে তা যেন তাকে উপহাস করে : সুস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষাই কি স্বপ্ন চরিতার্থ করার জন্যে যথেষ্ট? সে-উপহাস বেশিদিন সে সহ্য করে নি, একদিন হেমন্তের অপরাহ্ণে বাড়িটির স্বত্বাধিকার ক্রয় করে যে-ছায়াচ্ছন্ন রহস্য বহুদিন ধরে তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে সে-রহস্য ভেদ করে, বাদ্যযন্ত্রটিকেও নীরব করে। বাড়ির সঙ্গে আসবাবপত্রও কিনেছিল—সেকেলে আমলের দুর্জয় গোছের মজবুত কিন্তু অতিশয় ভারি আসবাবপত্র; সে যেন জিদ ধরেছিল সে-বাড়ি থেকে কিছুই হস্তান্তর হতে দেবে না। সব কিছু মিলে বেশ দাম পড়েছিল, কিন্তু সে দ্বিরুক্তি করে নি। হয়তো তার মনে হয়েছিল, বাড়িটি কিনে, তারপর যে-সব আসবাবপত্র সুনামধারী উকিল একদিন ব্যবহার করেছিল সে-আসবাবপত্রের মালিক হয়ে সে-উকিলের যশ-ভাগ্যেরই অংশীদার হচ্ছে। লোকেরা বলে, উকিল কফিলউদ্দিন যখন জটিল কোনো মামলা নিয়ে কিছু মুশকিলে পড়ে, জয়ের পথ খুঁজে পায় না, তখন বাড়িটির প্রাক্তন মালিক যে বহুদিন হল ইহজগৎ ত্যাগ করে গেছে, সে তার স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাকে মন্ত্রণা দেয়, ধারা-উপধারা নজিরি আইন বাতলে দেয়। বাড়ি-আসবাবপত্রের জন্যে সে বেহুদা বেশি দাম দেয় নি।

সে-বাড়ির বৈঠকখানায় নথিপত্রে-ঢাকা টেবিলের ওপর স্থাপিত লণ্ঠনের পশ্চাতে বসে উকিল কফিলউদ্দিন কোনো মামলার জট খোলার চেষ্টায় রত ছিল, মুখে আত্মমগ্ন ভাব, মন স্টিমারঘাট নদনদী থেকে বহুদূরে। ভেতর থেকে হুঁকা আসে—মক্কেলদের জন্যে সাধারণ হুঁকা, তার জন্যে নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি। কিছুক্ষণের জন্যে ঘরটি হুঁকা-গুড়গুড়ির শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে, ক্রমশ ধূমায়িতও হয়ে পড়ে, তার পশ্চাতে মানুষের মুখগুলি অস্পষ্ট দেখায়। পরে পান আসে; বড় পেতলের থালায় করে সাধারণ পান, রূপার পিরিচে সেজে সাচি পান। তারপর কখন উকিল কফিলউদ্দিন কথা বলতে শুরু করে। তবে তার কণ্ঠে যেন ঘুমের আমেজ;

BanglaBook.org

সে-কণ্ঠ অবিরাম গুঞ্জনের মতো শোনায়। তারপর এক সময়ে সহসা সে এমনভাবে কেশে ওঠে যেন কাশিটি পূর্বাভাস না দিয়ে অকস্মাৎ তাকে অভিভূত করে ফেলেছে, এবং মুখে যা উঠে আসে তা নিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে হঠাৎ পাশে ঝুঁকে টেবিলের পশ্চাতে অদৃশ্য একটি পিক্‌দানিতে সশব্দে থুথু ফেলে। নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য সে-পিক্‌দানি থেকে এবার সচকিত একটি মাছি উঠে এসে অন্ধের মতো নিঃশব্দে ঘুরপাক দিয়ে পশ্চাতের দেয়ালে টাঙ্গানো ফ্রেমে-বাঁধা সোনালি অক্ষরে লিখিত আল্লার নামের এক প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে; হয়তো রূঢ়ভাবে ঘুমে-ব্যাঘাত-পাওয়া ক্ষুদ্র জীবটির কাছে সমগ্র বৈঠকখানার মধ্যে সে-স্থানটিই সবচেয়ে নিরাপদ মনে হয়। এবার ঘরে যে-আকস্মিক নীরবতা নাবে সে-নীরবতার মধ্যে সবাই দেখতে পায়, উকিল চোখ নিমীলিত করেছে।

উকিল কফিলউদ্দিনের চরিত্র অনেক দিন থেকে পরস্পরবিরোধী, যেন বার্ধক্যে উপনীত হয়েও তার আসল চরিত্রটি যে কী, বা কোন চরিত্র তার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত এবং মানানসই—সে-বিষয়ে এখনো মত স্থির করতে পারে নি। কখনো মনে হয় তার মধ্যে হীনতা-নীচতা কল্পনাতীত, এবং সে এমন মানুষ যাকে গভীরভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই কারণ তার দেহের প্রতি অন্ধ্র-রন্ধ্র দিয়ে দয়ামায়া ক্ষমাশীলতাই নিঃসৃত হয়। আবার আকস্মাৎ সে-মানুষের মধ্যেই কুটিলতা-হিংস্রতা উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। হয়তো তখন তার সহসা মনে পড়ে মক্কেলরা উকিলের নিকট দয়ামায়া-ক্ষমাশীলতা আশা করে না। তবু মক্কেলদের আশানুযায়ী আচরণের প্রয়োজন বুঝলেও আবার অন্তরে কোথাও মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধার জন্যে একটি তীব্র বাসনাও বোধ করে থাকবে। হয়তো তার চরিত্রের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ভাবের কারণ এ-দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব। তবে তার চরিত্র যে-রূপই ধারণ করুক না কেন, তার অন্তরে রাতের হাওয়ার মতো গুপ্তভাবে যে-চিন্তা-ধারা প্রবাহিত হয় তার আভাস কদাচিৎ বাইরে ধরা পড়ে, যদি-বা তার গোঙ্গানি শোনা যায় তার চেহারা দেখা যায় না, তার গতিবিধিও বোঝা যায় না। রক্তাক্ত চোখে বিষম ক্রোধ প্রকাশ করলেও সেটি সত্যিকার ক্রোধ না-ও হতে পারে, আবার যখন সে অমায়িকতায় নরম কোমল হয়ে ওঠে সে-সময়ে তার অন্তরে ক্রোধের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলা সম্ভব। হয়তো সবটাই অভিনয়, পরের সুখ-দুঃখ আপনার করে নিয়ে সে-সুখ-দুঃখের কাহিনী আবার ব্যক্ত করে বলে প্রত্যেক উকিলই এক রকমের অভিনেতা।

তবে কফিলউদ্দিন যখন হঠাৎ নীরব হয়ে পড়ে চোখ নিমীলিত করে তখন তা অভিনয় বলে মনে হয় না, বরঞ্চ মনে হয় সহসা বাহ্যিক জগৎ সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে সে তার অন্তরের গুপ্ত হাওয়ার আওয়াজ শুনছে। জনবাদ এই যে, সে যখন চোখ নিমীলিত করে এমনিভাবে স্তব্ধ-নীরব হয়ে পড়ে তখন বিপক্ষ দলের উকিল তো বটেই জজ-হাকিমও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এই কারণে যে তার অন্তরের অদৃশ্য হাওয়া তাকে কী পরামর্শ দেবে সে-বিষয়ে আগেভাগে নিশ্চিত হওয়া শক্ত।

অনেকক্ষণ উকিল কফিলউদ্দিন নিমীলিত চোখে নির্বাক হয়ে থাকে। তারপর সে-অবস্থাতেই কী একটি দুর্বোধ্য প্রয়োজনে বা তাড়নায় ধীরে-ধীরে পা দুটি চেয়ারের ওপর তুলে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে বসে। এমনিভাবে চেয়ারে পা তুলে বসা তার অভ্যাস; প্রথমে পা ঝুলিয়ে বসেও তারই অজান্তে এক সময়ে সে তার পা দুটি তুলে নেয় চেয়ারের ওপর।

এবার টেবিলের পশ্চাতে লম্বা-চওড়া মানুষটিকে বিশালকায় দেখায়, এবং পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে বসার দরুন দেহটা সামনের দিকে কিছু ঝুঁকে থাকে বলে তার সমগ্র ভঙ্গিতে একটি নিবিড় একাগ্রতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; নিমীলিত চোখে সে যেন গভীর মনযোগ-সহকারে কিছু পরীক্ষা করে দেখে।

তারপর সহসা সে চোখ উন্মীলিত করে। সে-উন্মীলিত চোখে আকস্মিক ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ।

BanglaBook.org

"কোথায় চড়া পড়েছে, কেই-বা বলেছে চড়া পড়েছে?" সে জিজ্ঞাসা করে।

চৌধুরীদের ছেলেকে দিয়ে লেখানো চিঠিতে যে-কথা তারা জানিয়েছিল বড় চাচী সে-কথারই পুনরাবৃত্তি করলে মুহাম্মদ মুস্তফা প্রথমে বিস্মিত হয়, তারপর বুঝতে পারে যতই অর্থহীন হোক না কেন তা কানে না তুলে উপায় নেই। তবে সে কিছু বলে নি। কী বলবে বুঝে উঠতে পারে নি। সে জানে, বাড়ির লোকেরা মধ্যে-মধ্যে এমন সব কথা বলে থাকে যা বুদ্ধি-যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যায় না, তবু প্রতিবাদে কিছু বলাও যায় না; বস্তুত যতই উদ্ভট রূপ ধারণ করে তাদের বক্তব্য ততই কিছু বলা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। এ-জন্যেই বলা যায় না যে তখন মনে হয় তারা যা বলে তার পশ্চাতে অন্য কী-একটা অর্থ আছে, অন্যকিছু বলা তাদের উদ্দেশ্য, হয়তো সত্য কথা বলার সাহস নেই বলে হেঁয়ালি বা রূপক বাক্যের শরণাপন্ন হয়েছে। কখনো-কখনো মনে হয়, প্রতিবাদ করে লাভ কী, অন্য কেউ কি যথার্থ উত্তর জানে? ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ তল্লাশের প্রয়াসে তারা যতই গভীর পানিতে তলিয়ে যায় ততই তাদের দৃষ্টি পথে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে ওঠে, কিন্তু যারা ওপরে ভেসে থাকে তারাই-বা কি তাদের চেয়ে বেশি দেখতে পায়? কখনো তারা দুটি সম্বন্ধশূন্য ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ খুঁজে পায়, ভাবে প্রথম ঘটনাটি না-ঘটলে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটত না, কিন্তু দুটির মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই বললেই কি দ্বিতীয় ঘটনাটি কেন ঘটেছিল তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে?

খোদেজার মৃত্যু কীভাবে ঘটেছিল কে জানে; হয়তো সে ঘাট থেকে বেকায়দায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল আর উঠতে পারে নি, হয়তো পানিতে নাবার পর কোনো রহস্যময় কারণে সহসা তার জীবন-প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। তবে মুহাম্মদ মুস্তফার চিঠি আসার কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু ঘটেছিল বলে তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে সে-চিঠিই মেয়েটির মৃত্যুর কারণ। মুহাম্মদ মুস্তফা লিখেছিল, তসলিম নামক একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ বন্ধুর ঘটকালিতে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেবের তৃতীয়া কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হয়েছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেব হজে রওনা হবেন। তাঁর ঐকান্তিক বাসনা প্রস্থানপূর্বে জাগতিক-পারিবারিক সমস্ত দেনা-পাওনা, দায়-দায়িত্ব চুকিয়ে নেবেন। এই কারণে আগামী জুমাবারেই বিবাহের দিন নির্ধারিত হয়েছে। চিঠিটা এসে পৌছায় দুপুরের দিকে। অল্প সময়ের মধ্যে চৌধুরীদের ছেলেটিকে ধরে আনা হয়; সে-দিনও আমি বাড়ি ছিলাম না। তারপর উঠানে দাঁড়িয়ে ছেলেটি সকলের অনুরোধে একবার নয় দু-বার নয় তিন-তিন বার ইস্কুলের পাঠপড়ার ভঙ্গিতে উচ্চস্বরে চিঠিটা পড়ে শোনায় যাতে সকলেই তার বিষয়বস্তু নির্ভুলভাবে শুনবার এবং উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। চিঠির বিষয়বস্তু খোদেজাও শুনেছিল; উত্তর-ঘরের গা-ঘেঁষে-ওঠা বড়ইগাছের তলে সে দাঁড়িয়ে ছিল। চিঠি পড়া শেষ হলে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির পশ্চাতে শ্যাওলা-আবৃত পুকুর অভিমুখে সে রওনা হয়। সে-পুকুর থেকে জীবিত অবস্থায় মেয়েটি ফিরে আসে নি। কিন্তু চিঠির সঙ্গে মেয়েটির মৃত্যুর কোনো সম্বন্ধ থাকবে কেন? নিঃসন্দেহে ধারণাটি নিতান্ত ভিত্তিহীন। তবে এমন একটা ধারণা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন তা বললেও মেয়েটির আকস্মিক মৃত্যুর কারণটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে না। বরঞ্চ সে-চিঠিই মৃত্যুর কারণ—তেমন একটি কথা বিশ্বাস করতে পারলে বাড়ির লোকেরা হয়তো দুর্বোধ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ায় সামান্য আলো দেখতে পাবে, একটু সান্ত্বনা পাবে, ভয় বা অসহায়ভাব কিছু লাঘব হবে।

এ-সময়ে প্রতিশ্রুতিটির কথাও কে যেন তোলে। বড় চাচী নয়, অন্য কেউ কথাটি তুলে থাকবে। তার উত্থাপনে মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু চমকিত হয়, এবং তার ফুফু অর্থাৎ মৃত মেয়েটির মা সহসা মুখে আঁচল গুঁজে অদম্যভাবে সমগ্র দেহে থরথর করে কেঁপে কাঁদতে শুরু করলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে প্রতিশ্রুতিটি একটি মহাসত্যের রূপ ধারণ করে, ক্ষণকালের জন্যে মুহাম্মদ মুস্তফা তার বুকে কোথাও ঈষৎ একটা বেদনাও বোধ করে।

BanglaBook.org

প্রতিশ্রুতিটির কথা অসত্য নয়। বিধবা হয়ে ছয়-সাত বছরের খোদেজাকে নিয়ে ছোট ফুফু যখন উত্তর-ঘরে আশ্রয় নেয় তখন মুহাম্মদ মুস্তফার বাপ খেদমতুল্লা বোনের দুঃখে দুঃখপরবশ হয়ে স্থির করে মুহাম্মদ মুস্তফা বড় হয়ে খোদেজাকে বিয়ে করবে। তখন ওয়াদা করার বয়স হয় নি মুহাম্মদ মুস্তফার, হলেও তার মতামতের জন্যে কেউ অপেক্ষা করত কিনা সন্দেহ। তবে নিঃসন্দেহে সে-সময়ে বাড়ির লোকেরা গুরুতরভাবেই প্রতিশ্রুতিটি গ্রহণ করেছিল, এবং হয়তো মুহাম্মদ মুস্তফাও তারই অজান্তে সেটি তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটি চুক্তি বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। সে-জন্যেই কি বড় হয়ে প্রতিবার দেশের বাড়িতে আসবার সময়ে খোদেজার জন্যে সে টুকিটাকি উপহার নিয়ে আসত না—একটি রঙিন ফিতা, ছোট একটি আয়না, চিরুনি, সুগন্ধ তেলের শিশি? তবে এ-কথাও সত্য যে খোদেজার জন্যে সে-সব উপহার আনা বন্ধ না করলেও ক্রমশ একটি নীরবতার মধ্যে সে প্রতিশ্রুতি একদিন সারশূন্য উক্তিতে পর্যবসিত হয়ে পড়ে; যা একসময়ে গভীরভাবে ভারি হয়ে মানুষের মনে বিরাজ করেছে, যা অলঙ্ঘনীয়ও মনে হয়েছে—তা সহসা একদিন বাস্তবের উগ্র আলোয় এবং অবস্থান্তরিত সত্যের তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিচে বুদ্‌বুদের মতো উড়ে গিয়েছে পশ্চাতে কোনো দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ রেশও না রেখে। বস্তুত বহুদিন কথাটি কেউ তোলে নি; যে-মানুষ ইতিমধ্যে কী-একটা রহস্যময় উচ্চাশায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের বাড়ির ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষার্থে দূরে চলে গিয়েছে, সে-মানুষের দিকে তাকিয়ে কথাটি তুলতে কারো হয়তো সাহস হয় নি। কিছুদিন আগেও বড় চাচী খোদেজার বিয়ের কথা তুলেছিল। ঈদের উপলক্ষে পাওয়া চাঁপাফুলের মতো হলদে শাড়ি পরে খোদেজা উঠান অতিক্রম করে দক্ষিণ-ঘরের দিকে যাচ্ছিল, সে-সময়ে তার বড় চাচী সহসা তার বিয়ের কথা পাড়ে। তবে সে-দিনও সে প্রতিশ্রুতিটার কোনো উল্লেখ করে নি। সত্যি, একদিন প্রতিশ্রুতিটার কিছু আর থাকে নি। সেটি সমস্ত অর্থ হারিয়ে না ফেললে মুহাম্মদ মুস্তফা যখন বন্ধু তসলিমের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে তখন ক্ষণকালের জন্যেও কি দেশের বাড়ির দিকে তার মন ফিরে যেত না, কোনো দায়িত্ববোধের স্মৃতি হঠাৎ জেগে উঠে তাকে ঈষৎ বিচলিত করত না?

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মুহাম্মদ মুস্তফার মনে একটি সন্দেহের ছায়া দেখা দেয় : সবাই ভুললেও হয়তো খোদেজা প্রতিশ্রুতিটি ভুলতে পারে নি, বরঞ্চ সমগ্র অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ করেছিল এবং তাই মুহাম্মদ মুস্তফা প্রতিশ্রুতি রাখবে না দেখে গভীরভাবে আঘাত পেয়েছিল। সেটা অসম্ভব নয়। তবু সে-জন্যে সে কি আত্মহত্যা করবে? যেখানে তার জন্ম, যে-পরিবেশে সে বড় হয়েছে, সেখানে এমন একটি কাজ কি সম্ভব? না, কাদায় ফুল ফোটে না। তাছাড়া যে-মানুষ আত্মহত্যা করবার ক্ষমতা রাখে সে-মানুষ দশজনের মতো হয়, এবং তেমন মানুষের মন সযত্নে ঢাকা থাকলেও ক্বচিৎ-কখনো বিদ্যুৎঝলকের মতো আত্মপ্রকাশ করে থাকে, যে-বিদ্যুৎঝলক অন্ধের চোখেও ধরা পড়ে। মুহাম্মদ মুস্তফা এমন কোনো বিদ্যুৎঝলক কখনো লক্ষ করে নি। আরেকটি প্রশ্নও তার মনে জাগে। কী জানি, হঠাৎ হয়তো সাময়িকভাবে মেয়েটির মতিভ্রম হয়েছিল। কিন্তু তা-ও কি সম্ভব? উত্তর-ঘর দক্ষিণ-ঘর, ক্ষুদ্র লেপাজোকা উঠান, পশ্চাতে ডোবার মতো ছায়াচ্ছন্ন ছোট পুকুর—এ-সবের মধ্যে যার জীবন সীমাবদ্ধ সে-মানুষ একটি জিনিস কখনো হারায় না : তা মনের সুস্থতা। দুঃখ-দুর্দশা নিরাশা-নিষ্ফলতায় জর্জরিত জীবনে মনের সুস্থতা হারালে বাকি থাকে কী? কখনো-কখনো এমন মেয়ের ঘাড়ে ভূত চাপে, যে-ভূত ওঝা এসে তাড়ায়। তবে ভূত যত বড় হোক না কেন, যতই দিশেহারা করে ফেলার ক্ষমতা রাখুক না কেন, ভূতচাপা মেয়ের বাঁচবার বা আত্মরক্ষার প্রবল ইচ্ছা দমন করতে পারে না। প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে এমন মেয়ের মনে নিদারুণ আঘাতের সৃষ্টি করলেও সে কখনো আত্মহত্যা করবে না।

যারা প্রতিশ্রুতিটির উল্লেখ করেছিল, তারা সে-বিষয়ে শীঘ্র নীরব হয়ে পড়ে। হয়তো তারা বুঝতে পারে, যুক্তিটা এমনই যা নিয়ে জোর দিয়ে কিছু বলা সহজ নয়। প্রতিশ্রুতি দিলে

BanglaBook.org

প্রতিশ্রুতি রাখতেই হয়, একবার প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভাঙ্গা একটি গর্হিত কাজ—এসব কথা দাবি করতে তাদের সাহস হয় না। এসব দাবি জানালে মানুষের দাবির কি আর অন্ত থাকবে? অতএব প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে মৃত মেয়েটির অন্তর নিয়ে তারা নানাপ্রকারের কিচ্ছাকাহিনীর জাল বুনতে শুরু করে। পরদিন থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। কখনো প্রবল ধারায় কখনো টিপটিপ করে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টি পড়ে, নদী-খাল-বিল কানায় কানায় ভরে ওঠে, ঝোপঝাড়-লতাপাতা শোকাপ্লুত কোনো বধূর ছায়াচ্ছন্ন অশ্রুসজল চোখের রূপ ধারণ করে। বৃষ্টির সঙ্গীতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাড়ির মেয়েরা নূতন-নূতন তথ্য আবিষ্কার করে নানাপ্রকারের বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মৃত মেয়েটিকে নিয়ে তাদের কল্পনাপ্রসূত কাহিনীটি অলঙ্কৃত করে। সবাই সেদিন রৌদ্রউত্তপ্ত দুপুরে বরইগাছের তলে দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েটিকে দেখতে পায়। চৌধুরীদের ছেলে মুহাম্মদ মুস্তফার চিঠি পড়ছে। চিঠির মর্মার্থ বুঝতে মেয়েটির যেন কিছু সময় লাগে, নিষ্ঠুর সত্য গ্রহণ করতে তার মন যেন কিছুতেই রাজি হয় না। তারপর সহসা তার মুখ বজ্রাহত মানুষের মতো নিথর হয়ে পড়ে। তারা মেয়েটিকে পুকুরের দিকে যেতেও দেখে, এবং এত কিছু বুঝে থাকলে বা দেখে থাকলে মেয়েটির গর্ভধারিণীর মনেও কেন ঈষৎ আশঙ্কা জাগে নি—এমন প্রশ্ন না জিজ্ঞাসা করে তারা বলে, মেয়েটি যখন পুকুর অভিমুখে রওনা হয় তখন তার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল সে যেন সহসা ইহজগতের সমস্ত মায়া কাটিয়ে উঠেছে, বেঁচে থাকার সাধ আর নেই।

শুধু সে-দিনের কথা নয়, আগের অনেক কথা নিয়ে তাদের কাহিনী ধীরে-ধীরে বিকশিত হতে-থাকা পুষ্পের মতো পুষ্পিত হয়, কণ্টক নিয়ে, সৌরভ নিয়ে। কেবল সে-কণ্টক মুহাম্মদ মুস্তফাকে বিদ্ধ করে না, ব্যথা দেয় না, সে-সৌরভও তাকে মোহিত করে না : কাহিনীটা রূপকথার মতো শোনালেও রূপকথা নয়। কত কথা। মুহাম্মদ মুস্তফা বাড়ি আসছে খবর পেলে খোদেজা অধীর হয়ে দিন গুণত, অকারণে থেকে-থেকে তার দৃষ্টি ছুটে যেত উঠানের প্রান্তে বেড়ার ফাঁকের দিকে। একবার আসবে বলেও না এলে তার চিন্তার অন্ত থাকে নি, বিনিদ্র চোখে কতবার-না বিছানা ছেড়ে মধ্যরাতে উঠানে গিয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছে। মুহাম্মদ মুস্তফা শহরে ফিরে গেলে ক-দিন সে বিরহবেদনায় ম্রিয়মাণ হয়ে থাকত, রাতে গোপন অশ্রুতে বার-বার ভিজে উঠত তার বালিশ। একবার তার অসুখের খবর এলে মেয়েটি আশঙ্কা-দুশ্চিন্তায় এমন দিশেহারা হয়ে পড়ে যে আরোগ্য-সংবাদ না আসা পর্যন্ত মুখে দানা তোলে নি।

এ-সব যে সত্য নয়, সে-বিষয়ে মুহাম্মদ মুস্তফার কোনো সন্দেহ থাকে না। তার প্রতি খোদেজার হৃদয়ে যদি তেমন স্নেহমমতার শতাংশও থেকে থাকত তবে সে কি জানতে পেত না? মেয়েমানুষ মনের কথা লুকাতে পারে সত্য, তবে এমন গভীর স্নেহমমতা যা প্রত্যাখ্যাত হলে মানুষ আত্মহত্যার মতো ভীষণ কাণ্ড করে বসে, তা সম্পূর্ণভাবে লুকানো সম্ভব নয়। সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই খোদেজার আচরণ ভাবভঙ্গি স্মরণ করে দেখে কিন্তু বাড়ির মেয়েমানুষদের কাহিনীর সমর্থনে কিছুই খুঁজে পায় না। প্রতিবার দেশের বাড়িতে ফিরে এলে সকলের মতো খোদেজাও তার সেবাযত্ন করত, সে-ব্যাপারে তার হিসাব কম ছিল না বেশিও ছিল না। কোনো-কোনো বিষয়ে সে যদি একাই খাতির-যত্নের অধিকার রাখত তার কারণ এই যে, বয়সের জন্যে কারো হাতে কোনো কাজ শোভা পায় কারো হাতে পায় না। সে-জন্যেই হাত-মুখ ধোয়ার সময়ে উঠানে বদনা ধরত বা খাওয়ার সময়ে কোনোদিন হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করত। তবে সে যখন বদনা থেকে পানি ঢালত বা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করত তখন কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও মুহাম্মদ মুস্তফার এ-কথা মনে হয় নি যে সে বেশ একটু আদর করেই পানিটা ঢালছে বা বিশেষ মমতার সঙ্গে হাতপাখাটা নাড়ছে। কোথায় ছিল তার সেই গভীর স্নেহমমতা ভালোবাসার প্রমাণ?

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে ঈষৎ ক্রোধভাবের সঞ্চার হয়। আপন

BanglaBook.org

মনে সে বলে, রূপকথার জন্যে সদা ক্ষুধিত মানুষেরা হঠাৎ একটি রূপকথা সৃষ্টি করে ফেলে তার নেশায় এমন নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে সত্যাসত্য ন্যায়-অন্যায় বিচারজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, এ-কথা বুঝতে পারছে না যে তারা তাকেই খোদেজার মৃত্যুর জন্যে দায়ী করছে। ক্রোধউষ্ণ মনে এ-সবের মধ্যে সে গূঢ় অভিসন্ধিও খুঁজে পায়। একবার মনে হয়, সে যে তাদের পশ্চাতে ফেলে দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে এ-কথা তার মঙ্গল কামনা করলেও তারা গ্রহণ করতে পারছে না বলে একটি বিকৃত উপায়ে তার কাছে তাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এবং এত শ্রম-সাধনার সাহায্যে যে-জীবনের দেহলিতে সে এসে পৌঁছেছে সে-দেহলি যদি তার ফলে ছায়াচ্ছন্ন হয় তাতেও তাদের আপত্তি নেই। আরেকবার মনে হয়, সে যে পিতৃদত্ত প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করে নি সে-কথা জোর গলায় বলবার সাহস না পেলেও সে-জন্যেই তারা তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত। অন্য ধরনের কথাও মনে জাগে। তার মনে হয়, এই কাহিনীতে তার অংশ নিতান্ত নগণ্য, সে একটি উছিলামাত্র। মৃত মেয়েটিই কাহিনীটির উদ্দেশ্য, সেই তাদের লক্ষ্যস্থল, এবং একটি ঘোরালো উপায়ে মৃত মেয়েটিকে জীবিত করার চেষ্টা করছে তারা, মৃত্যুর পর একটি অতিশয় স্নেহশীল দরদী আত্মা সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছে। স্নেহান্ধ লোকেরা কেবল এ-কথা বুঝতে পারছে না যে মেয়েটিকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তাকেই ধ্বংস করছে।

তবে এ-সব মনে-মনেই সে বলে, মুখে কিছু বলা হয়ে ওঠে না। বাড়ির লোকেদের সরল, বিমর্ষ, কাল্পনিক কাহিনীতে আত্মমগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে অবশেষে এ-কথাও বুঝতে পারে যে, মেয়েটি তার জন্যে আত্মহত্যা করেছে বিশ্বাস করলেও তার বিরুদ্ধে তাদের কোনো অভিযোগ নেই, কোনো ক্রোধও নেই, যেন দোষ তার নয় অন্য কারো, আসল অপরাধী দৃশ্যগত জীবন-মঞ্চের অন্তরালেই কোথাও লুকিয়ে। হয়তো এ-জন্যে সে শেষ পর্যন্ত ক্ষীণতম প্রতিবাদও জানাতে সক্ষম হয় না। তার ক্রোধ পড়ে, সে শ্রান্তও বোধ করে।

তৃতীয় দিন ছাতা মাথায় জুতা বগলে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সে যখন চাঁদবরণঘাট অভিমুখে রওনা হয় তখন সহসা স্থির করে, খোদেজার মৃত্যুর জন্যে বিয়েটা কিছুদিন স্থগিত রাখা শোভনীয় হবে। এ-টুকু না করে যেন পারা যায় না।

তবারক ভুইঞা বলে চলে :

সেদিন উকিল কফিলউদ্দিন সহসা জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় চড়া পড়েছে, কেই-বা বলেছে চড়া পড়েছে? তবে প্রশ্নটি উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে বৈঠকখানায় উপস্থিত লোকেদের মনে বিষম একটা কৌতূহলের সৃষ্টি করলেও সে-প্রশ্নের অর্থ কী তা তখন বলে নি : সে-প্রশ্নের যে-উত্তরটি দেখতে পায় তা হয়তো সে-সময়ে তার নিজের বিশ্বাস হয় নি। তবে কথাটি যতই ভেবে দেখে ততই তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। সত্যি চড়া যদি পড়ে থাকে, কোথায় সে চড়া? এ-পর্যন্ত কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা স্বচক্ষে কোনো চড়া দেখে নি। চড়ার কথা বলেছে তারা যারা ষ্টিমার চালায়, যারা সে-ষ্টিমারের আসা-যাওয়া হঠাৎ বিনা খবরে বন্ধ করে দিয়েছে। পরদিন সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে, কপালে সুগভীর রেখা, মুখে একাগ্র ভাব, যেন সমস্ত চিন্তাধারা নিয়োজিত করে কী একটা দুরূহ সমস্যার সমাধান কার্যে রত। তবে সন্ধ্যার দিকে তার মুখ পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

উকিল কফিলউদ্দিন সে-দিন সন্ধ্যার পর তাড়াতাড়ি করে একটি সভা ডাকে এবং কয়েকজন উকিল-মোক্তার, হেকিম-ডাক্তার এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যখন তার বৈঠকখানায় উপস্থিত হয় তখন তার আবিষ্কারের কথাটি তাদের জানাবার জন্যে সে অধৈর্যপ্রায় হয়ে উঠেছে। আজে বাজে কথায় কালক্ষেপ না করে সে সরাসরি আসল কথা পাড়ে।

"বুঝলেন, কথাটি আগাগোড়া একটি ধোঁকা মাত্র। চড়ার কথা বলে তারা আমাদের ধোঁকা দিতে চায়। আসল কথা কী জানেন? কামালপুরের পথে যত পয়সা তত পয়সা এ-পথে নেই,

BanglaBook.org

তাই এখান থেকে ষ্টিমার তুলে দিয়ে কামালপুরের পথে চালু করেছে।"

কামালপুর যে একটি বর্ধিষ্ণু শহর তা কুমুরডাঙ্গার লোকেদের অজানা নেই। সে-শহরের নিকটে একটি বড় পাটের কারখানা বসেছে, সে-পথে লোকেদের যাওয়া-আসা এবং আমদানি-রপ্তানিও বেশ বেড়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে।

"ব্যাপারটার গোড়ায় ঐ কথা। কথাটা কামালপুর। তবে সেই কারণে এ-শহর থেকে ষ্টিমার তুলে দিলে আমরা ক্ষেপে যাব এই ভয়ে ষ্টিমারের লোকেরা চড়ার কিচ্ছা ফেঁদেছে। চড়া পড়লে মানুষ আর কী করতে পারে?"

কথাটি সকলের বিশ্বাস না হতে পারে এই ভেবে উকিল কফিলউদ্দিন সহসা কিছু আশঙ্কিত হয়ে উঠে একটি মিথ্যা কথা বলবে বলে স্থির করে। কণ্ঠে অত্যধিক গাম্ভীর্য এনে বলে, "খবরটি বিশ্বস্তসূত্রেই জানতে পেয়েছি। কিছুদিন আগে সদর থেকে আমার জামাই লিখেছিল। সে কী করে জানতে পেয়েছিল এমন একটি পরিকল্পনা চলছে। তবে ভুলে গিয়েছিলাম, হঠাৎ সে-সময়ে মনে পড়ল।"

উকিল কফিলউদ্দিনের কথা সবাইকে স্তম্ভিত করে থাকবে, কারণ ঘরময় একটি নীরবতা দেখা দেয় কয়েক মুহূর্তের জন্যে। নদীতে চড়া পড়েছে, এবং সে-জন্যে ষ্টিমার-চলাচল বন্ধ হয়েছে—একথা সকলে ইতিমধ্যে মেনে নিয়েছিল, হঠাৎ তাদের মনে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ উকিল একটা সন্দেহের সৃষ্টি করে। তবে কি চড়ার কথাটি সত্য নয়, সে কি একটি প্রচণ্ড ধোঁকামাত্র, নিছক ফাঁকি ছাড়া কিছু নয়?

নীরবতা ভঙ্গ করে ডাক্তর বোরহানউদ্দিন অবশেষে সরল কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

"এমন ধোঁকা কি সম্ভব?"

ডাক্তার বোরহানউদ্দিন অকালবৃদ্ধ। চল্লিশে পৌঁছেই তার শিড়দাঁড়া বাঁকা হয়ে পড়েছিল, মাথার চুলও অর্ধেক সাদা হয়ে গিয়েছিল। বেশভূষার দিকে তেমন খেয়াল নেই, মুখে সদাসর্বদা নিরানন্দ ভাব, অকালে বার্ধক্যের আক্রমণ সম্বন্ধে তাকে সচেতনও মনে হয় না; যে-বার্ধক্য একদিন অনিবার্য, জীবনপরিক্রমা অসময়ে শেষ না হলে যা এড়ানো যায় না, সে-বার্ধক্য কিছু আগে এসে উপস্থিত হয়েছে বলে আফসোস-আক্ষেপ করা তার কাছে হয়তো অহেতুক মনে হয়। তার মনে কোনো কুটিলতা নেই, এবং সে যখন রোগীর পরীক্ষা শেষ করে কেমন এক দৃষ্টিতে রোগীর দিকে তাকিয়ে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকে তখন সে যে নিতান্ত ভালোমানুষ সে-ধারণাটি আপনা থেকেই মানুষের মনে জেগে ওঠে। তবে রোগীর পরীক্ষা শেষ হলে একদিন যে-সব কথা ভাবত সে-সব কথা আর ভাবে না : রোগীর অবস্থা যে বড় গুরুতর তা তাকে বা তার আত্মীয়-স্বজনকে কী করে বলে, রোগীর ওষুধপথ্য করার সামর্থ আছে কিনা, বা চিকিৎসার উত্তম উপায়টি কী। সে-সব আর ভাবে না, কারণ ক্ষুদ্র মফস্বল শহরের চিকিৎসক অনেক কিছু ভাবা ছেড়ে দেয় একদিন। সে-সব ভেবে লাভ কী? ক্রমশ একদিন রোগীর আয়ু কিছু বৃদ্ধি করার চেষ্টাও তার কাছে বৃথা মনে হয়। তাতে কেবল দুঃখ-যন্ত্রণা বাড়ানো হয়, কষ্টের জীবনকে বিলম্বিত করা হয়, শান্তির দিনটি পিছিয়ে দেওয়া হয়। আরেকটি কথাও সে বোঝে। চিকিৎসার অর্থ আজরাইলের সঙ্গে একপক্ষীয় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, যে-যুদ্ধের শেষে পরাজয় নিশ্চিত; রোগীর অবস্থা চিকিৎসার বাইরে চলে গেলেই সচরাচর চিকিৎসকের তলব পড়ে। কোনো চিকিৎসক সাফল্য বা কৃতিত্বের প্রত্যাশাও করতে পারে না, এবং যে-কাজে সাফল্য বা কৃতিত্বের সম্ভাবনা নেই সে-কাজে মানুষের আনন্দও নেই। অতএব ডাক্তার বোরহানউদ্দিন যখন স্টেথেস্কোপ যন্ত্রটি গলায় ঝুলিয়ে ক্ষিপ্রপদে কোনো রোগীর বাড়ি-অভিমুখে রওনা হয় তখন তার পদক্ষেপে একটি বেসুরো ধ্বনি ধরা পড়ে, তার কপালের চিন্তাসূচক রেখাগুলিতে ঈষৎ অসামঞ্জস্যতা প্রকাশ পায়। তবে সে-বেসুরো ধ্বনি বা অসামঞ্জস্যতা কেউ লক্ষ্য করে না; গভীর নিরাশাচ্ছন্ন মনে ডাক্তার রোগী দেখতে চলেছে—তেমন কথা কে বিশ্বাস করতে চায়?

BanglaBook.org

উকিল কফিলউদ্দিন সাহেব এমন একটি প্রশ্নের জন্যে যে প্রস্তুত ছিল না, তা নয়। বস্তুত ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের প্রশ্নটি অন্যায্য নয়। ষ্টিমার-কোম্পানির কাজটি সত্যিই অবিশ্বাস্য; অর্থলিপ্সায় প্রণোদিত হয়ে মানুষ এতদূর যেতে পারে তা কি বিশ্বাসযোগ্য? তবে অবিশ্বাস্য কথাও সত্য হয়; মানুষের ধাপ্পাবাজি, প্রবঞ্চনা এবং নির্দয়তার অন্ত নেই।

শান্তকণ্ঠে উকিল কফিলউদ্দিন উত্তর দেয়,

"এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তা সত্য।"

এবার উকিল সাহেব ডাক্তার বোরহানউদ্দিন সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে ষ্টিমারের লোকদের প্রবঞ্চনা যদি কার্যকরী হয় তবে কুমুরডাঙ্গা শহরের কী ভীষণ অবস্থা হবে—তা নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করে। ডাক্তার বোরহানউদ্দিন গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে তার বক্তৃতা। তবে তার মনটা কোথায় যেন খচখচ করে। ষ্টিমারঘাট বন্ধ হলে দরিদ্র শহরের কী পরিণতি হবে তা বক্তার নাটকীয় উচ্ছ্বাস বা শব্দালঙ্কার-বিভূষিত ভাষার বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও সে বুঝতে পারে; সে-সব দুর্বোধ্য নয়, অসত্যও নয়। তবে পূর্বের উক্তিটি এখনো ঠিক বুঝতে পারে না।

একটু পরে সে নির্বোধের মতো আবার বলে ওঠে, "চড়ার কথাটি কেন সত্য হবে না?"

তখনো উকিল সাহেবের বক্তৃতা শেষ হয় নি। বক্তৃতায় বাধা পড়লে হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে পড়ে, একটু পরে ঝলক্ দিয়ে মুখে যেন রক্ত চড়ে, তারপর কয়েক মুহূর্ত স্থিরনেত্রে ডাক্তারের দিকে চেয়ে তার মুখাবয়বের সবকিছু যেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করে দেখে। ডাক্তারের আধা-পাকা চুলে কদাচিৎ হাজ্জামের হাতের বা চিরুনির স্পর্শ পড়ে বলে সারাদিন এলোমেলো হয়ে থাকে। কানের ওপর, তারপর পশ্চাতে ঘাড় ঢেকে সদাময়লা কুঞ্চিত কলারের ওপর সে-চুল ঝুলে থাকে। তার গোঁফও দীর্ঘ। সে-গোঁফ ওপরের ঠোঁট অতিক্রম করে নিচের স্থূল, চিড়খাওয়া ঠোঁট পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়, যার সূচাগ্র প্রান্ত এড়াবার জন্যই যেন সে সামনের মস্ত দাঁতের পাটি উন্মুক্ত করে মুখটা খুলে রাখে। কখনো-কখনো অন্যমনস্কভাবে দাঁত দিয়ে গোঁফের প্রান্ত কাটে, কখনো সহসা জিহ্বা বের করে তা ভিজিয়ে নমনীয় করে তোলে, কিন্তু কখনো ছাঁটে না। মধ্যে-মধ্যে তাতে খাদ্যকণা দেখতে পাওয়া যায় এবং সর্দি লাগলে এখানে-সেখানে জটও বেঁধে যায়। একবার বহুদিন ধরে গোঁফের প্রান্ত অর্ধচন্দ্রের মতো বাঁকা হয়ে ছিল, দেখে মনে হত যেন লম্বা-লম্বা ঘাসে আবৃত চরের মাথায় চাঁদ উঠেছে।

উকিল কফিলউদ্দিন অবশেষে ঘরের অস্পষ্ট আলোতেও দেখতে পায় ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের গোঁফের প্রান্তে ডালের মতো কিছু একটা লেগে রয়েছে; কয়েক মুহূর্ত ডাক্তারের দিকে চেয়ে থেকে তারই সন্ধান করেছিল যেন। এবার তা দেখতে পেলে ঘৃণার মধ্যে দিয়ে ডাক্তারের নির্বুদ্ধিতার জন্যে তার প্রতি একটি পরম অবজ্ঞার ভাব দেখা দেয় উকিল কফিলউদ্দিনের মনে।

ঈষৎ তিক্ত-কঠিন স্বরে সে বলে, "চড়ার কথাটি যে নিছক ধোঁকা তা যেন কোনো কারণে ডাক্তার বিশ্বাস করতে পারছেন না।"

কোনো বিষয়ে অনেক চিন্তা করে একবার নিশ্চিত হবার পর কেউ সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে উকিল কফিলউদ্দিনের সহ্য হয় না, তাই তিক্ত উক্তিটি করেও সে মনে শান্তি পায় না। বক্তৃতা শুরু করতে গিয়ে চুপ করে যায়, যেন কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। তারপর সহসা তার চোখে কী যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

এমনভাবে তার চোখ জ্বলে ওঠাও কাছারি-আদালতে সুপরিচিত, তার অর্থও সবাই জানে। এমনটা ঘটলে সবাই বুঝতে পারে উকিল কফিলউদ্দিন সহসা একটি মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছে। কায়ক্লেশে আইনের বইপত্র ঘেঁটে সযত্নে-সাজানো যুক্তিতর্কের সাহায্যে নয়, বিদ্যুৎঝলকের ক্ষিপ্রতায় উপলব্ধ তথ্যের সাহায্যেই সে মামলা-মকদ্দমা জিতে থাকে, পাপিষ্ঠ আসামিরও খালাসের ব্যবস্থা করে থাকে। এখন সে বুঝতে পারে ডাক্তার

BanglaBook.org

বোরহানউদ্দিনের নির্বুদ্ধিতার কারণ। ডাক্তার কি সত্যই এমন নির্বোধ হাবাগোবা মানুষ? প্রথমবার সে যখন প্রশ্ন করেছিল তখনই মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তবে তখন মনে হয়েছিল স্টিমার-চলাচল বন্ধ হবার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত ক্ষতি দেখতে পাচ্ছে না বলেই চড়ার কথাটা বিশ্বাস করতে ডাক্তারের আপত্তি নেই, সে ভাবছে, যারা চিকিৎসার জন্যে নৌকায় করে কুমুরডাঙ্গায় আসে তারা পূর্ববৎ তেমনিই আসবে। এখন উকিল কফিলউদ্দিন বুঝতে পারে ব্যাপারটি আরো গভীর, এলোমেলো চুল বেশভূষার বিষয়ে উদাসীন ডাক্তারটি অতিশয় গভীর পানির মানুষ—স্টিমার-চলাচল বন্ধ হবার মধ্যে সে আর্থিক লাভের সম্ভাবনাই সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে। যারা স্টিমারে চড়ে চিকিৎসার জন্যে অন্য কোথাও যেত তাদের অনেকেই কি এবার তার শরণাপন্ন হবে না?

ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের বিচিত্র আচরণের রহস্য ভেদ করতে পেরে নিজের চতুরতার নিদর্শন দেখে উকিল সাহেব মনে-মনে তৃপ্তি বোধ করে। উকিল কফিলউদ্দিনের বিশ্বাস, তার কাছে মনের কথা গোপন করতে পারে—এমন মানুষের এখনো জন্ম হয় নি। সে জানে, মানুষের দুই মুখ—একটি বাইরের, অন্যটি ভেতরের। বাইরেরটি সমাজ-ধর্মের নির্দেশ মাফিক সাজানো-বানানো, ভেতরটি নির্ভেজাল স্বার্থে তৈরি, সর্ব মহৎ উদ্দেশ্যবিবর্জিত। প্রথমটি নকল, দ্বিতীয়টি খাঁটি; একটি সুন্দর, অন্যটি কদাকার। অনেকের যেমন তাসবাজি বা মেয়েমানুষ নিয়ে মারাত্মক নেশা, তেমনি কফিলউদ্দিনের ঘোর নেশা মানুষের সে-খাঁটি কদাকার ভেতরের দিকটা উদ্ঘাটন করা। তার এখন সন্দেহ থাকে না, সযত্নে লুকানো ডাক্তরের মনের কথাটি উদ্ঘাটন করতে সে সক্ষম হয়েছে।

"ডাক্তার রোগীর খওয়াব দেখছেন", সে বলে, আস্তে, এত আস্তে যে, উক্তিটি নয়, ঘৃণাবিদ্বেষই কেবল শোনা যায়।

বোরহানউদ্দিন এই কথাটিও ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু তার যে রোগীর প্রয়োজন নেই—সে-কথা সরলচিত্তে বলতে গিয়েও থেমে যায়। সে-কথা কি সবাই জানে না? স্বাধীনতার পর হিন্দু ডাক্তাররা একে-একে দেশছাড়া হয়ে যায়। তখন থেকে সে এত রোগী দেখছে যে রোগীতে তার আর সাধ নেই। সে অনেক বছর হল। সে-অবধি সুস্থ মানুষের চেহারা আর দেখে নি যেন। অবশেষে সে কিছুই বলে না, সে যে রোগী কামনা করে না, রোগীতে সব সাধ মিটেছে—এ-সব সত্য কথাও বলে না। তাছাড়া সে জানে, ঝানু উকিলের সঙ্গে তর্ক করার ক্ষমতা তার নেই; রোগী-হাসপাতাল ওষুধপত্র-চিকিৎসা ইত্যাদির বাইরে যে-জীবন সে-জীবনে আটঘাট বেঁধে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রহাতিয়ার তার সত্যিই নেই। সে-জন্যও সে ভালো মানুষ; সে নিরস্ত্র।

ততক্ষণে উকিল কফিলউদ্দিন স্থির করেছে ডাক্তার বোরহানউদ্দিনকে উপেক্ষা করবে, তবে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করে। তার কেমন মনে হয়, ডাক্তারের অযথার্থ উক্তি-প্রশ্নে উপস্থিত অন্যান্য লোকদের মনে তার বক্তব্যবিষয় সম্বন্ধে অবিশ্বাস না হলেও কিছু সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তার মনে যে-কথাটি এসেছে তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনোই কারণ দেখতে পায় না। সে জানে, অনেক সময় এমন দুর্বোধ্য কোনো উপায়ে মানুষ সত্য কথা জানতে পারে। মানুষ একা হলেও একা নয়; তার অন্তরে ফেরেশতা-শয়তান দুই-এরই বাস। হয়তো ওরাই জানায় সে-সব কথা। তবে দুনিয়ায় মানুষেরা আবার সাক্ষীপ্রমাণ চায়। যে-মানুষ ওকালতি করে সে-মানুষ কথাটি ভালো করে জানে। কখনো-কখনো উকিল কফিলউদ্দিনের মনে হয়, সত্য নয়, সাক্ষীপ্রমাণের আবরণে মানুষ মিথ্যাই কামনা করে।

তবে শীঘ্র সে অস্বস্তি ভাবটি কাটিয়ে ওঠে। সাক্ষীপ্রমাণ সময়মত পাবে; সত্যের জয় নির্ধারিত।

"সার-কথা এই", সে বলে, "বাকাল নদীতে চড়া পড়ে নি, অন্ততপক্ষে এমন চড়া যার

BanglaBook.org

জন্যে স্টিমার-চলাচল বন্ধ করা প্রয়োজন। হ্যাঁ, নদীর একধারে কিছু অগভীরতা আছে, কিন্তু কোন্ নদীতে নেই? পদ্মা বলেন মেঘনা বলেন যমুনা বলেন, কোনো নদী আগাগোড়া সুগভীর নয়। সব নদীতে চড়া পড়ে চর জাগে কিন্তু আবার স্টিমার-চলারও উপায় থাকে।" একটু থেমে উকিল সাহেব আবার বলে, "চড়ার উছিলায়ই স্টিমার বন্ধ করা হয়েছে। এ-অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা যদি প্রতিবাদ না করি, তবে স্থায়ীভাবে স্টিমার বন্ধ হয়ে যাবে।" কনিষ্ঠ উকিল আরবাব খানের প্রতি সে দৃষ্টি দেয়। "তুমি একটা খসড়া তৈরি করো। জোর কলমে সরকারের কাছে পত্র লিখতে হবে। এ-অন্যায় কী করে আমরা সহ্য করতে পারি?"

একটু পরে উকিল সাহেবের একটা কথা স্মরণ হয়। "আপনারা জানেন, কুমুরডাঙ্গার লোকেরা কোম্পানির স্টিমারের কী দশা করেছিল। দেখে নেব কার বাপের সাধ্য এ-ঘাটে স্টিমার চলাচল বন্ধ করে", সে বলে।

মুহাম্মদ মুস্তফার বাল্যজীবনের বিষয়ে ভাবতে গিয়ে তেঁতুলগাছের সামনে সে-ঘটনাটির কথা মনে পড়ে যায়।

বাড়ির পশ্চাতে শ্যাওলা-আবৃত বদ্ধ ডোবার মতো পুকুরের ওধারে তেঁতুলগাছটি অতিক্রম করার সাহস কোনো ছেলেরই হত না, কারণ সেখান থেকে কালুগাজির রাজত্ব শুরু হত। কালুগাজিও নাকি সে-সীমানা অতিক্রম করে এদিকে কখনো আসত না। কেন আসত না, তারও একটি আজগুবি উত্তর ছিল। তবে মনে হয় যে-কালুগাজি হাওয়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে বিদ্যুৎগতিতে মুক্তভাবে চলাফেরার ক্ষমতা রাখত, যে আসলে মানুষ নয় দেহকায়াহীন একটি আত্মাই ছিল, সে-ও যে অনধিকার প্রবেশ করত না, অন্যের এলাকায় পা দিত না—এর মধ্যে সকলের জন্যে একটি অপ্রত্যক্ষ উপদেশ নিহিত থেকে থাকবে। আমাদের গ্রামে কেউ কারো জোতজমির সীমানা-সরহদ্দ মানত না। এ নিয়ে মামলা-মকদ্দমা না হলেও অহর্নিশি ঝগড়া-ফ্যাসাদ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হত, কালেভদ্রে একআধটা খুন-জখমও ঘটে যেত।

কালুগাজিকে কেউ কখনো দেখতে পেত না বলে তার চেহারাটি কী রকম সে-বিষয়ে কেউ একমত ছিল না। কেউ বলত সে দশ হাত লম্বা, মুখে তার ঝুরিমূলের মতো দাড়ি, চোখে টাটকা খুন। কেউ আবার বলত, সে অনেকটা সাধারণ ফকির-দরবেশের মতোই দেখতে, তবে এমন ফকির-দরবেশ যে কোনো কারণে সর্ব শান্তি থেকে বঞ্চিত। শান্তি পাওয়ার জন্যে সে কোনো বিচিত্র এবাদতে সর্বক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে থাকত, এবং মানুষের সামনে দেখা দিতে যেমন পছন্দ করত না তেমনি চাইত না মানুষ তার এবাদতে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করে; মানুষ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় বা প্রবৃত্তি তার ছিল না।

কালুগাজির রাজত্ব কতদূর বিস্তৃত বা কত বড় এ-সব বিষয়ে কেউ কখনো নিশ্চিত ছিল না বটে, তবে কারো সন্দেহ ছিল না তা পুকুরের ওধারে যে-তেঁতুলগাছের পাশে সে-রাজত্ব শেষ হত সে-তেঁতুলগাছের তলায়ই সে বসতে ভালোবাসত। মেয়েরা বলত, জায়গাটির ওপর তার মায়া পড়ে গিয়েছে। অতএব একদিন শরৎকালের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল বেলায় তেঁতুলগাছের দিকে গ্রামের একটি লোকের দৃষ্টি পড়তেই তার অন্তরাত্মা থরথর করে কেঁপে ওঠে, কারণ সে দেখতে পায় কে যেন সে-গাছের তলে স্থির নিশ্চল হয়ে বসে। কালুগাজি কি কোনো কারণে সশরীরে দেখা দিয়েছে, অদৃশ্য জগৎ থেকে আবির্ভূত হয়েছে দৃশ্যমান জগতে? অপলক দৃষ্টিতে লোকটি গাছের তলে মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ধীরে-ধীরে একটি আকৃতি, একটি চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে : ছোটখাটো মধ্যবয়সী মানুষ, মুখে কিছু দাড়ি, এত শীতেও দেহের উপরাংশ নগ্ন। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর লোকটি স্থির করে, অপরিচিত লোকটি কালুগাজি নয়। ফকির-দরবেশের মতো মনে হলেও সে নিতান্ত মাটির মানুষ, কেবল চোখে-মুখে ক্ষুধার্ত মানুষের শ্রান্ত তীক্ষ্ণতা। কালুগাজি যখন খোশমেজাজে থাকে তখনো তার কপাল থেকে লাঙ্গল-দেয়া জমির মতো গভীর ভ্রূকুটির রেখাগুলি নাকি কখনো

BanglaBook.org

নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না, তার চোখের আগুন কখনো স্তিমিত হয় না। কালুগাজি অতিশয় অস্থির প্রকৃতির লোকও, গাছের তলায় এবাদতে বসে স্থির হয়ে থাকলেও তার মধ্যে আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরের উষ্ণ-তরলতা অস্থিরতা নাকি কখনো শান্ত হয় না। লোকটির মধ্যে কালুগাজির সে-সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোনো চিহ্ন ছিল না।

গাছের তলায় বসে অপরিচিত লোকটি কয়েক দিন কাটায়। এ-বাড়ি সে-বাড়ি থেকে লোকেরা খাদ্যবস্তু এনে তার ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করে, পুকুরের সামনে তার উপস্থিতি মেয়েদের গোসলের ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেও কেউ তাকে সরে যেতে বলে নি। বয়স্ক লোকেরা দূর থেকে দেখে তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করত, তবে ছেলেরা বেশ সকালেই তার নিকটে হাজির হয়ে তার চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে দাঁড়াত। এত ছেলের মধ্যে কোনো কারণে মুহাম্মদ মুস্তফাকে তার পছন্দ হয়েছিল, এবং মুহাম্মদ মুস্তফা দেখা দিলে বৃক্ষতলে আসনাধীন অপরিচিতি লোকটির চোখ প্রথমে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তারপর সে-উজ্জ্বলতা ঢেকে যেত স্নেহে, পাতলা পর্দার মতোই যে-স্নেহ নেবে আসত। লোকটি একদিন লক্ষ্য করে, মুহাম্মদ মুস্তফা বা অন্যান্য ছেলেরা সর্বদা যেন একটি অদৃশ্য সীমারেখার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো তা অতিক্রম করে না। একদিন সে মুহাম্মদ মুস্তফাকে বলে, যাও, যাও ওদিকে, কোনো ভয় নেই। প্রথমে মুহাম্মদ মুস্তফার শিশু-সরল চোখে গভীর ভীতি জাগে, মন-প্রাণ পাথরের মতো জমে শক্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু শীঘ্র সহসা কোথেকে একটা বিচিত্র সাহস দেখা দেয় তার মধ্যে, যে-সীমারেখা সে কখনো অতিক্রম করে নি সে-সীমারেখা অনায়াসে পেরিয়ে যায়।

সে-জন্যেই কি মুহাম্মদ মুস্তফা গ্রামের গণ্ডিতে বন্দী হয়ে থাকে নি, চাঁদবরণঘাটের সামনে বৃহৎ নদীটিও তার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি?

আরেকটি দিনের কথা মনে পড়ে। ভরা বর্ষার দিন। কয়েকটি সমবয়সী ছেলে স্থির করে গ্রাম থেকে কিছু দূরে সুভদ্রা নদীটি সাঁতার কেটে পার হবে। নদী কোথায়, খাল বলাই ভালো; এ-পাড়ে দাঁড়িয়ে ও-পাড়ে স্নানরতা বধূদের হাতের চুড়ি বা সূর্যালোকে ঝিকমিক করতে-থাকা নথ দেখা সম্ভব। সাঁতার কাঁটতে শুরু করে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময়ে সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে হয়, নদীটি অতল এবং সে-অতল পানিতে না জানি কত কিম্ভূতকিমাকার হিংস্র দৈত্যদানব। ভয়টি নিতান্ত অহেতুক তা বুঝতে পারলেও সে-ভয় দমন করতে সক্ষম হয় না এবং দেখতে-না-দেখতে তার হাত-পা অবশ হয়ে পড়বার উপক্রম হয়। অপর পাড়টিও হঠাৎ যেন বহু দূরে সরে যায়, সেখানে একটু আগে যে-সব বাড়িঘর বা ঘাটে বাঁধা নৌকা দেখতে পেয়েছিল সে-সব দূরত্বে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথখানি পথ কি সে অতিক্রম করতে পারবে? তার আগেই কি পানির মধ্যে থেকে একটি বিচিত্র জন্তু তার পা কামড়ে ধরে তাকে অতলে টেনে নিয়ে যাবে না? সে বুঝতে পারে, ফিরে গেলেই হয়তো সে প্রাণে বাঁচবে, উল্‌টো পথ না ধরে উপায় নেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফিরে যেতে পারে নি। এ-জন্যে নয় যে অন্যছলেরা, যাদের কেউ-কেউ ততক্ষণে বেশ এগিয়ে গিয়েছে, তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে; অকৃতকার্যতার জন্যে বা তার ভীত মনের পরিচয় পেয়ে কেউ হাসি-ঠাট্টা করলে সে-হাসি-ঠাট্টায় কখনো সে বিব্রত বোধ করত না। ফিরে যায় নি এই কারণে যে, যখন সে উল্‌টো পথ ধরবে তখন তার মনে হয় পেছনের দিকে তাকালে দেখতে পাবে নদীর যে-তীর সবেমাত্র ছেড়ে এসেছে সে-তীরও নিকটে নয়, সামনের তীরের মতো সে-তীরও বহু দূরে সরে গিয়েছে। কে জানে, হয়তো কল্পনার দৈত্যদানবের ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লেও আসলে সে ফিরে যেতে চায় নি। হয়তো একবার চলতে শুরু করলে পেছনের দিকে কখনো তাকায় নি এ-জন্যে যে পেছনে ফিরে যাওয়াই সহজ। মানুষ পেছনের পথ চেনে; পেছনের পথ কখনো দূরের নয়, কঠিনও নয়। তবু বালক বয়সে মুহাম্মদ মুস্তফার ভয়ের সীমা ছিল না। মানুষ মাত্রই ভীতি বোধ করে—যার কখনো কারণ থাকে, কখনো থাকে না। মানুষ দোজখকে ভয় করে,

BanglaBook.org

ভয় করে ভূতপ্রেত দস্যু-ডাকাতকে, ভয় করে রোগব্যাধি শারীরিক যন্ত্রণাকে, মৃত্যুকে, দারিদ্রকে, অপ্রশমিত ক্ষুধাকে। আবার সে ভয় করে কেন ভয় করে সে-কথা না বুঝে, এবং যে-ভয়ের কারণ নেই বা যে ভয়ের কারণ সে বুঝতে পারে না, সে-ভয়ই তাকে সর্বাপেক্ষা ভীত করে। সূর্যালোকের আলোকিত উজ্জ্বল দিনে যখন অবাধে চতুর্দিকে মানুষের দৃষ্টি যায় সেদিনও তার মনে হয় এই স্বচ্ছ প্রখর উজ্জ্বলতার অন্তরালে কোথায় যেন অস্বচ্ছতা, কেমন একটা অন্ধকার। তখন এত আলোর মধ্যেও সে অসহায় বোধ করে কারণ কোথাও আশ্রয় দেখতে পায় না। কিন্তু যেখানে আলো নেই সেখানেও কি সে নিরাপদ বোধ করে?

কারণে-অকারণে মুহাম্মদ মুস্তফার মনে ভয় দেখা দিত। একবার গ্রামের হামজা মিঞা নামক মোল্লা-মৌলভি গোছের একটি লোকের কথায় ভীষণ ভয় দেখা দিয়েছিল তার মনে। লোকটি বলত, ঈমানে মুফাচ্ছাল বাল্যবয়সেই পাকা হওয়া উচিত। একদিন মুহাম্মদ মুস্তফাকে হাতে পেয়ে নিজের শীর্ণ উরুতে বাঘা থাবা মেরে ব্যাঘ্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে প্রশ্ন করেছিল : খোদা ভিন্ন কি মাবুদ আছে, তাঁর সমতুল্য কেউ কি আছে, তাঁর কি কোনো শরিক বা প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, তার কি নিদ্রা-তন্দ্রা আছে, ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, ক্লান্তি আছে, ক্ষয় আছে? সে-সব প্রশ্নে কী ছিল, বা সে-সব প্রশ্ন বালক-মনে কী চিত্র জাগিয়ে তুলেছিল কে জানে, কিন্তু হামজা মিঞার প্রশ্নের গোলাগুলি শেষ হবার আগেই মুহাম্মদ মুস্তফা অজানা ভয়ে সমগ্র অন্তরে হিমশীতল হয়ে পড়ে, তার মনে হয় আকাশ অন্ধকার করে কেয়ামতি ঝড়-তুফান আসতে দেরি নেই, শীঘ্র কোথাও সহস্রাধিক হিংস্র ক্রুদ্ধ সিংহও কান-বধির-করা আওয়াজে গর্জন শুরু করবে। চোখ বুজে সে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। পরে একটি নির্বোধ মেয়েমানুষের কাছে শুনতে পায়, খোদা নাকি দেখতে কলিজার মতো, এবং কলিজার মতো প্রতি মুহূর্তে থরথর করে কাঁপে। কথাটি কী কারণে তাকে আশ্বস্ত করে, এবং যদিও তার মনে হয় আকাশে ভাসমান অদৃশ্য সে-কলিজার কাঁপুনিতে গোটা পৃথিবী থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে, তার দুর্বোধ্য ভয়টি কিছু প্রশমিত হয়। আরেকবার একদিন কয়েকজন দুষ্টু ছেলে ষড়্যন্ত্র করে সমবয়সী আরেকটি রোগা-গোছের ছেলেকে শক্ত কাছি দিয়ে বেঁধে গাছ থেকে মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটি তখন তারস্বরে সকলকে এই বলে শাসিয়েছিল যে, তাদের ওপর খোদার গজব পড়বে, বলা দেখা দেবে তাদের জীবনে। দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে থাকলেও মুহাম্মদ মুস্তফা রোগা ছেলেটির নির্যাতনে কোনো অংশ নেয় নি, সে দর্শকই ছিল। তবু তার কথায় সে একটি অব্যক্ত ভয়ে হিমশিম খেয়ে যায়, এবং সে-রাতেই একটি বিচিত্র ধারণা দেখা দেয় তার মনে। ধারণাটি এই যে, কালো মাটির দলার মতো নাক-চোখ-মুখ-কান-শূন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন একটি জন্তু গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে গ্রামের জনশূন্য পথেঘাটে ছুটোছুটি করছে কিসের সন্ধানে। সে-বিচিত্র ভয়াবহ নামহীন জন্তুটি বারবার তার মনে দেখা দিয়ে বেশ কিছুদিন তাকে নিপীড়িত করে। কেবল আমাদের ছোট চাচার দ্বিতীয়া বউটির মৃত্যুর পর হয়তো সে নিদারুণ ভীতির কবল থেকে মুক্তি পায়।

ছোট চাচা বদর শেখ অতিশয় অলস প্রকৃতির লোক ছিল। সে আমাদের উত্তর-ঘরের পাশে থাকত, দু-বাড়ির মধ্যে ছিল একটি বেড়া মাত্র। সংসারের কাজকর্মে মন ছিল না, বাপের মৃত্যুর পর ভাগাভাগি করে যে-সামান্য জমিজমা হাতে পেয়েছিল সে-জমিজমা দেখাশুনা করলে পেটে খেয়ে তার নিশ্চিন্তে দিন কাটত, নুন-তেল তো বটেই কখনো-কখনো পোশাক-আশাকের পয়সাও উঠত। তবে জমিজমার চেয়ে তার আলস্যই ছিল বেশি। অন্যান্য লোকেরা যখন রত্তিপ্রমাণ সামান্য জমি থেকেও শুধু ধান নয়, শাকসবজি সর্ষে খেসারি কলাই তুলত, সে তার জমি থেকে যৎসামান্য ধান পেয়েই সন্তুষ্ট থাকত। অন্য বাড়ির ছাদে সোনালি রঙের মস্তমস্ত চালকুমড়া শোভা পেত, তার ঘরের চাল অভাগিনী নারীর হাতের মতো শূন্যতায় ধু-ধু করত। ঈদের দিনে অন্যের ছেলেমেয়েরা রঙদার কাপড় পরে আনন্দে কলরব করত, তার ঘরের দুটি ছেলে ছেঁড়া কাপড় গায়ে কিছু ঈর্ষান্বিত কিছু অবুঝ চোখে সকলের দিকে চেয়ে

BanglaBook.org

থাকত, আনন্দের কারণ বুঝত না। তারপর একদিন সে যে অলস নয় সে-বিষয়ে সকলকে এবং নিঃসন্দেহে নিজেকে আশ্বস্ত করবার জন্যেই যেন সহসা দ্বিতীয় বার বিয়ে করে বসে। চাচা বদর শেখের বড়-বড় দাঁত ছিল। ক-দিন ধরে সে-দাঁতগুলি অহর্নিশি উন্মুক্ত হয়ে থাকে একটি নির্বোধ হাসিতে। তবে চাচা বদর শেখ একটি অতিশয় রুগ্‌ণা মেয়েকেই স্ত্রী হিসেবে ঘরে এনেছিল। প্রথম ক-দিন টানা-ঘোমটা এবং লজ্জাশরম-রঙমেহেদির জন্যে তা নজরে পড়ে নি, কিন্তু শীঘ্র তার বীভৎসপ্রায় রুগ্‌ণতার কথা সকলে জানতে পায়, ঘোমটার নিচে সবাই দেখতে পায় একটি মিষ্টি কিন্তু রক্তহীন প্রাণহীন মুখ। দেহের হাড়সর্বস্ব শীর্ণতাও আবিষ্কার করতে দেরি হয় না : শুকিয়ে-যাওয়া নদীর মতোই সে-দেহের রূপ। এবং চোখে জীবনের সাধ তখনো মেটে নি, তবে তাতে আজরাইলের ছায়া। নূতন বউ-এর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে চাচা বদর শেখ বিশেষ চিন্তিত হয় নি, কারণ তার মনে হয় দু-দিন খেয়েদেয়ে গা-এ হাওয়া লাগিয়ে বেড়ালেই বানের পানির মতো তার দেহে স্বাস্থ্য ফিরে আসবে। তবে ধারণাটি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়, কারণ দিনে-দিনে নূতন বউ-এর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। চাচা বদর শেখ তার চিরদিনের আলস্য বর্জন করে কেমন দিশেহারা মানুষের মতো মেয়েটির চিকিৎসা এবং ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করে, চাঁদবরণঘাট থেকে ভালো ডাক্তারও ডেকে আনে। সেবার ভালো ফসল হয় নি, বর্ষার আগেই ধান শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন ধান-চাল কিনে চলেছে, আর ধান-চাল কেনার পয়সা নেই। অতএব চাচা বদর শেখকে কাইন্দাপাড়ার দক্ষিণদিকে ডোবা জমিটাও বিক্রি করতে হয়েছিল।

তবে মেয়েটি বাঁচে নি, বিয়ের মাস তিনেক পরে একদিন ঝোড়ো সন্ধ্যায় অশ্রান্ত হাওয়ার গর্জনের মধ্যে সকলের অলক্ষিতে সে তার শেষনিঃশ্বাস ছাড়ে। কেউ তার জন্যে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলে নি। চাচা বদর শেখ তার জন্যে এত কিছু করলেও তার মৃত্যুর পর কেবল অর্ধেক দিন কেমন স্তম্ভিত হয়ে থাকে, তার চোখেও ঈষৎ সজলতা দেখা যায় নি।

তারপর কেউ বলে, ঘরে বলা এসেছিল, সে-বলা দূর হয়েছে। সেদিন থেকেই যেন মাটির দলার মতো বিচিত্র জন্তুটির ছায়া দূর হয় মুহাম্মদ মুস্তফার মন থেকে।

তবারক ভুইঞা বলছিল : স্টিমার-চলাচল কেন বন্ধ হয়েছে—সে-বিষয়ে গণ্যমান্য উকিল কফিলউদ্দিনের ধারণাটি কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা আগ্রহভরেই গ্রহণ করে, এবং দেখতে-না-দেখতে যা প্রথমে সত্য বলে মনে হয়েছিল তা অবিশ্বাস্য একটি কথায় পরিণত হয়, যে-চড়া শুধু নদীতে নয়, শহরবাসীদের বুকেও ভার হয়ে জেগে উঠেছিল, সে-চড়া ধীরে উত্তোলন করে নিমিষে অদৃশ্য হয়ে যায়। একটি লোক নয় অনেক লোক, অনেক লোক নয় গোটা পাড়া, একটি পাড়া নয় সমস্ত শহর যখন একজোট হয়ে কোনো সত্য অস্বীকার করে এবং সে-সত্যের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য কঠিন ব্যূহ সৃষ্টি করে তখন অবরুদ্ধ দুর্গের বাইরে সত্যটি হাওয়ার মতোই নিষ্ফলভাবে গোঙিয়ে ফেরে, প্রবেশের পথ পায় না। কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা সহসা আশান্বিত হয়ে ওঠে : যে-প্রতিবাদপত্র ইতিমধ্যে সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে তার ফলে দু-একদিনের মধ্যেই ঘাটে আবার স্টিমার দেখা দেবে।

কিন্তু শীঘ্র প্রথমে কানাঘুষায়, তারপর সুস্পষ্টভাবে স্টিমার না আসার অন্যান্য কারণও শোনা যেতে থাকে। তবে শহরবাসীরা কি উকিল কফিলউদ্দিনের ধারণাটি অন্তরে-অন্তরে গ্রহণ করে নি? অথবা, তা কি তাদের কাছে আইনজ্ঞের যুক্তিতর্কের মতোই ঠেকেছিল যে-যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচক্ষণ উকিল আদালতে বিপক্ষদলকে পরাভূত করে, কিন্তু যে-সব যুক্তিতর্কের সত্যাসত্য সম্বন্ধে জনসাধারণ কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে সক্ষম হয় না? না, তা ঠিক নয়, কুমুরডাঙ্গার জনসাধারণ উকিল কফিলউদ্দিনের ধারণাটি সত্যিই গ্রহণ করেছিল, কেবল কুমুরডাঙ্গার ঘাট থেকে যে-স্টিমার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সে-স্টিমার ফিরিয়ে আনবার

BanglaBook.org

জন্যে তারা যে-প্রবল অধীরতা বোধ করে সে-অধীরতার জন্য হয়তো তা যথেষ্ট মনে হয় নি; পড়ন্ত দেয়ালকে রক্ষা করার জন্যে একাধিক ঠেস-পোস্তের প্রয়োজন হয়। অতএব স্টিমার না-আসার যে-কারণ উকিল কফিলউদ্দিনের নিকট জানতে পায় তার ওপর অন্যান্য অনেক কারণও তারা আবিষ্কার করে এবং স্টিমার যে শীঘ্র আবার কুমুরডাঙ্গার ঘাটে দেখা দেবে—এমন একটি বিশ্বাস সুনিশ্চিতকণ্ঠে প্রকাশ করতে থাকে নানাপ্রকারের জনশ্রুতির মধ্যে দিয়ে। কেবল কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা স্টিমারকে ফিরিয়ে আনার অধীরতার জন্যে এ-কথা বুঝতে পারে নি যে জনশ্রুতির বহুলতা স্টিমারকে দূরেই রাখছিল, কাছে আনছিল না। হয়তো ততদিনে যা-সত্য তা তাদেরই অজ্ঞাতসারে তারা মেনে নিয়েছিল, কেবল আশা ছাড়তে পারে নি। মানুষের আশা এক স্তরে পৌছাবার পর যুক্তি বা যথার্থতার ধার ধারে না।

কোথায় তার উৎপত্তি কে-বা চালু করে—তা সঠিকভাবে কখনো জানা সম্ভব না হলেও একবার একটি জনশ্রুতি শোনা গেলে বিদ্যুৎগতিতে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকবার শহরবাসীদের মনে গভীর আশার সঞ্চার করে। কখনো তাদের মনে হয় একটি খবর বিশ্বস্ত সূত্রেই জানতে পেরেছে, পরে অনুসন্ধান করে দেখলে বোঝা যায় সে-সূত্রের পশ্চাতে আরেকটি সূত্র যেন, সে-ও আবার কোথায় যেন শুনেছে খবরটি। কখনো একটি খবরের পশ্চাতে কোনো মুখ দেখতে পায় না, দেখতে পায় কেবল একটি স্থান। যেমন স্টিমার দুটি মেরামতের জন্যে গিয়েছে সে-কথা কে বলেছিল সে-বিষয়ে কেউ নিশ্চিত হতে না পারলেও কোথায় শোনা গিয়েছিল তা নিয়ে তর্কের অবকাশ হয় না : খবরটি শোনা গিয়েছিল কাছারি আদালতের সামনে ধুলাচ্ছন্ন নেড়া মাঠের পর অশ্বত্থ গাছের তলে নিত্য যে-ভিড় বসে সে-ভিড়ের মধ্যে। শুধু সেই ভিড়—কোনো মুখ নজরে পড়ে না, কোনো কণ্ঠও শোনা যায় না। কিন্তু জনশ্রুতিগুলির উৎসসন্ধানে কেউ কালক্ষেপ করে না, যা শোনে তা অবান্তর মনে না হলেই নির্বিবাদে গ্রহণ করে। তাই স্টিমার দুটি মেরামতে গিয়েছে সে-খবর শোনামাত্র অবিলম্বে তা তারা বিশ্বাস করে নেয়। কথটি নেহাৎ যুক্তিযুক্ত : স্টিমার কলের জিনিস হলেও মানুষের দেহের মতোই তা বিগড়ে যেতে পারে। কতদিন ধরে স্টিমার দুটি এ-পথে আসা যাওয়া করেছে, একদিনের জন্যে না থেমে একটু বিশ্রাম না করে। তবে যারা এই নিশ্চিত বিশ্বাসে অপেক্ষা করতে শুরু করে যে মেরামত শেষ হলেই বংশীধ্বনি করে পূর্বের মতো স্টিমার দুটি ঘাটে এসে উপস্থিত হবে, তাদের বিশ্বাসটি তাদেরই অজান্তে কখন অন্য একটি বিশ্বাসে স্থানান্তরিত হয়; যে-জনশ্রুতির কোথাও কোনো ভিত্তি নেই সে-জনশ্রুতি হাওয়া-তাড়িত মেঘের মতো সদাচঞ্চল, এ-মুহূর্তে এখানে আছে অন্য মুহূর্তে নেই, যা ঘনঘটার রূপ ধারণ করে তা আবার দেখতে-না-দেখতে শূন্য নীলাকাশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এবার যে-জনশ্রুতি তাদের বিশ্বাসে শিকড় গাড়ে, তা সর্বপ্রথম চড়ার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে। তবে চড়ার অস্তিত্ব গ্রহণ করলেও সেটি তাদের মনে দুরতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধকের রূপ গ্রহণ করে না। তারা বলে, চড়া পড়েছে কথাটা সত্য এবং সে-জন্যেই ঘাটটি বর্তমান স্থান থেকে সরিয়ে শহরের উত্তরদিকে একটি নূতন স্থানে বসানো হবে, কেবল যতদিন পর্যন্ত ঘাটটি সেখানে সরানো না হয় ততদিন পর্যন্ত স্টিমার-চলাচল বন্ধ থাকবে। এ-জনশ্রুতির উদ্ভাবক চড়াটি বর্তমান ঘাটের সামনেই দেখতে পায়। তাই-বা কী করে অবিশ্বাস করা যায়? শহরের বৃদ্ধদের এখনো স্মরণ আছে, কুমুরডাঙ্গায় ঘাট স্থাপিত হবার কয়েক বছরের মধ্যে সে-ঘাট তিনটে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। প্রথমে কাছারি-আদালতের সামনে ঘাটটি বসানো হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় উকিল কফিলউদ্দিনের বর্তমান বাড়ির কিছু দক্ষিণে। সেখানেও ঘাটটি বেশিদিন টিকে থাকে নি, বছর দুই-তিনেক পরে আবার স্থানচ্যুত হয় সেখান থেকে। তবে তারপর থেকে ঘাটটি আর নড়ে নি, সে-সময়ে ঘাটে ফ্ল্যাটটিরও প্রবর্তন হয়।

নূতন হাওয়া এসে এই জনশ্রুতিও যথাসময়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়, পশ্চাতে কোনো

BanglaBook.org

আক্ষেপ-আফসোস না রেখে। এবার যে-জনশ্রুতি ওঠে সেটি পূর্ববর্তী জনশ্রুতির একটি পরিবর্তিত সংস্করণ বলে মনে হয়, এবং এটাও চড়ার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে না। এবার তারা বলে, হ্যাঁ, চড়াটা বেশ বড় রকমেই পড়েছে যে-জন্যে এ-পথে স্টিমারের চলাচল আর সম্ভব নয়, তবে এবার স্টিমারের পরিবর্তে লঞ্চের প্রচলন করা হবে। এ-জনশ্রুতিটাও কেউ অবিশ্বাস করে না।

এ-সব জনশ্রুতি যেমন কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের কল্পনাশক্তি বা উদ্ভাবনক্ষমতার পরিচয় দেয় তেমনি তাদের চারিত্রিক সরলতাও প্রকাশ করে, কারণ সরলচিত্ত মানুষের পক্ষেই সে-ধরনের জনশ্রুতি এমন সোৎসাহে এবং গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করা সম্ভব। তবে মনের অতলে সত্য কথাটি থেকে-থেকে উঁকি দিতে চেষ্টা না করলে তাদের কল্পনাশক্তি বা উদ্ভাবনক্ষমতা কি এমন তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেত বা সরলচিত্ত বিশ্বাস এমন গভীর রূপ ধারণ করত? হয়তো নিরাশা-ঢাকা তাদের কাছে নিতান্ত দুরূহ মনে হয়েছিল বলেই তাদের আশা এমন উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

এবং সে-জন্যেই হয়তো নানারকমের জনশ্রুতির উদ্ভাবন বা সে-সব জনশ্রুতির বিতরণের মধ্যে কোনো চপলতাও দেখা যায় নি, সে-সব অটুট গাম্ভীর্যের সঙ্গেই তারা গ্রহণ করে। অতএব কোনো জনশ্রুতির ওপর সমস্ত বিশ্বাস স্থাপন করে একটি লোক যদি হাস্যকর কাণ্ড করে বসে তাতে কেউ উপহাসের কিছু দেখতে পায় নি। একদিন বারো বছরের মৃতপ্রায় ছেলেকে কোলে নিয়ে মোক্তার হাবু মিঞা ঊর্ধ্বশাসে স্টিমারঘাট অভিমুখে রওনা হলে এবং শীঘ্র তাকে অনুসরণ করে অনেক লোক পথে বেরুলে কেউ আমোদিত বোধ করে নি বা হাসে নি—তখনো নয় যখন সমস্ত ব্যাপারটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা জানতে পায়। সকালে হাবু মিঞা নদীতীর থেকে মাছ কিনে বাড়ি ফিরছিল। পথে রতনলাল মুহুরির ছেলে তাকে বলে, খবর এসেছে স্টিমার আজই আসবে। হাবু মিঞা কথাটি বিশ্বাস করে নি। স্টিমার নিশ্চয়ই আসবে, তবে আসতে আরো দিন কয়েক সময় নেবে। স্টিমারের কথা ভুলে গিয়ে দুপুরের দিকে দলিলপত্র নিয়ে মগ্ন হয়ে আছে এমন সময় সহসা সে সুপরিচিত বংশীধ্বনিটি শুনতে পায়। চমকিত হয়ে সে কান খাড়া করে। না, কানের ভুল নয়, স্টিমারেরই বংশীধ্বনি। এখনো দূরে, তবে স্টিমারটি যেন স্রোতে ভেসে আসছে, বংশীধ্বনিটিও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তারপর কীভাবে সে দৌড়ে বাড়ি গিয়ে ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে ঘাটে পৌঁছেছিল তা নিজেও বলতে পারবে না।

না, স্টিমার যে শীঘ্র কুমুরডাঙ্গায় ফিরে আসবে তাদের সে-বিশ্বাসের কারণ যা-ই হোক তাতে ফাঁক-ছিদ্র ছিল না, থাকলে সেদিন যারা স্টিমার ধরতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছিল তারা দু-একদিন অপেক্ষা করে যাওয়ার একটা উপায়ের সন্ধান করত—ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা না হলেও অন্ততপক্ষে তারা, যাদের জন্যে যাওয়াটা একান্ত জরুরি। যাওয়ার যে অন্য উপায় রয়েছে, তা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই ততদিনে অনেক নৌকা ঘাটে এসে মোতায়েনও হয়েছিল। সে-সব নৌকা রাতারাতি চলে এসেছিল নদী পাড়ি দিয়ে, খাল-বিল অতিক্রম করে, পাল তুলে দাঁড় বেয়ে লগি ঠেলে। কত রকমের নৌকা : ছোট-বড়, ঢঙের-বেঢঙের, এমন নৌকা যা ত্রিশ-চল্লিশজন সোয়ারি নিয়ে নির্ভয়ে পদ্মা-মেঘনা পার হয়ে যেতে পারে ঝড়-তুফান উপেক্ষা করে, আবার তেমন নৌকাও যাতে খাল অতিক্রম করতে ভরসা হয় না; কোনো নৌকা হয়তো পানিতে কাৎ হয়ে ছিল, তাকে তুলে তার গা-এ গাব ঘষে কোনোপ্রকারে ভাসিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, আবার কোনো নৌকা বেশ শক্ত মজবুত, আয়তনেও বড় কিন্তু যা ব্যবসাজীবন্ত লঞ্চ-স্টিমার-নৌকায় সমাকীর্ণ জনসঙ্কুল কোনো ঘাটে-গঞ্জে তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতার দরুণ নিষ্ফল আশায়ই দিন কাটাত। সক্ষম-অক্ষম নৌকার মধ্যে আবার বেমানান নৌকাও কম ছিল না—যে-সব নৌকাদের লালসাই টেনে নিয়ে এসে থাকবে : ঘাস-নৌকা, কুমোর-নৌকা, জন্তুজানোয়ারের নৌকা। তাছাড়া দু-টি বজরাও এসে দলে যোগ দিয়েছিল যার

BanglaBook.org

একটিতে হয়তো অন্য কোনো যুগে শৌখিন লোকেরা বাঈজি-গাইয়ে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমোদবিহারে বের হত। এখন তার রঙ নেই, খড়খড়ির অভাবে একটি জানালা খাঁ খাঁ করে, জোড়াতালি-দেয়া দেহটাও কেমন সৌষ্ঠবহীন। তবে অন্যটি ছোটখাটো ছিপছিপে, গায়ের রঙটাও তাজা। সেটি শ্রী-যৌবনের গরিমায় কিছুটা উদ্ধতভাবে অন্য বজরা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে যাত্রীর জন্যে অপেক্ষা করে।

রাতারাতি সমাগত এ-সব নৌকা-বজরা কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের হয়তো শকুনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যে-শকুন সদলবলে এসে মরণোন্মুখ জন্তুর চতুর্দিকে জমা হয়ে তার শেষ-নিঃশ্বাসের জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। তবে তারা বিচলিত হয় না। তাদের মনে হয়, শকুন যা জানে নৌকার মাঝিরা তা জানে না : নৌকার মাঝিরা জানে না কুমুরডাঙ্গার ঘাটে স্টিমার ফিরে আসবে।

কিছুদিন আগেও মুহাম্মদ মুস্তফার মা আমেনা খাতুনকে তার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তার স্বামীর নাম ছিল খেদমতুল্লা। কখনো সে খেদমতুল্লা শেখ, কখনো-বা কোনো কারণে মুন্সী খেদমতুল্লা বলে নিজের নাম-পরিচয় দিত। তবে আমরা উত্তর-ঘরের ছেলেরা তাকে খেদুচাচা বলে সম্বোধন করতাম।

চাচী আমেনা খাতুনকে খেদুচাচার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই আশায় যে তার সম্বন্ধে বিধবা স্ত্রীর কাছে এমন কিছু শুনতে পাব যা আগে কখনো শুনি নি।

আমেনা খাতুন মধ্যে-মধ্যে তার প্রথম স্বামী আফজল শেখের কথা বলে থাকে যদিও প্রথম স্বামীর স্মৃতিটা আজ তার মনে তেমন উজ্জ্বল নয়। বস্তুত তার নাম নিয়ে যে-সৌম্য চেহারার লম্বা-চওড়া মানুষের দৈহিক আকৃতি বা অশেষ চারিত্রিক গুণের বর্ণনা দেয় সে-মানুষ নিতান্ত কল্পনাপ্রসূত, যার সঙ্গে আসল মানুষটির সাদৃশ্য নেই বললে চলে। সেটা হয়তো অস্বাভাবিক নয়। আফজল শেখের যখন বিয়ে হয় তখন আমেনা খাতুন বালিকামাত্র। তাদের দাম্পত্যজীবনও স্থায়ী হয় নি, কারণ বিয়ের মাস পাঁচেক পরে বসন্তরোগে আফজল শেখের মৃত্যু ঘটে। তবে যে-মানুষের সঙ্গে দীর্ঘ পনেরো বছর বসবাস করেছে সে-মানুষের কথা আমেনা খাতুন কদাচিৎই বলে থাকে। হয়তো মানুষটি এখনো তাকে বিহ্বল করে, হয়তো তার সঙ্গে পনেরো বছরের বসবাসের স্মৃতিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তার সাহস হয় না।

খেদমতুল্লার নাম শুনে আমেনা খাতুন কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে ছিল, চোখে ক্ষণকালের জন্যে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যও দেখা দিয়েছিল। আমেনা খাতুনের চোখ বড়, যাকে এক সময়ে লোকেরা ডাগর-চোখ বলত। তবে অনেকদিন হল তার চোখের মৃত্যু ঘটে গিয়েছে। আমেনা খাতুন চোখ বোজে চোখ খোলে, তার দৃষ্টি এধার-ওধার যায় নড়ে-চড়ে, কিন্তু অন্ধের মতো জ্যোতিহীন সে-চোখে প্রাণের ক্ষীণতম স্পর্শও নেই। আরো মনে হয়, সে-চোখে দশজনের মতো দেখতেও পায় না যদিও তাতে ছানি নেই দুর্বলতা নেই। অতি সে-চোখে সহসা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে আশান্বিত হয়েছিলাম। আমেনা খাতুনের পক্ষে মানুষের আচরণ-ব্যবহারের অর্থ বা তার জীবন-উদ্দেশ্য বোঝা সহজ নয়। কিন্তু সহসা সে কি তার দ্বিতীয় স্বামী খেদমতুল্লার আচরণ-ব্যবহারের অর্থ বা তার জীবন-উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে?

আমেনা খাতুনের চোখ শীঘ্র আবার নিথর নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল, সে কিছু বলেও নি।

প্রথম স্বামী আফজল শেখের মৃত্যুর পর আমেনা খাতুন শ্বশুরালয়ে কিছুদিন অনাদরে কাটিয়ে সামান্য মনোমালিন্য ঝগড়া-ফ্যাসাদের পর সে-বাড়ির সঙ্গে চিরদিনের জন্যে যোগাযোগ ছিন্ন করে বাপের ভিটেয় ফিরে এলে দিন-কয়েকের মধ্যেই গ্রামের ব্যস্তবাগীশ চিরউৎফুল্ল যুবক খেদমতুল্লার দৃষ্টি পড়ে তার ওপর। অস্থির প্রকৃতির হলেও প্রাণবন্ত সজীবতা এবং অফুরন্ত রসিকতার জন্যে খেদমতুল্লা তখন সকলের প্রিয়পাত্র। অল্প বয়স থেকে নানাদিকে তার মন, এটা ওটা হবার সখের অন্ত নেই, হবার হয়তো ক্ষমতাও ছিল। গাইয়েদের সঙ্গে ধুয়া

BanglaBook.org

ধরা, কবিওয়ালাদের সঙ্গে ছন্দ মেলানো, ফকির-দরবেশের গন্ধে দেশান্তর হওয়া, আবার ঝোঁক উঠলে চরে গিয়ে লাঠিবাজি করা—কিছুই তার অতীত ছিল না। তারপর সহসা ব্যবসার দিকে তার মন ছোটে। মুখে দাড়িগোঁফ ভালো করে গজাবার আগেই সে সুপারি চালান হতে শুরু করে নৌকা-খাটানো পর্যন্ত নানাপ্রকার ব্যবসায় হাত মক্স করে নিয়েছিল। তবে কোনো ব্যবসায়েই এ-সময়ে কপাল লাগে নি। সে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে আমেনা খাতুনের মুরুব্বির কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় তখন পানের ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হয়ে শূন্যহাতে, হয়তো সাময়িকভাবে উজ্জ্বল কোনো পরিকল্পনার অভাবে, ঘরে বসে। তবু সে-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি কেউ দেখতে পায় নি; বরঞ্চ আত্মীয়স্বজন, মুরুব্বিরা এবং গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোকেরা সবাই সেটি এককণ্ঠে সমর্থন করে। আমেনা খাতুনের অল্পবয়সে বৈধব্যদশা, ওদিকে ব্যবসায়ে বদনছিবের বদনাম ছাড়া খেদমতুল্লার নাম নিষ্কলঙ্ক। বিয়ের বছরখানেক পরে মুহাম্মদ মুস্তফার জন্ম হয়। তখনো খেদমতুল্লা কোনো ব্যবসায়ে সার্থক হয় নি। সংসারে অনটন, বস্তুত খাদ্যবস্ত্র উভয়েরই কষ্ট। তবু সে-সব কষ্ট নিত্য-হাসিমুখ স্নেহশীল স্বামীর সাহচর্যে আমেনা খাতুন অম্লানবদনেই সহ্য করেছে।

বছর কয়েক পরে হঠাৎ খেদমতুল্লার কপাল খোলে। তখন কাপড়ের কল সস্তা কিন্তু শৌখিন ঢঙের নূতন শাড়ি বাজারে ছেড়েছে। হাটে-বাজারে দু'চারটা শাড়ি বিক্রি করতে শুরু করে দেখতে-না-দেখতে সারা অঞ্চলে কলের কাপড়ের বড় রকমের ব্যবসা ফেঁদে বসে, তারপর হাতে বেশ পয়সা হলে তিন ক্রোশ দূরে চাঁদবরণঘাটে বাড়ি করে সেখানে সপরিবারে বাসস্থান স্থানান্তরিত করে; সহসা খেদমতুল্লার জীবনে সুদিন দেখা দেয়। কেবল সে-সুদিন স্থায়ী হয় নি।

তখন সে-অঞ্চলে মাড়োয়ারিদের বড় প্রভাব-প্রতিপত্তি। তাদেরই একজনের দৃষ্টি পড়ে খেদমতুল্লা এবং তার হঠাৎ প্রস্ফুটিত লাভজনক ব্যবসার ওপর এবং বেড়াল যেমন তার নাকের তলেই লম্ফঝম্ফ করতে-থাকা ইঁদুরছানা দেখে যুগপৎ বিস্মিত-আমোদিত বোধ করে তেমনি খেদমতুল্লা এবং তার ব্যবসাটির ওপর নজর পড়লে সে-মাড়োয়ারিও বিস্মিত-আমোদিত বোধ করে থাকে। তারপর আকস্মিকভাবে থাবা নেবে আসে। অতর্কিতভাবে ব্যবসাটি হারিয়ে খেদমতুল্লা হয়তো জীবনে প্রথম একটি গভীর আঘাত বোধ করে, ন্যায়বিচারহীন নিষ্ঠুরতার বিষয়েও সজ্ঞান হয়। কিছুদিন পরে সহসা একটি পরিবর্তন দেখা দেয় তার মধ্যে। প্রথমে কেমন সংসার-পরিবার বিষয়ে উদাসীন হয়ে ওঠে, তারপর ক্রমশ গোপনকারী হয়ে পড়ে। মাস কয়েকের মধ্যে সে রহস্যময় ব্যবসাটিও ধরে। আস্তে-আস্তে সাক্ষী হিসেবে আদালতে তার হাজিরা শুরু হয়ে শীঘ্র সেটি একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। প্রথমে মহকুমার কাছারি-আদালতে, তারপর জেলা-সদরে, পরে আরো দূরে প্রদেশের রাজধানীতেও তার যাতায়াত হতে থাকে। ন্যায়-সুবিচারের মতো উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এ-মামলায় সে-মামলায় সাক্ষী দিতে শুরু করে নি—সে-কথা একদিন কারো অগোচর থাকে না, বিশেষ করে যখন নানা নির্দোষ পরিবারের ধ্বংসের, পরম দুঃখের এবং অপমান-লাঞ্ছনার কথা প্রচারিত হতে শুরু হয়। তবে তাতে সে দমে নি; একবার শঠতাকে পেশা বলে গ্রহণ করার পর শঠতার অপবাদকে ভয় করলে চলে না। নূতন ব্যবসাটি বিপদজনক হলেও অতিশয় লাভজনক : শঠতা ফলবতী হচ্ছে এ-জ্ঞানে সে গভীর তৃপ্তি লাভ করে। কেবল তৃপ্তিটা কেমন বিচিত্র যেন, কেমন বিষময়ও, কারণ সমগ্র মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করা সে-তৃপ্তিই তার অন্তরকে বিষমভাবে বিকৃত করে তোলে। ক্রমশ তার চরিত্র থেকে সর্বপ্রকার মনুষ্যত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সে-সবের স্থান নেয় হিংস্রতা, কুটিলতা, হাসি-আনন্দশূন্য উৎকট ধরনের একরোখা ভাব, মানুষের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস এবং অকথ্য কৃপণতা।

অকস্মাৎ কোনো কারণে ভীত হয়ে শেষবারের মতো এক ধনী মানুষের মামলায় দাঁও মেরে বিপদজনক অসৎ ব্যবসাটি ছেড়ে এবার সে পাটের ব্যবসা ধরে। তবে তার চরিত্রের

BanglaBook.org

আর পরিবর্তন হয় না : সে-চরিত্র যেন চিরকালের জন্যে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, স্নেহমমতার কাছ থেকেও চিরবিদায় নিয়েছিল। এ-সময়ে বাঁদি রাখার সখও চাপে তার এবং দ্বিতীয় বার বিয়ে না করে নূতন নূতন যুবতী বাঁদির আমদানি করতে শুরু করে এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে। বাঁদির বসবাসের জন্যে উঠানের পেছনে একটি আলাদা ঘর তুলে নেয়।

পরিবারের প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখা দেয় তার মধ্যে চারিত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই। আর্থিক সচ্ছলতা সত্ত্বেও অকথ্য কৃপণতার জন্যে স্ত্রী-পুত্রকে কিছু দিতে হাত উঠত না, কী-একটা দুর্বোধ্য হিংস্রতার তাড়নায় কারণে-অকারণে তাদের মারত-ধরতও। খেদমতুল্লার বিশেষ শাস্তিবিধান ছিল কনুই মারা। সে-শাস্তির উপকারিতায় তার অখণ্ড বিশ্বাস জন্মেছিল বলে কনুই মারার কৌশলটি সযত্নে করায়ত্ত করেছিল, হাতবাহু একত্র করে কনুইটা বিদ্যুৎবেগে পিঠে বসিয়ে দিলে তার ক্রোধের পাত্র নিমেষেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত। মুছল্লি মানুষের কপালে যেমন গাট্টা পড়ে তেমনি তার কনুইতে গাট্টা পড়েছিল।

সচরাচর মুহাম্মদ মুস্তফার পিঠেই সে-ভীষণ শাস্তিটা নেবে আসত। মুহাম্মদ মুস্তফা নীরবে সহ্য করত সে-শাস্তি এবং বাপের অন্তরে কোথাও পিতৃসুলভ স্নেহমমতা না থেকে পারে না, যা করছে তা অতিশয় নিষ্ঠুর হলেও ছেলের ভালোর জন্যেই করছে—এ-সব যুক্তির ওপর সমস্ত বিশ্বাস ন্যস্ত করে তার মা আমেনা খাতুনও চোখ-কান বুজে সহ্য করত। তবে একদিন হয়তো ব্যাপারটি তার সহ্যাতীত হয়ে পড়ে।

অনেক রাত করে জেলাশহর থেকে ফিরে খেদমতুল্লা দেখতে পায় মুহম্মদ মুস্তফা পেছনের বারান্দায় অন্ধকারের মধ্যে বজ্রাহত মানুষের মতো দাঁড়িয়ে। তখন মুহাম্মদ মুস্তফার বয়স তেরো হবে। বাপকে দেখেও সে না নড়ে পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে থাকলে খেদমতুল্লা এবার রুষ্ট কণ্ঠে তার আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কোনো উত্তর পায় না। বিস্মিত হয়ে ছেলের নিকটে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকায়, ছেলেও তাকায় তার দিকে ভীত হয়ে। তবে সেদিন শীঘ্র তার ভয় কাটে, কারণ তার মনে হয় সে যেন তার বাপের চোখে ক্রোধ নয়, কেমন স্নেহসূচক উৎকণ্ঠাই দেখতে পেয়েছে। কল্পিত বা সত্য সে-স্নেহের আভাস বালককে পরাভূত করে।

"লুঙ্গি ভিজে গিয়েছে", এবার মুহাম্মদ মুস্তফা উত্তর দেয়।

কথাটি বুঝতে দেখমতুল্লার কিছু সময় লাগে। কিন্তু তারপর বিদ্যুৎঝলকের মতো তার অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে পড়ে। সে বুঝতে পারে, বালক মুহাম্মদ মুস্তফা আর বালক নয়, সে তার জীবনের একটি নূতন অধ্যায় শুরু করেছে। তবে খেদমতুল্লা কেবল সে-কথাই বুঝতে সক্ষম হয়, অজ্ঞানতার জন্যে এবং ঘটনাটির আকস্মিকতার জন্যে বালক মুহাম্মদ মুস্তফা যে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে থাকবে, এ-সময়ে সে যে সমবেদনার প্রয়োজন বোধ করতে পারে বা জীবনবিষয়ে অভিজ্ঞ আপনজনদের কাছে তার রহস্যসময় আবিষ্কারের গূঢ় অর্থ জানবার জন্যে গভীর ব্যাকুলতা অনুভব করতে পারে—এ-সব কথা অতর্কিতে জাগ্রত নিদারুণ ক্রোধের জন্যে বুঝতে পারে নি, বুঝবার ক্ষমতাও হয়তো তার ছিল না। নিমেষে একটি সর্বনাশী ক্রোধ খেদমতুল্লাকে গ্রাস করে, কারণ ঘটনাটিতে একটি ভয়ানক পাপ ও অকথ্য কলুষতাই সে দেখতে পায়; বালক-ছেলে তার ক্রোধান্ধ দৃষ্টিতে একটি দুশ্চরিত্র লম্পটের রূপ গ্রহণ করে।

সে-রাতে খেদমতুল্লা ছেলেকে কনুই মারে নি; এ নির্মম শাস্তিটিও সে-রাতে তার কাছে হয়তো যথেষ্ট মনে হয় নি। প্রথমে ছেলেকে উঠানে টেনে নিয়ে গিয়ে একটি শক্ত বাঁশ দিয়ে তার দেহের পশ্চাদভাগে মত্ত ক্রোধপ্রসূত প্রচণ্ড শক্তির সাহায্যে অবিশ্রান্তভাবে প্রহার করে, তারপর কতক্ষণ উন্মত্ত মানুষের মতো অত্রযত্র লাথি মারে। মুহাম্মদ মুস্তফা একটি শব্দ করে নি। তার রহস্যময় অভিজ্ঞতা, তারপর তারাখচিত আকাশের তলে এই নির্দয় প্রহার—সবই তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়ে থাকবে। তার পক্ষে বেশি ভাবাও সম্ভব হয় নি, কারণ বাপের লাথিতে এক সময়ে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। বাপও এ-সময়ে থামে, সংজ্ঞাহীন ছেলেকে উঠানে ফেলে সে ঘরে উঠে আসে। তবে ফিরে আসতে তার দেরি হয় নি, নূতন এক ক্রোধের

BanglaBook.org

ঢেউ এসে তাকে আচ্ছন্ন করলে সে আবার ক্ষিপ্ত মানুষের মতো বেরিয়ে আসে।

বাকিটা আমেনা খাতুন দেখে নি। খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে সে অন্ধের মতো হাঁটতে শুরু করে অন্ধকার রাত্রির মধ্যে দিয়ে, চোখ অশ্রুহীন, তবে সর্বাঙ্গে অদম্য কম্পন। কোথায় যাচ্ছে সে–বিষয়ে ধারণা নেই, সে চলতেই থাকে। এক সময়ে সহসা কোত্থেকে একটি পরী এসে উপস্থিত হয়। পরীটি সস্নেহে তার হাত চেপে ধরে, তারপর তাকে নিয়ে একটি গাছের তলে বসে সুমিষ্ট কণ্ঠে তার সঙ্গে কথালাপ করে। বস্তুত দু–জনে অন্তরঙ্গ সখীর মতো গল্পগুজব করে আনন্দেই সময় কাটায়। কেবল খেদমতুল্লা যখন লণ্ঠন নিয়ে গাছের নিচে হাজির হয় তখন সে পরীটিকে দেখতে পায় নি, স্বামীকেও চিনতে তার কষ্ট হয়েছিল।

শত চারিত্রিক অবনতি, নিষ্ঠুরতা এবং পরিবারের প্রতি গভীর উদাসীনতা সত্ত্বেও একটি ব্যাপারে খেদমতুল্লা কখনো সংকল্পবিচ্যুত হয় নি। সংকল্পটি এই যে মুহাম্মদ মুস্তফাকে উচ্চশিক্ষা দেবে। সে নিজে প্রায় অশিক্ষিত ছিল। কাজেই শিক্ষা বস্তুটি কী, বিদ্যার্জনের দীর্ঘ পথের জন্যে কী পাথেয় সামগ্রীর প্রয়োজন—সে–সব বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। যা সে পরিষ্কারভাবে বুঝত বা দেখতে পেত, তা সার্থক শিক্ষার ফলাফল, বিদ্যার্জনের পুরস্কার। সে স্থির করেছিল, ছেলে বড় হয়ে উকিল হবে। জজ–হাকিম নয়, উকিল হবে—সেটাই ছিল তার স্বপ্ন। জজ–হাকিমের মান–সম্মান নয়, উকিলের আইন নিয়ে খেলা করার সুযোগই তাকে অধিকতর আকৃষ্ট করত। তার মনে হত, ওকালতিতে মানুষ যতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে জজিয়তি–হাকিমিতে ততটা পারে না; জজ–হাকিম শুধু দিনকে দিন রাতকে রাত প্রমাণ করে, উকিল দিনকে রাত রাতকে দিন করার ক্ষমতা রাখে।

ছেলে উকিল হবে একবার স্থির করলে সে অধৈর্য হয়ে পড়ে; সে ভাবত তাড়াহুড়া করলেই দীর্ঘ পথ সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, সময়কে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে। সে আরো ভাবত, প্রহার দ্বারাই স্মৃতিশক্তির অভাব মেটানো যায়, দৈহিক মানসিক শ্রান্তি দূর করা যায় অতি শ্রমের সাহায্যে। বস্তুত তার ভাবটি ছিল অনেকটা নির্বোধ গাড়োয়ানের মতো, যে–গাড়োয়ান শ্রান্তক্লান্ত মৃতপ্রায় জানোয়ারকে কেবল অঙ্কুশাঘাতেই গন্তব্যস্থলের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

তবারক ভুইঞা বলে : সেদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হতেই উকিল কফিলউদ্দিন সাহেব কেমন উৎফুল্ল বোধ করে, কারণ তার কেমন মনে হয় প্রতিবাদপত্রটি কার্যকর হয়েছে, সরকার প্রথমে স্টিমার–কোম্পানির পক্ষ নিলেও অবশেষে বুঝতে পেরেছে এমন দিনে–দুপুরে ডাকাতি ঢাকা যায় না, সমর্থন করাও যায় না।

ততদিনে উকিল সাহেবও কিছু নমনীয়তা দেখিয়েছে; দুনিয়াতে বাস করতে হলে সমঝোতা করতে হয়, নিতে হলে দিতে হয়। সে চড়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। যা–স্বীকার করে নি তা এই যে সে–চড়ার জন্যে স্টিমার–চলাচল বন্ধ করা প্রয়োজন। স্টিমারঘাট সম্বন্ধে যে–সব জনশ্রুতি তার কানে এসে পৌঁছায় তাতে তাই প্রথমে নারাজ না হয়ে পারে নি: কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা কী দুর্বলতা দেখাতে শুরু করেছে? তারা দুর্বল হয়ে পড়লে একা কী করে লড়াই করবে, কাদের জন্যেই–বা লড়াই করবে? তবে সে আশ্বস্ত হয় এই দেখে যে সে–সব জনশ্রুতি যে–রকম রূপ ধারণ করুক না কেন কেউ আর বিশ্বাস করে না স্টিমারঘাট স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। যারা এমন মত প্রকাশ করে তাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করতে দ্বিধা করে নি উকিল সাহেব। দুদিন ধরে ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের সঙ্গে কথা বন্ধ; ডাক্তারের এখনো যেন বিশ্বাস, কোম্পানি লাচার হয়ে স্টিমার তুলে দিয়েছে। গত পরশুদিন বড় হাকিমের সঙ্গে বেশ উঁচুগলায় কথা বলেছে; বড় হাকিম কোম্পানির সাফাই গাইবার চেষ্টা করেছিল। তার মেজাজটা তখুনি গরম হয়ে ওঠে। সে বলে, চড়া পড়ে নি তেমন কথা সে কোনোদিন দাবি করে নি, শুধু বলেছে সে–চড়া পাশ কাটিয়ে স্টিমার বেশ দিব্যি নির্বিঘ্নে

BanglaBook.org

আসা-যাওয়া করতে পারে এবং কিছু যদি স্টিমারের আসা-যাওয়া বন্ধ করে থাকে তা বালির চড়া নয়, অর্থলালসার চড়া : সে-চড়াই একটি শহরের সুখ-সুবিধা দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে মস্ত প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করেছে।

নিত্যকার মতো সেদিন উকিল কফিলউদ্দিন যখন কয়েকজন মক্কেলের সাথে কাছারি-আদালত অভিমুখে রওনা হয় তখনো সে মনে-মনে উৎফুল্ল বোধ করে, কেবল তা মুখের থমথমে ভাবের তলে আত্মগোপন করে থাকে; বুকে শোকব্যথা বোধ না করলেও সে সর্বসমক্ষে কৃত্রিম অশ্রুসম্পাত করতে সদা প্রস্তুত, কিন্তু কোনো কারণে ভেতরে আনন্দের ধারা প্রবাহিত হলেও তা প্রকাশ করতে তার দ্বিধা হয়। যা বিরল তা অতি মূল্যবান : তা দেখাতে সঙ্কোচ হয়।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর উকিল কফিলউদ্দিনের আরেকটি খেয়াল হয় যাতে তার মনের উৎফুল্লভাবটা আরো বেড়ে যায় যেন। খেয়ালটা এই যে, প্রতিবাদপত্রটি কার্যকর হয়েছে শুধু তাই নয়, দু-চারদিনের মধ্যেই স্টিমার কুমুরডাঙ্গায় ফিরে আসবে। এমন খেয়ালের যুক্তি-যথার্থতা কী, কীই-বা ভিত্তি? তা বলতে পারবে না, তবে সে জানে এমনভাবে যে-সব খেয়াল মাথায় আসে তা কদাচিৎই ভুল হয়। জীবনে এমনটা অনেকবার হয়েছে : কিছু ঘটবার আগেই কী করে জানতে পেয়েছে তা ঘটবে। তার যেন কী-একটা অদ্ভুত ক্ষমতা, ভবিষ্যতের কথা কী করে জানতে পায় সে। মাসখানেক আগে একদিন হঠাৎ তার খেয়াল হয়, কে যেন আসবে। কারো আসার কথা ছিল না, খেয়ালটি তাই অহেতুক মনে হয়, কিন্তু পরদিন মুটের মাথায় বিছানাপত্র চাপিয়ে তার স্ত্রীর ছোট ভাই আশেক মিঞা অপ্রত্যাশিতভাবে দোরগোড়ায় দেখা দেয়। অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যের জন্যে, তার জন্যে নয়। সেদিন স্টিমার ধরতে গিয়েছিল মেয়ে হোসনার সম্বন্ধে মনে কেমন একটা খেয়াল জেগেছিল বলেই। যেতে না পারলে জামাইর কাছে তার পাঠিয়েছিল : কোনো খবর নেই বলে সে চিন্তিত। পরদিন উত্তর পায়, হোসনার সামান্য সর্দি-কাশি হয়েছে, তাছাড়া সব ভালো, চিন্তার কোনো কারণ নেই। মনে-মনে সে বড় তৃপ্ত হয়েছিল এই বুঝে যে তার এমনই ক্ষমতা যে মেয়ের একটু সর্দি-কাশি হলেও কী করে সে খবর পেয়ে যায়।

হঠাৎ পেছনের দিকে অর্ধেক মুখ ফিরিয়ে সে প্রশ্ন করে,

"আজ বিষ্যুৎবার নাকি?"

"হ্যা, আজ বিষ্যুৎবার।" দুটি লোক সমস্বরে বলে ওঠে।

প্রশ্নটি কেন জিজ্ঞাসা করে তার আভাস না দিয়ে সে নীরবে হাঁটতে থাকে। তবে ততক্ষণে সে দিনটা ঠিক করে নিয়েছে : স্টিমার আসবে শনিবার। মন যেন তাই বলছে। তাই যদি হয় তবে রবিবারই সে সদর অভিমুখে রওনা হয়ে পড়বে। মেয়ে হোসনা সম্বন্ধে মনে আবার কোনো দুশ্চিন্তা দেখা দেয় তা নয়, তবে হঠাৎ তাকে দেখবার জন্যে কেমন অধীরতা বোধ করতে শুরু করে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটির চেহারাও সুস্পষ্টভাবে জেগে ওঠে তার মনশ্চক্ষে। হোসনা চোখের সামনে না থাকলে তার যে-চেহারাটি সে দেখতে পায় তা তার বালিকাবয়সের চেহারা, যেন বাপের চোখে মেয়েটি বড় হয়ে যুবতীতে পরিণত হবার অবকাশ পায় নি, তার বিয়ে হয় নি, একটি ছেলের মাও হয় নি সে। কখনো-কখনো মেয়েটি চোখের সামনে থাকলেও উকিল সাহেব তার বেশ কয়েক বছর আগের চেহারাটিই দেখতে পায় : কোঁকড়ানো চুলের মধ্যে মিষ্টি একটি মুখ, বড় বড় চোখে দাম্ভিকতার ভাব। তখন তার বয়স সাত-আট। সে-বয়সেই মেজাজটা বেশ উগ্রধরনের হয়ে উঠেছিল, কিছু চেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে না পেলে বা কোনো শখ আবদার তৎক্ষণাৎ না মেটালে চোখ কালো হয়ে উঠত ঠোঁট ফুলে উঠত। গোপনে-গোপনে স্ত্রীকে বলত, মেয়েটির মেজাজ শাহজাদির মতো। স্ত্রী উত্তর দিত, বাদশাহ কোথায় যে শাহজাদি হবে? মনে মনে সে উত্তর দিত : কুমুরডাঙ্গার বাদশাহ সে, সে বাদশাহের মেয়ে হল হোসনা।

"আজ বিষ্যুৎবার?" আবার উকিল সাহেব প্রশ্ন করে, যেন সেবার উত্তরটি শুনতে পায় নি।

BanglaBook.org

এবার পশ্চাৎ থেকে চারটি লোক বেশ জোরগলায় বলে,

"হ্যাঁ, আজ বিষ্যুৎবারই উকিল সাহেব।"

তবে মধ্যে একটি মাত্র দিন, তারপর স্টিমার আসবে। এবং দুটি দিন—আজকার এবং সদর অভিমুখে রওনা হওয়ার মধ্যে। একবার তার ইচ্ছা হয় কেন প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিল তা মক্কেলদের বলে, কিন্তু শেষপর্যন্ত নীরব থাকাই সমীচীন মনে করে; ইতিমধ্যে মেয়েকে দেখবার জন্যে রবিবারে সদর অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ার পরিকল্পনাটা যদি করে না ফেলত তবে হয়তো বলতে বাধা বোধ করত না।

ততক্ষণে উকিল কফিলউদ্দিন কুমুরডাঙ্গার একমাত্র বাঁধানো সড়কের নিকটে এসে পড়েছে। সড়কটি কাছারি-আদালতের সামনে মাঠের এক পাশ দিয়ে শুরু হয়ে নদীর ধার দিয়ে পোয়া-মাইলখানিক গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। পোয়া-মাইল দীর্ঘ সড়কটির অবস্থা বড়ই শোচনীয়, কারণ অনেকদিন মেরামত হয় নি বলে এখানে-সেখানে নানা আয়তন-গভীরতার গর্ত, আবার যেখানে গর্ত নেই সেখানে ধারালো ইট-কঙ্করের নির্লজ্জ দন্তবিকাশ। বস্তুত, সে-বাঁধানো সড়কে জুতা নিয়েও পা-দেয়া দুষ্কর, এবং বাঁধানো অংশটি এড়িয়ে তার এক পাশে দিয়ে মানুষেরা বাধ্য হয়ে যে পায়ে-হাঁটার পথ করে নিয়েছে সে-পথ ধরেই সবাই হাঁটে। একদা ইংরেজের আমলে কেউ তার নাম দিয়েছিল ই. বি. ক্র্যাংশ রোড—যে-নাম রাস্তার এক প্রান্তে একটি ছায়াশীতল বড় গাছের গুঁড়িতে পোতা কাষ্ঠফলকে এখনো বিরাজমান, যদিও ঝুলে-পড়া লতাপাতার জন্যে তা নজরে পড়ে না, পড়লেও দীর্ঘদিনের রোদবৃষ্টিতে অপাঠ্য-হয়ে-উঠা অক্ষরগুলির অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

ব্যবহারের অযোগ্য সে-সড়কের পাশে পায়ে-হাঁটার পথে উঠেছে এমন সময় কফিলউদ্দিন সাহেব একটি আওয়াজ শুনে চমকিত হয়ে থেমে পড়ে। আওয়াজটি যেন স্টিমারের বাঁশির আওয়াজ। তবে কি স্টিমার ফিরে এসেছে? শনিবারে নয়, আজই এসে পড়েছে? দিনক্ষণের বিষয়ে কিছু ভুল হলেও মনে যে-কথাটি এসে দেখা দিয়েছিল তা তবে সত্য?

"কিসের আওয়াজ শুনলাম যেন।" উকিল কফিলউদ্দিন বলে।

পশ্চাতের মক্কেলরাও দাঁড়িয়ে পড়ে নদীর দিকে তাকিয়ে শুনবার চেষ্টা করছিল। সেখান থেকে স্টিমারঘাট নজরে পড়ে না। শীঘ্র একজন মক্কেল উত্তেজিত ভাবে বলে,

"বোধ হয় স্টিমার এসেছে।"

আরো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে উকিল কফিলউদ্দিন বাক্‌শক্তি-রহিত মানুষের মতো নীরবে আবার হাঁটতে শুরু করে, কোনো অবস্থাতেই যে-মানুষের ধীর-মন্থর পদক্ষেপে তারতম্য দেখা যায় না তারই পদক্ষেপে যেন ঈষৎ চাঞ্চল্য, কেমন একটু অধীরতা এসে পড়ে।

কাছারি-আদালতের সামনে পৌঁছুলে উকিল কফিলউদ্দিন দেখতে পায়, সামনের মাঠের পথ দিয়ে অসংখ্য লোক দৌড়াচ্ছে। তারা যে ঘাটের দিকেই যাচ্ছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। উকিল সাহেবের একবার ইচ্ছা হয় সেও ঘাটের দিকে পা বাড়ায়, কিন্তু নিজেকে সংযত করে মাঠে নেবে পড়ে। কেবল একবার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, "স্টিমারই এসেছে।"

তবে পরে উকিল সাহেব আসল খবরটি জানতে পায়।

যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘাটে উপস্থিত হয় তারা স্টিমারের স্থলে ছোটখাটো একটি লঞ্চ দেখতে পেয়ে কিছু নিরাশ বোধ করে কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারে না। তারা ভাবে, তবে স্টিমারের পরিবর্তে লঞ্চই চালু করা হয়েছে বুঝি। অবশ্য লঞ্চের আগমনের কারণ শীঘ্র তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে : সেটি যাত্রী নিয়ে আসে নি, যাত্রী নিতেও আসে নি, এসেছে ঘাট থেকে ফ্ল্যাটটি সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাবার জন্যে। তাদের মধ্যে থেকে দু-চারজন লোক ছুটে এসে উকিল সাহেবকে স্টিমার-কোম্পানির বিশ্বাসঘাতকতার নতুন একটি প্রমাণের খবর দিলে প্রথমে উকিল সাহেবের মনে হয় সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না : এমন আস্পর্ধার কথা কি সহজে বিশ্বাস হতে চায়? শোনায় যে গলতি হয় নি বা যারা খবরটি নিয়ে

BanglaBook.org

এসেছে তারা যে ভুল করে নি, এ-বিষয়ে নিশ্চিত হলে সে পুলিশকে এত্তেলা দেবে স্থির করে, তারপর পুলিশরা যে আবার হাকিম-সুবার নির্দেশ ছাড়া নড়ে না তা বুঝে নিজেই বড় হাকিমের এজলাসে হাজির হয়, চোখে সংযত আগুন, কণ্ঠে ভীতিজনক গাম্ভীর্য। তবে ততক্ষণে স্টিমারঘাটে লঞ্চে করে যারা এসেছিল তারা কাজে লেগে গিয়েছে। যে-ফ্ল্যাট বহুদিন ধরে একই স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে স্থাবর রূপ গ্রহণ করেছিল সে-ফ্ল্যাটটি চোখের পলকেই তারা ঘাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। দেখতে-না-দেখতে তারা সামনের এবং পেছনের দুটি নোঙর নদীর নরম বুক থেকে উঠিয়ে নেয়, তারপর এখানে-সেখানে কিছু দড়িদড়া খোলে, অবশেষে তীরের দিকে বালুতে বিঁধে থাকা কাঠের পুলটা তুলে নেয় : সব কিছু অতি সহজে উঠে আসে, কোনো কিছুই বিন্দুমাত্র বাধা প্রদান করে না, একটু আপত্তিও জানায় না। ইতিমধ্যে ফ্ল্যাটটির দেহের তুলনায় হাস্যকরভাবে ছোট কিন্তু চটপটে, ব্যস্তবাগীশ লঞ্চটি ফ্ল্যাগটিকে পাশাপাশিভাবে বেঁধে নিয়েছিল, এবার তার কেবল পথ ধরা বাকি। পথ ধরতে দেরিও করে না, কুমুরডাঙ্গার সঙ্গে ফ্ল্যাটের দীর্ঘ দিনের সম্বন্ধ নিমেষে সমাপ্ত করে তীরের ওপর নীরবে দণ্ডায়মান সে শহরের স্তব্ধ বিমূঢ় শত শত অধিবাসীর চোখের সামনে দিয়ে রওনা হয়ে পড়ে, কেউ তার পথরোধ করবার চেষ্টা করে না।

সে সময়ে এজলাসে বড় হাকিম তার বিরক্তি হাসিতে ঢাকবার বৃথা চেষ্টা করে বলছিল,

"ফ্ল্যাট ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি স্টিমার চলবে? নদী যদি ঠিক হয় তবে সব ফিরে আসবে। ঘাট ফিরে আসবে, স্টিমার ফিরে আসবে।"

এবার নীরবে উকিল কফিলউদ্দিন এজলাস ত্যাগ করে। কেউ তার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পায় নি।

সে রাতে কুমুরডাঙ্গা শহরে একটি বিচিত্র নীরবতা নাবে। ঝড়ের আগের নীরবতা নয়, ঝড়-উত্তর সর্বস্বান্ত নিঃস্ব নীরবতা। তবে কুমুরডাঙ্গার পথে স্টিমার-চলাচল সত্যি বন্ধ হয়েছে, সন্দেহের আর কোনো অবকাশ নেই : ঘাটটি হঠাৎ শূন্য হয়ে খাঁ-খাঁ করতে শুরু করে সব সন্দেহ দূর করেছে। কেউ হা-হুতাশ করে না, কিন্তু কেমন নিস্তেজ হয়ে থাকে কী-একটা মনভারে। হয়তো তারা মনে মনে কিছু লজ্জা বোধ করে। সকালের ঘটনাটি কি অপ্রত্যাশিত? সত্য কথা কি তারা জানে না? তা স্বীকার করতে চায় নি বলেই কি ফ্ল্যাটটি অনর্থক ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকবে যেন কিছু হয় নি, কোথাও চড়াও পড়ে নি? হয়তো সহসা অন্য একটি কথা বুঝতে পারে বলে তাদের মনে গভীর ব্যথার সৃষ্টি হয়। সেটি এই যে, তাদের বাকাল নদী স্টিমারের গমনাগমনের জন্যে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে শুধু তাই নয়, মৃত্যুমুখেও পতিত হয়েছে। যে-নদীর অপর তীরে শরৎকালীন কাশবনের দিকে তাকিয়ে তারা উদাস হয়, যার বুকে পাল-দেয়া নৌকার চলাচল দেখে অন্তরে সুদূরের আহ্বান শোনে, কখনো তাতে সূর্যাস্তের শোভা দেখে নয়ন তৃপ্ত করে, সে-নদী মরতে বসেছে। হয়তো এ-সময়ে অকস্মাৎ এ-কথাও তাদের মনে পড়ে যে তারা নদীকে ব্যবহার করেছে, ঝড়ের দিনে প্লাবনের সময়ে ভয় করেছে কিন্তু কখনো ভালোবাসে নি। নদীকে ভালোবাসার কথা কেউ বলে না, ভালোবাসতে শেখায়ও না, আবার নিজে থেকেই তার প্রতি একটু ভালোবাসা বোধ করলে সে-ভালোবাসা প্রথম সূর্যের ক্ষীণ উষ্ণতায় শিশিরবিন্দুর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মতো শীঘ্র অদৃশ্য হয়ে যায়; যা সুন্দর কোমল তা জীবনের স্থূল বাস্তবতায় শীঘ্র বিলীন হয়ে যায়। কোনো না কোনো সময়ে কে না শুনতে পায় হঠাৎ বেজে-ওঠা অদৃশ্য হাতের চুড়ির অস্ফুট শব্দ, কে না দেখতে পায় সন্ধ্যাকাশের মধ্যে আচম্বিতে দৃশ্যমান হওয়া রহস্যময় হাতছানি, ক্ষণকালের জন্যে হলেও কার বুকে না জাগে অন্তর-নিঃস্ব-করা হাহাকার? তবে সবই অবিলম্বে শেষ হয়, পরে চোখ অন্ধ হয়, কান বধির হয়। হয়তো তারা নদীর প্রতি ভালোবাসা বোধ করে না, তার মৃত্যুর কথায় মানুষের মৃত্যুর কথাই মনে পড়ে বলে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। নদীটি যেন মানুষের মতো মরতে বসেছে। একদিন তবে মানষের মতো তার যৌবন ছিল যে-যৌবন আর নেই। পরে প্রৌঢ়বয়সের স্থৈর্য-

BanglaBook.org

গাম্ভীর্যে প্রশান্ত হয়ে উঠেছিল, এক সময়ে সেদিনেরও অবসান ঘটে। তারপর ধীরে-ধীরে বার্ধক্য ঘনিয়ে আসে দিনান্তের মতো, এবং এবার তার আয়ু ফুরিয়ে এলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে; মানুষের জীবনের মতো নদীর জীবনও নশ্বর। সে-কথাই তাদের মন ভারী করে তোলে।

তবে সে-রাতে মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন বিচিত্র কান্নার আওয়াজটি শুনতে পায়।

একদিন তারা গভীর রাতে কামলাতলা বিল থেকে খেদমতুল্লার লাশটি উদ্ধার করে চাঁদবরণঘাটের বাড়িতে নিয়ে আসে। আমেনা খাতুন বা মুহাম্মদ মুস্তফা লাশটি প্রথমে শনাক্ত করতে পারেনি, কারণ দা-এর নির্মম আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড মাথা-মুখের শনাক্তযোগ্য অবস্থা ছিল না। তারপর আমেনা খাতুনের চোখ পড়ে আঙটির ওপর এবং সে-আঙটি দেখেই রাতের নীরবতা বিদীর্ণ করে সে আর্তনাদ করে ওঠে; বেশ কয়েক বছর আগে ব্যবসায়ে সর্বপ্রথম কপাল খুললে সদর শহরে এক জহুরীর দোকান থেকে বড় শখ করে খেদমতুল্লা লালপাথর বসানো সোনার আঙটিটি কিনেছিল।

আমি তখন চাঁদবরণঘাটে বেড়াতে এসেছিলাম। আমেনা খাতুনের আকস্মিক আর্তনাদ নিঃসন্দেহে আমার নিদ্রা-অবশ কানে পৌঁছেছিল, কিন্তু সে-আর্তনাদ জেগে উঠেই থেমে গিয়েছিল বলে ঘুমটা ভাঙে নি, আর্তনাদটিও আমার স্বপ্নের রহস্যময় গুহাগহ্বরে বার-কয়েক প্রতিধ্বনিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকবে। তারপর হয়তো গভীর নীরবতার জন্যে এক সময়ে বুঝতে পারি কোথাও অসাধারণ কোনো ঘটনা ঘটেছে; এ-সব ঘটনা শুধু শব্দের মধ্যে দিয়ে নয়, নিঃশব্দতার মধ্যে দিয়েও আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

আমি যখন ভেতরের বারান্দায় উপস্থিত হই ততোক্ষণে যারা খেদমতুল্লার মৃতদেহটি বহন করে নিয়ে এসেছিল তারা একটি সাদা চাদর দিয়ে মৃতদেহটি ঢেকে লণ্ঠন হাতে চাঁদহীন অন্ধকার রাতের মধ্যে দিয়ে ফিরতি-পথ ধরেছে। প্রথমে মাতা-পুত্রকে দেখতে পাই। বারান্দার মধ্যখানে একটি লণ্ঠন জ্বলছিল। সে-আলোতে দেখতে পাই আমেনা খাতুন একটি পিঁড়ির ওপর নিশ্চল হয়ে বসে, মুখে স্তব্ধভাব কিন্তু বেদনা বা আঘাতের কোনো আভাস নেই, চোখে অশ্রু নেই। অদূরে হাঁটু তুলে পায়ের ওপর ভর দিয়ে চৌদ্দ বছরের ছেলে মুহাম্মদ মুস্তফাও বসে, দৃষ্টি মেঝের দিকে। তারপর বাঁদিটিকেও দেখতে পাই। রান্নাঘরের পাশে তার ঘর থেকে উঠে এসে বারান্দার প্রান্তে সে পা ঝুলিয়ে বসেছে। শুধু তারই দৃষ্টি মৃতদেহটির ওপর : চোখে বিহ্বলতা, যে-বিহ্বলতা কেমন যেন জমে গিয়েছে কারণ বোধ-বুদ্ধির স্রোত কোথাও সহসা থেমে পড়েছে। এবার আমার নজর পড়ে দেয়াল-ঘেঁষে-রাখা সাদা চাদরে আবৃত লাশটির ওপর। তবু তখনো সবটা বুঝি নি। চাদরের নিচে নিথর দেহ-মুখের অস্ফুট রেখাগুলির অর্থোদ্ধার করবার চেষ্টা করছি এমন সময় দূরে কোথাও একটি হুতুম পাখির ডাক শুনতে পাই। হুতুম পাখি নিত্যই ডাকে, তবে আমার সহসা কেমন মনে হয় সে-ডাক কখনও শুনি নি। হয়তো মনে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়ে থাকবে : হুতুম পাখি ডাকছে কেন? তারপর এক সময়ে কোনো পূর্বাভাস না দিয়ে বৃষ্টি নাবে, যে-বৃষ্টির আওয়াজও চিনতে কষ্ট হয়; বৃষ্টিটা যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে নয়, রাত্রির অন্ধকার থেকেই ঝরছিল, পানি নয়, উপছে-পড়া পরিপূর্ণ স্তব্ধতা। বাঁদি মেয়েটি না নড়ে বারান্দার প্রান্তে বসে থাকে, শীঘ্র তার মুখ, তার নগ্ন হাত-বাহু এবং শাড়ি ভিজে ওঠে। ক্রমশ সবই আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকে : মাতা-পুত্রের এবং বাঁদিটির নিশ্চল হয়ে বসে থাকা, প্রায় অদৃশ্যভাবে ঝরতে-থাকা বৃষ্টি। রহস্যভেদ করবার জন্যেই যেন সাদা চাদরে আবৃত মৃতদেহটির দিকে আরেকবার দৃষ্টি দেই। এবার কী করে চাদরের মধ্যে দিয়ে জেগে-থাকা নিথর মুখের অস্ফুট রেখাগুলি একটা অর্থ গ্রহণ করে, যদিও কিছু দেখা সম্ভব হয় না তবু বুঝতে পারি খেদমতুল্লা আর হুঙ্কার দেবে না; যে-হুঙ্কার গত ক-বছরে পশুর আর্তনাদের মতো হয়ে উঠেছিল, মানুষের মনে অকথ্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করত,

BanglaBook.org

সে-হুঙ্কার আর কেউ শুনতে পাবে না।

তারপর ধীরে-ধীরে পূর্বাকাশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে, একটি নূতন দিন শুরু হয়।

সেদিনই মুহাম্মদ মুস্তফা উক্তিটি শুনতে পায় । কেউ বলে, "বদলোকের নছিবে অপঘাতে মৃত্যুই বরাদ্দ থাকে।"

কেবল সেদিন কথাটি সে বুঝতে পারে নি। পরে ধীরে-ধীরে, খণ্ড-খণ্ডভাবে সব জানতে পায়। সে জানতে পায়, তার বাপ অতিশয় দুর্বৃত্ত মানুষ ছিল। সে জানতে পায়, অনেক মানুষকে তার বাপ ধ্বংসের পথে বসিয়েছিল, হক-দাবি-প্রাপ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করেছিল, নিরপরাধ শিশুদের জীবনের জন্যে দণ্ডিত করেছিল। কখনো ইঙ্গিতে বলা কোনো কথায়, কখনো নির্দয়ভাবে দেয়া বৃত্তান্তসমৃদ্ধ বিবরণে, কখনো তীব্র ঘৃণাভরা কণ্ঠে নিক্ষিপ্ত অভিযোগে, কখনো আবার স্পষ্টতই পরস্পরবিরোধী বিবৃতিতে—এ-সবে মিলে মুহাম্মদ মুস্তফার মনে ক্রমশ যে-মানুষের চিত্র স্পষ্টাকার রূপ ধারণ করে সে-মানুষকে সে যে চিনতে পারে তা নয়, তবু তাকে প্রত্যাখ্যান করতেও সাহস হয় না তার। কখনো-কখনো তার মনে হয় সে যেন এমন একটি মানুষের কথা শুনছে জীবনে যার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। ঘোর পাপিষ্ঠ মানুষেরও জীবনে উদ্দেশ্য থাকে; লোভ হিংসা হীনতা নীচতা নিষ্ঠুরতার দ্বারা তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইলেও সে উদ্দেশ্যহীন নয়। উদ্দেশ্যহীন মানুষ আর মানুষ নয়, সে অমানুষ। তার বাপ খেদমতুল্লা কি অমানুষ ছিল? তবে এই প্রশ্নটিও স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করতে তার সাহস হয় নি। সে শুনে যায়, এবং হয়তো প্রত্যেক কথাই গ্রহণ করে বিনা প্রশ্নে, তা যতই নিষ্ঠুর বা বেদনাদায়ক হোক না কেন। হয়তো তার জন্মদাতার বিষয়ে যা সে শোনে তার সত্যাসত্য বিচার করার প্রয়োজনও দেখে না : বাপ খেদমতুল্লা দুর্বৃত্ত লোক ছিল তা একবার গ্রহণ করে নেবার পর কোথায় কে একটু অতিরঞ্জন করেছে বা কোথায়-বা ঈষৎ বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে—এ-সবের বাছাই-ছাঁটাই অবান্তর মনে হয় তার কাছে। বাপের শাস্তিটা অপরাধের তুলনায় যে মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে তেমন কথা মনে হয়ে থাকলে আবার হয়তো ভেবেছে, সে-বিষয়ে চুলচেরা বিচার অর্থহীন এই কারণে যে একটি বিশেষ স্তর পেরিয়ে যাবার পর মানুষের পাপ-দুষ্কর্ম আইনের দাঁড়িপাল্লায় হয়তো ওজন করা যায় কিন্তু অন্তরের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা যায় না। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে উপদেশ দেয়, যে বা যারা কামলাতলা বিলে জঘন্য কাজটি করেছে তার বা তাদের যথাবিধি শাস্তি বিধান হওয়া উচিত, কারণ খেদমতুল্লা সৎলোক ছিল না বটে কিন্তু তার খুনের কথা নির্বিবাদে গ্রহণ করা যায় না। তবে এই উপদেশটি তাকে বিস্মিত করে, যেন খেদমতুল্লার দুর্বৃত্ত চরিত্রের কথা গ্রহণ করে নিলেও কেউ যে তাকে নির্মমভাবে খুন করে থাকবে, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে নি। হয়তো ছেলের পক্ষে তার বাপ সম্বন্ধে প্রথম কথার চেয়ে দ্বিতীয় কথাই গ্রহণ করা দুষ্কর। লোকেরা তাকে এ-কথাও বলে, যে বা যারা নিষ্ঠুর হত্যার জন্যে দায়ী তার বা তাদের সন্ধান পাওয়া তেমন কঠিন কাজ নয়; বস্তুত একটি নাম সকলেই কানাঘুষায় শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু সে-বিষয়েও সে কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নি।

তখন মুহাম্মদ মুস্তফা নাবালক। তবে সাবালক হওয়ার পরেও কোনো ঔৎসুক্য দেখায় নি।

মুহাম্মদ মুস্তফার মনোভাব থেকে-থেকে অনেকদিন আমাকে কেমন বিচলিত করেছিল। সে কোনো-প্রকার জিঘাংসা বোধ করে নি বলে নয়, অতি সহজে বিনাবাক্যে তার জন্মদাতার দুর্বৃত্তচরিত্রের কথা মেনে নিয়েছিল বলে এবং কে যে তার খুনী সে-বিষয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে নি বলে অন্তরে কী-একটা বিহ্বলতা, কী একটা ব্যথা অনুভব করতাম। মনে হত তার আচরণ রক্তসম্বন্ধশূন্য মানুষের মতো যেন। বাপ অতিশয় দুর্বৃত্ত লোক—সে-কথা ছেলে হয়েও অনাত্মীয় মানুষের মতো স্বীকার করে নিয়েছে, অনাত্মীয় মানুষের মতো অপরাধীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার জন্যে কোনো বিশেষ আগ্রহ বোধ করে নি, এমনকি তাদের মতোই

BanglaBook.org

যেন বিশ্বাস করে কেউ যদি খেদমতুল্লার দুষ্কৃতির বদলা নেবার জন্যে তাকে খুন করে থাকে তবে খুনীর দোষটা তেমন গুরুতর নয়। তবে আমি আমার কিছু বিহ্বল কিছু বিচলিত মনকে প্রবোধ দেই এই বলে যে, মুহাম্মদ মুস্তফার চরিত্রটা তেমনই : ছোট-বড় সাধারণ-অসাধারণ সব কথা সে সহজে বিনাবাক্যে গ্রহণ করে নেয়।

খেদমতুল্লার মৃত্যুর কিছুদিন পরে চাঁদবরণঘাটের বাসাবাড়িটা পানির দরে বিক্রি করে মাতা-পুত্র গ্রামের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে। কিছুদিন মনে-প্রাণে নিঝুম হয়ে থাকার পর মুহাম্মদ মুস্তফা একটি বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হয়; সে পড়াশুনা বন্ধ করবে না, যেমন করে হোক স্কুল শেষ করবে, তারপর সম্ভব হলে কলেজে এবং আরো পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। শীঘ্র সংকল্পটি সে কার্যে পরিণত করতে উদ্যত হয়। তারপর ধীরে-ধীরে, পায়ে-পায়ে সে এগিয়ে যায়, কোথাও যে যাচ্ছে সে-কথা না ভেবে, একে-একে সব প্রতিবন্ধক যে পেরিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে সচেতন না হয়ে। প্রথমে তেমন আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয় নি। তবে শীঘ্র তা বিষম সমস্যায় পরিণত হয়। এত শঠতা অসৎ কলাকৌশল সত্ত্বেও খেদমতুল্লা কেবল সামান্য কিছু জমিজমাই রেখে গিয়েছিল। সে-জমিজমাও ধরে রাখা সম্ভব হয় নি, রাখার চেষ্টাও সে করে নি; অসৎ মানুষ যদি সদুপায়ে কিছু সংগ্রহ করে থকে তাও কলঙ্কময় এবং না-জায়েজ মনে হয়। কঠোর পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠতার দ্বারা সর্ব প্রতিবন্ধক সকল প্রকারের বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হয় মুহাম্মদ মুস্তফা।

ধীরে-ধীরে মুহাম্মদ মুস্তফার মধ্যে কেমন পরিবর্তন এসে যায়। সে মাত্রাতিরিক্তভাবে নিরীহ নম্রভদ্র হয়ে পড়ে। তবে সে-নিরীহতা নম্রতা ভদ্রতা এমনই যে সে-সব তাকে যেন কেমন নিশ্চিহ্ন করে ফেলে; মানুষের পরিবর্তে সে একটি ছায়ায় পরিণত হয়। সে যে অসামাজিক হয়ে ওঠে বা অন্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে বা আলাদা হয়ে থাকে তা নয়, বরঞ্চ বেশ নিয়মিতভাবে সামাজিক বা মাজহাবি জামাতে-বৈঠকে হাজির হতে থাকে। তবে এ-সামাজিকতার আসল উদ্দেশ্য যেন তার বিষয়ে সমাজের কৌতূহল এড়ানোই; সে যেন বুঝতে পারে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করার, এমনকি গা-ঢাকা দিয়ে থাকার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা। এ-সময়ে মজলিস-মাহফিলে উপস্থিত হলে তার উপস্থিতির বিষয়ে কদাচিৎ মানুষেরা সজ্ঞান হত এবং কখনো তার কণ্ঠস্বর শোনা গেলেও সে যা বলত তা মানুষেরা পরমুহূর্তেই ভুলে যেত কারণ কথা বলেও সে কখনো বিশেষ কিছু বলত না : যেন ক্বচিৎ-কখনো সে মুখ খুলত কেবল তার হাজিরা ঘোষণা করার জন্যে। হাসিও তেমন দেখা যেত না তার মুখে। যদি-বা কখনো ক্ষীণভাবে হাসত সে-হাসির মধ্যে কখনো কোনো তারতম্য ধরা পড়ত না, একই হাসির সাহায্যে সে প্রভূত মনোভাব ব্যক্ত করত : কৃতজ্ঞতা, আনন্দ, লজ্জা, বিস্ময়, সম্মতি-অসম্মতি। দুর্লভ ঈষৎ হাসিটির ব্যাখ্যার ভার পড়ত দর্শকের ওপর। তবে তা ব্যাখ্যা করে দেখার আগ্রহ কেউ তেমন বোধ করত কিনা সন্দেহ। বস্তুত, মুহাম্মদ মুস্তফা এমনভাবে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে সক্ষম হয় যে চোখের সামনে সে বসে থাকলেও অনেক সময়ে কেউ সহসা বলে উঠত, কোথায় গেল মুহাম্মদ মুস্তফা?

কখনো-কখনো আমার মনে হত, এ-সবের মধ্যে কোথায় যেন একটি গূঢ় অর্থ। মুহাম্মদ মুস্তফা অনেক কথাই বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছে, যে-সব ছেলের পক্ষে অতিশয় দুর্বিষহ। তার বাপ খেদমতুল্লা দুর্বৃত্ত লোক ছিল; তার দুষ্কৃতির শাস্তিও অনিবার্য, সে-শাস্তি মানুষই দিক আর খোদাই দিক; এবং যারা তাকে শাস্তি দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পোষণ করাও অন্যায়, কারণ অভিযোগের অধিকার কারো যদি থেকে থাকে তা তাদেরই ছিল। তবু দুর্বৃত্ত বাপের প্রতিও ছেলের কি কোনো দায়িত্ব নেই? হয়তো সে-দায়িত্বের কথা বুঝিয়ে বলা শক্ত; পিতা-পুত্রের মধ্যে দায়িত্বের ব্যাপার তাদের রক্তসম্বন্ধের মতোই রহস্যময় যা সাধারণ বুদ্ধির বহির্গত। কেবল সে-দায়িত্ব সম্বন্ধে বিস্মৃত

BanglaBook.org

হওয়া কোনো ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। সে-দায়িত্বের কথা ভুলে ছেলে যদি তার জীবন গড়ার চেষ্টা করে এবং গড়ে তুলতে সক্ষমও হয়, তার জীবন কি চোরাবালির ওপরই গড়া হবে না, তার সঙ্গে কি একটি অবাস্তবতা একটি অসত্যতা চিরদিনই জড়িত থাকবে না? যে-দায়িত্ব প্রতি মুহূর্তে রক্তের স্রোতে অশান্তির ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করে, সর্বদা কী-একটা অস্বস্তিকর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তা অস্বীকার করা যায় না। হয়তো কী-করে এই কথা বুঝে সে স্থির করে, নিজের সততা সচ্চরিত্রতার সাহায্যে বাপের কলঙ্ক দুর্নাম মুছে ফেলবে, নিজের নিরীহতা সজ্জনতার দ্বারা তার দুর্বৃত্ত চরিত্রের স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করে দেবে : সন্তানের সুচরিত্র পিতার দুশ্চরিত্র সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলবে একদিন। হয়তো এই জন্যেই তার চরিত্রে এমন একটি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

তবে তেমন কথা ভাবতে ভালো লাগলেও জানতাম, আসলে জীবন সম্বন্ধে কী-একটা নিদারুণ ভীতিই তাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এমন মানুষ নিজের কণ্ঠস্বরেও আতঙ্কিত হয়। এরাই নিজেদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।

তবারক ভুইঞা বলছিল : যেদিন ঘাট থেকে ফ্ল্যাট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন রাতেই মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন একটি বিচিত্র কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। তখন হয়তো গভীর রাত, কী কারণে ঘুমটা হাল্কা হয়ে উঠেছিল। আওয়াজটি শুনতে পেলে সে সম্পূর্ণভাবে জেগে ওঠে। কিন্তু শীঘ্র আওয়াজটি সহসা থেমে যায়। তারপর সে-ও আবার নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

সকিনা খাতুন মেয়েদের মাইনর স্কুলে মাস্টারনীগিরি করে। পরদিন সকালে সে স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে এমন সময়ে আবার আওয়াজটি শুনতে পায় : কোথায় একটি নারী কাঁদছে। কে কাঁদে, কোথায়ই-বা কাঁদে? তবে স্কুলের তাড়াতাড়িতে সে-বিষয়ে তখন বিশেষ ভাবা হয়ে ওঠে নি, সারা দিন কথাটি মনেও পড়ে নি। সন্ধ্যার পর আবার আওয়াজটি শুনতে পায়। এবার বেশ স্পষ্টভাবেই শুনতে পায়। নিঃসন্দেহে কণ্ঠটি কোনো নারীর, আওয়াজটা যেন নদীর দিক থেকে আসছে।

তারপর থেকে সময়ে-অসময়ে সে কান্নাটি শুনতে পায়—যে কান্না কখনো আচমকা ঝড়ের মতো কখনো ধীরে-ধীরে বিলম্বিত বিলাপের মতো শুরু হয়। কী কারণে কান্নাটির কথা প্রথমে অন্যদের কাছ থেকে গোপন করে রাখে, যেন ব্যাপারটি বুঝতে পারে না বলে সে-বিষয়ে চুপ থাকা বুদ্ধিসঙ্গত মনে করে। কান্নাটি যেন কেমন। তাছাড়া যখন-তখন শুনতে পেলেও যখন তা শুনতে পায় না তখন ভাবে, সত্যিই সে কি কিছু শুনতে পায়? গোপন রেখে এ-ও তার মনে হয়, বালিকাবয়সে যেমন ছড়ার কথা গোপন করে রাখত তেমনি কিছু করছে। ছড়ার কথা কখনো কাউকে বলে নি। তার ঠোঁটের নিঃশব্দ সঞ্চালন লক্ষ্য করে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত সে কী বলছে, সে নির্বিকারভাবে উত্তর দিত, কিছু না। সে-সময়ে থেকে-থেকে নিঃশব্দে ঠোঁট সঞ্চালন করে সে একটি ছড়া আবৃত্তি করত। ছড়াটি এখনো তার মনে পড়ে : ক-এ কলাগাছ আর কচুরিপাতা কলমিশাক খাই, কঞ্চি আনো কলমকাঠি ক লিখিরে ভাই। ছড়াটি আবৃত্তি করার কোনো অর্থ ছিল না, কেবল তা এমনি একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল যে কখন শব্দগুলি অন্তরের কোন্ নিভৃত কক্ষ থেকে উঠে এসে তার ঠোঁটে নিঃশব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করত নিজেই বলতে পারত না। কোনো-কোনোদিন তার মায়ের মুখে-চোখে গভীর আশঙ্কা দেখা দিত। মা জিজ্ঞাসা করত, কী বিড়বিড় করছিস? মায়ের মুখে-চোখে আশঙ্কা অনুমান করে তার দৃষ্টি এড়িয়ে সে-দিন রাগতভাবে বলত, কোথায় বিড়বিড় করছি? মধ্যে-মধ্যে সহসা মুখে লজ্জার ঝাঁজও ধরত, মুদ্রাদোষটির সত্যি কোনো অর্থ নেই। তবু ছড়ার কথা কোনোদিন কাউকে বলে নি, জারুনার মা নামক মেয়েলোকটির নামও তোলে নি যদিও মেয়েলোকটির কথা ছড়ার মতোই সে-সময়ে অহরহ মনে জাগত, তার

BanglaBook.org

মুখটিও মানসচোখে ভেসে উঠত, বিশেষ করে তার ফোঁকলা দাঁত এবং আকর্ণ দিলখোলা হাসিটি। সেই সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা মেয়েলোকটির কাছেই ছড়াটা শিখেছিল। মেয়েলোকটি বলত, মনের কথা কখনো ফাঁস করতে নেই। সকিনা খাতুনও মনের কথা গোপন করত, করে একটি গভীর তৃপ্তি অনুভব করত এই ভেবে যে সে নিজস্ব একটি গোপন জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যে-জগতে কারো প্রবেশের অধিকার নেই। জারুনার মার কাছে একটি নয়, অনেক ছড়া শিখেছিল, যার একটি বলতে গেলে ছুঁচে বিঁধেই তার অন্তরে স্থান নিয়েছিল। সে-দিন জারুনার মা জাদুকরের হাত-সাফাইর ভঙ্গিতে ধাঁ করে তার দুটি কানের তুলতুলে নরম প্রান্ত ছেঁদা করে দিয়েছিল। ব্যাপারটা বোঝার পর পিঁড়িতে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে আস্তে হাত তুলে কান স্পর্শ করে দেখে সেখানে না ঝুমকো না কোনো দুল, কেবল দুটি ক্ষুদ্র কাঠির মতো কী যেন সদ্য-ফুটানো ছিদ্র দুটি দখল করে রয়েছে। পরে সেখানে ঘায়ের মতো হয়, একটু ব্যথা-ব্যথা করে, এবং কান ছেঁদার উপলক্ষে তার বাপ সরু আংটির মতো একজোড়া যে-সোনার অলঙ্কার তাকে এনে দিয়েছিল তা বেশ কিছুদিন পরতে পারে নি। কেন পরতে পারে নি সে-কথাও তার মাকে বলে নি।

কান ছেঁদা করবার সময়ে হয়তো তার মন ভুলাবার জন্যে জারুনার মা সুর করে নূতন একটা ছড়া কেটেছিল : পোড়া কপাল জোড়া লাগে না, কালো জামাই ভালো লাগে না। অনেক সন্তান-সন্ততির গর্ভধারিণী জারুনার মার স্বামীকে সকিনা খাতুন কখনো দেখে নি। সে ভাবে, স্বামীটি বিদ্‌ঘুটে কালো হবে। তার ভবিষ্যৎ স্বামীর কথাও একবার ভাবে এবং ক্ষুদ্র যে অলঙ্কারটি সে পেয়েছিল তারই রঙে কল্পনার স্বামীর রঙও সোনাবরণ রূপ ধারণ করে। তবে কল্পনার স্বামীর কথাও কাউকে বলে নি; তা গোপন রেখে সে পুলকিত বোধ করে। তারপর বকরিদের সময় দশম কি দ্বাদশ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে জারুনার মার মৃত্যু ঘটে। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে অব্যর্থভাবে কয়েকদিনের জন্যে সে অদৃশ্য হয়ে যেত। কোনোবার লিক্‌লিকে হাড়সম্বল নবজাত একটি শিশু কোলে নিয়ে, কোনোবার মৃতপ্রসূত শিশুকে কবর দিয়ে শূন্যকোলে প্রত্যাবর্তন করত, মুখটা কিছু ফ্যাকাসে, কিছু শীর্ণ, ঠোঁটটা নীরস, ফাটা-ফাটা। সেবার সে আর ফিরে আসে নি। আগে প্রসব ঘরের কথা ভাবলেই সকিনা খাতুন কেবল জারুনার মার হাসিমুখটি দেখতে পেত। যে-প্রসবঘরে আজরাইল দেখা দিয়েছিল তার জান নেবার জন্যে, সে-প্রসবঘরেও সুপরিচিত হাসিটি দেখতে পায়—আকর্ণ হাসি, যে-হাসির বেগে কখনো-কখনো বুক থেকে শাড়ির আঁচল সরে গেলে পালান-সদৃশ মস্ত দুটি স্তন প্রকাশ পেত; কবরে নয়, মাটির ওপরে সূর্যালোকের নিচে ঘাসফুলের মতো বিস্তৃত হয়ে সে-হাসি খেলা করছিল যেন। তারপর কখন তার হাঁটার ভঙ্গিতে ঈষৎ মাজা-ভাঙ্গা ভাব আত্মপ্রকাশ করে, হাড়গোড় না বাড়লেও দ্বিতীয়া চাঁদের মতো অতি সঙ্গোপনে যৌবনও এসে দেখা দেয়, অবশেষে একদিন দেখতে পায় নানাবিধ রোগব্যাধিতে তার মা বার বার শয্যাশায়িনী হতে শুরু করেছে বলে সংসারের কাজ-কর্মে গভীরভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছে সে : ঘাটে খেয়ানৌকা এসে ভিড়লে যাত্রী যেমন সহসা জীবন্ত হয়ে উঠে আপন পথে চলতে শুরু করে তেমনি সহসা এবং সহজেই সে সাংসারিক জীবনে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কেবল একটা কাঠের পুতুল বেশ কিছুদিন সঙ্গ ছাড়তে চায় নি। ততদিনে পুতুলটির রঙ উঠে এমন দশা যে চোখ-মুখ বলে আর কিছু নেই, বিবর্ণ দেহটি অক্ষতও নয়। একদিন সেটিও হারিয়ে যায় ছড়াগুলির মতো, তার মনের গোপন কুঠুরির মতো, এবং তার অভাব বোধ করে না বলে সেটির সন্ধানও করে না। সন্ধান করার সময়-বা কোথায়? দিনগুলি ঘূর্ণাবর্তের মতো হয়ে উঠেছে, যে-ঘূর্ণাবর্ত প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে-সাথে দেখা দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘিরে থাকে এবং যা ভেদ করে পশ্চাতে বা সম্মুখে তাকানো সম্ভব হলেও তাকাবার সাধ আর হয় না। হয়তো তাকালে কিছু দেখতেও পাবে না, যেমন কুয়াশার দিনে নদীর মধ্যখানে পৌঁছুলে পেছনের তীর সম্মুখের তীর উভয়ই আর চোখে পড়ে না। তখন থেকে মায়ের কাছে লুকাবার মতো তেমন কিছু দেখতে পায় নি। লুকাবার

BanglaBook.org

কিছু নেই, লুকাবার সময়ও নেই। তার কাজ কি কখনো শেষ হয়? সারা দিন স্কুলে পড়ানো, মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করা, ঘরদোর সাফ করা, সন্ধ্যার আগে বাপের জন্যে ভেতরের বারান্দার প্রান্তে বদনা ভরে অজুর পানি রাখা, সকলের অলক্ষে ঘরের কোণে আবছা অন্ধকারে নামাজটাও পড়ে নেওয়া, পরে উঠানের শেষে তিনদিক-খোলা গোয়ালঘরে মধুবিবি নামক গাইটিকে দানা-পানি দেওয়া, সময় করে ছোট ভাইবোনদের পড়াটা দেখিয়ে দেওয়া, সকলের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা, আরো পরে বাসন-পাতিল ঘষে-মেজে সাফ করা—অনেক তার কাজ যা সে নিত্য নিঃশব্দে একটির পর একটি করে যায়। অনেক রাত করে সে যখন শুতে যায় তখন বিছানায় আশ্রয় নেবা মাত্র ঘুমটা ঝট্ করে এসে যায়। প্রথমে সহসা সমস্ত দেহে যে-গভীর অবসাদ বোধ করে সে-অবসাদের সঙ্গে মিশে ভেতরটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে ওঠে, দৈনন্দিন সাংসারিক কথা বা স্কুলের চুটিচাটি কথা হাল্কা মেঘের মতো তার মনের সীমানায় কয়েক মুহূর্ত উড়ে বেড়ায় কোথাও ছায়া না ফেলে, তারপর সে-সব কথা কখন স্বপ্নের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়, আবার স্বপ্ন গভীর নিদ্রায় অন্তর্হিত হলে নিদ্রার নিরাকার বিস্মৃতির মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেবল কৃচিৎ কখনো ঘুম আসতে ঈষৎ দেরি হলে অদৃশ্য নিশাচর পাখির মতো রাতের অন্ধকার থেকে উড়ে এসে অন্যান্য কথা মনে নিঃশব্দে ডানা ঝাপটায় : জীবন-মৃত্যুর কথা, বেহেস্ত-দোজখের কথা, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের রহস্যের কথা, মানুষের কথা। সে-সব সে ভাবেই কেবল, কোনো উত্তর সন্ধান করে না : উন্মুক্ত মাঠের শেষে দিগন্তের দিকে গ্রাম্যবধ যেমন অস্ফুট কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে তেমনি তার মনও আস্তে-আস্তে চোখ মেলে সে-সব রহস্যময় কথাগুলির বিষয়ে ভাবে মনে একটু ভয় বা বিহ্বলতা বোধ না করে, যেন যে-দুর্বোধ্য দিগন্তের দিকে তাকায় সেখানে যদি ভয়ের বা বিহ্বলতার কিছু থেকে থাকে তা তাকে স্পর্শ করবে না : সে-সব বিষয়ে কোনো কারণে জরায়ুস্থিত জীবের মতোই সে নিরাপদ বোধ করে। সে কখনো কোনো অভাব বোধ করে না, কিছু কামনাও করে না। তার ঈষৎ কৌতূহলও যখন শেষ হয় তখন সে রাতের আওয়াজ শোনে : কোথাও ইঁদুরের সাবধানী সঞ্চারণ, রাতপাখির ডাক, কাঠের ক্ষীণ আকস্মিক আর্তনাদ। সে-সব আওয়াজ শুনতে-শুনতে কোনো-কোনোদিন তার মনে প্রশ্ন জাগে, মৃত্যুর পরে যে-জীবন সে-জীবনের না জানি কী রকম আওয়াজ। গভীর রাতে ঘুমন্ত মানুষেরা অতর্কিতভাবে আর্তনাদ করে ওঠে তীক্ষ্ণ, নিঃসঙ্গ কণ্ঠে, কী-একটা অজানা বিস্ময়ে। সে-জীবনের আওয়াজ কী সে-রকম? কখনো হাওয়া যেমন বেচইন হয়ে গোঙ্গাতে শুরু করে। তেমনই কি তার আওয়াজ? কখনো হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ বুকের পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, সর্বত্র তারপর ধক্‌ধক্ করে প্রচণ্ড আওয়াজে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। অজানা জগতের আওয়াজটি কি তেমনি কিছু? তবে সকিনার এ-কৌতূহলও স্থায়ী হয় না; এ-জীবনই তাকে তেমন কৌতূহলী করে না, সে-অজানা জীবন কেন তাকে কৌতূহলী করবে? তাছাড়া রাত শীঘ্র সুগভীর নদীর মতো অতল হয়ে ওঠে যাতে সে দ্রুতগতিতে নিমজ্জিত হতে থাকে, যাতে তার ক্ষীণখর্ব দেহটি সহসা ভারী হয়ে তলিয়ে যায়। এমনিভাবে সে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে, বুকের দিকে মাথা গুঁজে হাঁটু দুটি তুলে সে-বুকের দিকে টেনে একত্র করা দুটি হাত উরুর মধ্যে স্থাপন করে, মুখটা ঈষৎ খুলে। কোনো-কোনোদিন দেহটি অবশ হয়ে পড়ার আগে অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় কানে আঙ্গুল দিয়ে সে-আঙ্গুলটি বিষমভাবে কিছুক্ষণ নাড়ে; রাতের বায়ু কানের খলি কখনো-কখনো সুড়সুড় করে। হয়তো মনে যে-সব অবান্তর কথা জাগে, তাদেরই তাড়ায়।

অকস্মাৎ একদিন একটি বিচিত্র কান্নার আওয়াজ শোনার পরও সকিনা খাতুনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় না বা তার নিত্যনৈমিত্তিক কর্মজীবনে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না : পূর্বের মতো সে যথাবিধি স্কুলে পড়িয়ে যায়, বিবিধ সাংসারিক দায়িত্ব নিপুণহস্তে নির্বাহ করে চলে, যেন যে-কান্নার ধ্বনি থেকে-থেকে শুনতে পায় তা হাওয়ার গোঙ্গানি মাত্র; হাওয়ার গোঙ্গানি মানুষের জীবনধারায় টোল ফেলে না, তার পদক্ষেপ মুহূর্তের জন্যেও শ্লথ করে না।

BanglaBook.org

কখনো-কখনো নিজেই বুঝতে পারে, বিচিত্র দুর্বোধ্য কান্নাটির জন্যে সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু মানুষ তারই অজান্তে অলক্ষিতে কত সময়ে কত কিছুর জন্যে অপেক্ষা করে : মেঘসঞ্চারের জন্যে, গাছের চূড়ায় মর্মরধ্বনির জন্যে, যে-ফিরিওয়ালার কাছে কিছু কেনবার নেই সে-ফেরিওয়ালারও ডাকের জন্যে, অকস্মাৎ কোথাও একটি হাসি বা শুধুমাত্র একটি কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে। তারপর আপদ-বিপদের জন্যে অপেক্ষা করে : রোগব্যাধি দুঃখ-কষ্টের জন্যে, বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারীর জন্যে, সর্বস্বান্ত-করা অগ্নিকাণ্ডের জন্যে মৃত্যুর জন্যে কেয়ামতের জন্যে। দুনিয়া একটি সুনিয়ন্ত্রিত চক্রে আবর্তিত হয় জেনেও যে-সব ঘটনা ঘটা সম্ভব নয় সে-সব ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করে : বিনামেঘে বজ্রাঘাত, কবর থেকে মৃতদের পুনরুত্থান, পাখিতে মানুষের রূপান্তরপ্রাপ্তি, এমন দিন যেদিন সকালে সূর্য উঠবে না। সচেতন-অচেতনভাবে জেনে-না-জেনে সম্ভব-অসম্ভব কত কিছুর জন্যে মানুষ অপেক্ষা করে, সকিনা খাতুন কান্নাটির জন্যে অপেক্ষা করবে তা বিচিত্র কী। তবে শীঘ্র সে বুঝতে পারে কিছু ভয়-আশঙ্কার সঙ্গেই যেন অপেক্ষা করে, যে-কান্না সাধারণের গণ্ডিতে এবং সম্ভাব্যের বেড়িতে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেছে, সে-কান্না যেন আর সাধারণ ব্যাপার বলে মনে হয় না। কান্নাটি যে অন্য কেউ শুনতে পায় না, তা তার বুঝতে দেরি হয় নি। কিন্তু অন্য কেউ কেন শোনে না? কুমুরডাঙ্গা একটি ক্ষুদ্র শহর হলেও কত লোক সে-শহরে, তবু বিচিত্র দুর্বোধ্য কান্নাটি শোনার জন্যে একমাত্র সে-ই কেন নির্বাচিত হয়েছে, কেন সে-ই এই অদ্ভুত সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েছে? যে-অধিকার অনন্যসুলভ, যাতে একজন বিশেষ মানুষ ছাড়া আর কারো হিস্‌সা নেই, যা থেকে আর সবাই বঞ্চিত, সে-অধিকার কঠিন অধিকার। কিন্তু বিচিত্র কান্নাটির অর্থ কী, কোথায়-বা তার উৎস? এ প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। না-ভেবেই সে বুঝতে পারে, কোথাও সহসা কান্না শুনলে কে কাঁদছে কেন কাঁদছে এমন যে-সব প্রশ্ন মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে, সে-সব প্রশ্ন বিচিত্র কান্নাটির বিষয়ে আপন মনেও জিজ্ঞাসা করা সম্ভব নয়, যেন জিজ্ঞাসা করলে প্রশ্নটি এ-ঘর থেকে সে-ঘর, ঘর থেকে পথ, পথ থেকে মাঠ পর্যন্ত গিয়েই থেমে যাবে না, হয়তো নিক্ষিপ্ত হবে মহাশূন্যে যেখান থেকে কিছু ফিরে আসে না, ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও নয়। তাছাড়া সে-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করলে বা একটু ভাবলে সে হয়তো ভয়ানকভাবে বিস্মিত হয়ে পড়বে, যে-বিস্ময়ের ধাক্কায় সে তখন ধন্ধবৎ গুহাগহ্বরের মধ্যে দিয়ে এমন কোনো স্থানে উপস্থিত হবে যেখানে তার জরায়ুস্থিত নিরাপত্তার অবসান ঘটবে, যেখানে সুপরিচিত ছেঁড়া কাঁথার সোঁদালো গন্ধ বা মুখভাঙ্গা কলসিটা নেই, বাপের খড়ম-পরা পায়ের উচ্চ-কঠিন আওয়াজও শোনা যায় না। কান্নাটি সত্যি বিচিত্র। কেউ কোথায় অপরিচিত কণ্ঠে কাঁদছে শুনলে আপনা থেকেই মানুষের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু বিচিত্র কান্নাটি তেমন কোনো আর্দ্রতা সৃষ্টি করে না, যেন বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু গাছের শাখা-পল্লব অসিক্ত রয়ে গিয়েছে। সে-জন্যেই কি কান্নাটি শুনলেও ক-দিন ধরে ঠিক শোনে না, কেমন যেন কানেই ঠেকিয়ে রাখে, অন্তরে প্রবেশ করতে দেয় না?

তারপর একদিন তার মা জিজ্ঞাসা করে, "থেকে থেকে মনে হয় কেমন যেন কান পেতে থাকিস, যেন কি শুনছিস। কী শুনিস?"

মা সে-দিন ভালোই বোধ করেছিল। বারান্দায় বেরিয়ে একটি মাদুর পেতে বসেছিল। চমকিতভাবে সকিনা খাতুন একবার মায়ের দিকে দৃষ্টি দেয়, তারপর কোনো উত্তর না দিয়ে উঠানটি অতিক্রম করে যায়। কেবল উঠানের শেষপ্রান্তে পৌঁছাবার পর সহসা সে বুঝতে পারে বিচিত্র কান্নার কথা আর গোপন করে রাখার শক্তি তার নেই। মায়ের দিকে না তাকিয়ে সে বলে, রাতদিন কী যেন সে শুনতে পায়, কে যেন কোথাও সর্বক্ষণ কাঁদে।

তবে বছর দুই আগে একটি ঘটনা ঘটে। ছুটির দিন বলে মুহাম্মদ মুস্তফা দেশের বাড়িতে। একদিন অপরাহ্ণের দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে হাঁটতে শুরু করে, পরনে বোতাম-খোলা

BanglaBook.org

সাদা কোর্তা এবং হাল্কা রঙের লুঙ্গি। গ্রাম ছেড়েও সে হাঁটতে থাকে, উদ্দেশ্যহীনভাবে তবু দ্রুত পদে যেন সহসা হাঁটার নেশা ধরেছে তার। সে অকারণে বড় একটা হাঁটে না, তবু কালেভদ্রে একবার হাঁটতে শুরু করলে অনেকক্ষণ হাঁটতে পারে। দুই ক্রোশের মতো অতিক্রম করার পর একবার পূর্বদিকে তাকালে সে দেখতে পায় দিগন্তের কাছাকাছি মেঘ জমতে শুরু করেছে কিন্তু তবু তার পদক্ষেপ শ্লথ হয় না, যেন সে হাঁটতে শুরু করেছে বলে প্রয়োজন হলে মেঘই তার পথের সামনে থেকে সরে যাবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে এমন সময় তাল-সুপারি গাছপালা বেষ্টিত একটি গ্রাম সহসা তার পথ আগলে দাঁড়ায়। সামনে শুধু গ্রাম নয়, একটি খালও। সরু খাল, তবে পায়ে হেঁটে পার হবার মতো অগভীর নয়। এবার কী করবে তাই ভাবছে মুহাম্মদ মুস্তফা, এমন সময় সহসা ঝড় শুরু হয়। কিছুক্ষণ পরে খালের পানিতে স্থানে-স্থানে রোলার-চাপা মসৃণতা, আবার কোথাও ঢেউ জাগিয়ে প্রবল বেগে হাওয়া বইতে থাকে যেন পশ্চাদ্‌ধাবী দুরন্ত কালো মেঘের আলিঙ্গন থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে সে-হাওয়ার অধীরতার শেষ নেই। তবে দ্রুতগামী মেঘ শীঘ্র তাকে ধরে ফেলে, এবং তারপর হাওয়া আর মেঘে হাতাহাতি হয় বলে বিশৃঙ্খল ধরনের বৃষ্টি নাবে। অবশেষে তাদের মধ্যে সন্ধি হলে, অথবা মেঘের কাছে হাওয়া হার মানলে নির্বাধায় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়, হঠাৎ থেমে-যাওয়া হাওয়া আর বাধা সৃষ্টি করে না। সে-বৃষ্টির মধ্যে অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মুহাম্মদ মুস্তফা অবশেষে নদী পশ্চাতে রেখে সরু খালের পাড় দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে অনেকটা অন্ধের মতো, কারণ ততক্ষণে সূর্যাস্ত ঘটেছে, চারিদিকে বেশ অন্ধকারও হয়ে উঠেছে। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর সে হাতলিয়া নামক গ্রামে এসে পৌঁছায়। এবার সে-গ্রাম ছেড়ে কারো ক্ষেতের পাশ দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে চলতে থাকে। শীঘ্র সে গরুর গাড়ির পথের মতো একটা দো-নালা সড়কে এসে উপস্থিত হয়। অন্ধকার ততক্ষণে বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, বৃষ্টির ধারাও শ্লথ হয় নি, তবু সে বুঝতে পারে সে-সড়কটা অতিক্রম করে ডান দিকে হাঁটতে শুরু করলে চোখ বুজে কুমুরডাঙ্গায় ফিরতে পারবে। পথটি অতিক্রম করে একটা আইল ধরে আবার সে অগ্রসর হয়; পায়ের কাছে লুঙ্গিটা কাদায়-পানিতে সপ্-সপ্ করে, গায়ের লম্বা সাদা পাঞ্জাবিটা ভিজে একাকার।

আবার বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর সহসা সে দেখতে পায় অন্ধকারের মধ্যে সামনে বৃহৎ ঘন-কালো কিছু একটা দাঁড়িয়ে : কালোর ওপর কালোর প্রলেপ—এমন কালো যার চেয়ে আর কালো কল্পনা করা যায় না। তবে বস্তুটি তার চিনতে দেরি হয় না। সেটি মুক্তাগাছি গ্রামের প্রসিদ্ধ বটগাছ। চাঁদবরণঘাটে বাস করার সময় সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মধ্যে-মধ্যে দুই ক্রোশ পথ হেঁটে ঐ গাছটি দেখতে আসত। গাছটি যে প্রকাণ্ড শুধু তাই নয়, লোকদের ধারণা তার বয়স কয়েক শত বছরের কম নয় : কত রাজরাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে, কত নদী পুরাতন খাত ছেড়ে নূতন খাতে ধারা স্থানান্তরিত করেছে, কত ঝড়-ঝঞ্ঝা তুফান বয়ে গিয়েছে, সে-গাছটির কিছু হয় নি, সময়কাল উপক্ষো করে দাঁড়িয়ে থেকেছে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে। গাছটির প্রাচীনতাই ছেলেদের আকর্ষণের কারণ ছিল। স্কুলে পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তকে পড়েছিল, গাছপালা-উদ্ভিদ জড়পদার্থ নয়, তাদের প্রাণ আছে, তারা জীবজন্তুর মতো ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ করে, নিবৃত্ত করে, নিদ্রা যায়, নিঃশ্বাস নেয়। মুহাম্মদ মুস্তফা এবং অন্যান্য ছেলেদের মনে হত, গাছপালার চোখ-কানও থেকে থাকবে, এবং ঘনপল্লবের আব্রুর ভেতর থেকে তারা নীরবে সব কিছু দেখে, শোনে। যে গাছ শত শত বছর ধরে জীবিত সে-গাছ যুগে-যুগে কত কিছু না দেখেছে শুনেছে। বৃহৎ বটগাছটির স্নিগ্ধশীতল গভীর ছায়ার নিচে এসে দাঁড়ালে তাদের মন নিমেষে সুদূর অতীতে চলে যেত, ঘনপাতার অস্ফুট মর্মরধ্বনির মধ্যে শুনতে পেত সে-সব মানুষের হাসি-কান্না যারা কবে কোন কুজ্ঝটিকাময় রঙ আকারহীন দিনে জীবনের খেলা সাঙ্গ করে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তারপর গাছটি দেখার সুযোগ হয় নি,

BanglaBook.org

কারণ বাপ খেদমতুল্লার মৃত্যুর পর চাঁদবরণঘাট ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে এ-পথে আর আসে নি। তবু অনেকদিন সেটি তার মনে কেমন ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল।

বৃষ্টি তখনো থামে নি, তবে ধারাটি মিহিন হয়ে উঠেছে। হয়তো বটগাছটি তাকে তার বাল্যজীবনের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয় বলে অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো গাছটির দিকে এগিয়ে যায়, তারপর তার তলায় পৌঁছে অল্প সময়ের জন্যে সেখানে দাঁড়াবার লোভ সম্বরণ করতে পারে না বলে একটু ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়ে, এ-সময় ভিজে কাপড়চোপড় সহসা ক্ষিপ্রগতিতে যতখানি সম্ভব নিঙড়েও নেয়।

কয়েক মুহূর্ত এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সহসা একটি কথা তার মনে পড়ে, যে-কথা তাকে প্রচণ্ড আঘাতই দেয়। তবে সে কি কালু মিঞার বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয় নি? বটগাছটি, তারপর পাঁচ-কোণা পানিতে টুইটুম্বর পুকুরটি, ওপাশে যে-বাহিরঘর এবং তার পশ্চাতে যে-আটচালা অন্দরঘর এবার অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়, সে-সব কি কালু মিঞার সম্পত্তি নয় যে-কালু মিঞার নাম বাপ খেদমতুল্লার মৃত্যুর পর প্রায়ই শুনতে পেত? লোকেরা, বিশেষ করে বাড়ির লোকেরা বলত কালু মিঞাই বাপ খেদমতুল্লাকে খুন করেছিল এই কারণে যে লোকটি কলাকৌশলে অসদুপায়ে অন্যায়ভাবে যে-সব জায়দাদ-জোতজমি আত্মসাৎ করেছিল সে-সব জায়দাদ-জোতজমি থেকে তাকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হয়েছিল বাপ খেদমতুল্লা।

মুহাম্মদ মুস্তফা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে, তার মনে হয় কিছুই যেন বুঝতে পারেছ না। তবে সে কি তারই অজান্তে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল? সে যে ভেবেছিল ঠিক পথেই হাঁটছে, এমন-কি এক-সময়ে হাতলিয়া গ্রামটিও চিনতে পেরেছে—সবই কি ভুল? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে সে। না, নিঃসন্দেহে সে ঘোর ঝড়-বৃষ্টিতে এবং দ্রুতাগত রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ কালু মিঞার বাড়িঘর পুকুর সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও সমগ্র অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ বটগাছটি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দ্বিধা অনিশ্চিয়তার অবকাশ নেই।

আরো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু প্রকৃতিস্থ হয়, এবং তখন একথাও বুঝতে পারে যে সে স্থানে এমনভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন হবে না। চতুর্দিকে নীরবতা, বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। এবার ভেজা মাটির ভেজা ঘাস লতাপাতার সোঁদালো গন্ধ তার নাকে এসে লাগে। সে সহসা সজোরে একবার নিঃশ্বাস নেয়।

বটগাছের আশ্রয় ত্যাগ করবে এমন সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফা হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পায়। কখন তারই অজান্তে সে পুকুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, যেন ওপাশে বাড়িঘরের দিকে তাকাবার সাহস নেই। এবার সভয়ে ওপাশে তাকালে প্রথমে অন্ধকারের মধ্যে শূন্য মাঠে আলেয়ার মতো কিছু দেখতে পায়, তারপর মানুষের মূর্তির মতো অস্পষ্ট কী-একটা ছায়াও নজরে পড়ে। ততক্ষণে আকাশটা কিছু পরিষ্কার হয়ে উঠে থাকবে, কারণ আকাশের মধ্যখানে কতকগুলি ঝক্‌মকে তারা দেখা দিয়েছে যেন। তবে নীরবতা মাত্রাতিরিক্তভাবে গভীর হয়ে উছেছে। মুহাম্মদ মুস্তফা সে-নীরবতার মধ্যে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শূন্য মাঠে আলেয়ার দিকে, মানুষের মূর্তির মতো ছায়াটির দিকে। হয়তো বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটে; আলেয়াটি এবং ছায়াটি নিশ্চল। তারপর এক সময়ে সে বুঝতে পারে সামনে কোনো শূন্য মাঠ নেই। এবার কালু মিঞার বাহিরঘর, পশ্চাতে মস্ত আটচালা বাড়ি—সে-সব সহসা অতি নিকটেই মনে হয়। আলেয়াটি আলেয়াও নয়, কুপি মাত্র, এবং কুপিটি ধরে একটি লোক দাঁড়িয়ে ।

শীঘ্র কুপির আলো নড়ে ওঠে, মানুষটিও আর নিশ্চল থাকে না। সে যেন বটগাছের দিকেই আসছে। লোকটি আরেকটু এগিয়ে এলে বাহিরঘরের আলোয় প্রথমে তার দেহের মধ্যদেশ, তারপর সমস্ত দেহ নির্দিষ্ট আকৃতি ধারণ করে। সে কি বাহিরঘরের খোলা দরজার

BanglaBook.org

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে? নিঃসন্দেহে বাহিরঘরটি নির্জন হয়।

লোকটি কিন্তু সে-ঘরে ঢোকে না, ঘরের ভেতরে কোনো লোক থাকলে তার সঙ্গেও কথা বলে না; গভীর নীরবতা অক্ষুণ্ন থাকে। তবে এবার মুহাম্মদ মুস্তফা চমকে ওঠে, কারণ সে বুঝতে পারে বাহিরঘরের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটি তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাহলে লোকটি তাকে দেখতে পেয়েছে। চাঁদশূন্য রাত হলেও তাকে দেখতে পাওয়া শক্ত নয়। দূরত্বটা মন্দ নয়, কিন্তু ভিজে একাকার হলেও মুহাম্মদ মুস্তফার পরনে সাদা কোর্তা, লুঙ্গিটাও হাল্কা রঙের। বটগাছের তলে তাকে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটি বিস্মিত হয়ে থাকবে। ঝড়-বাদলে পথিকের পক্ষে গাছের তলায় আশ্রয় নেয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এখন ঝড় নেই, বৃষ্টিও থেমে গিয়েছে। তাকে চোর-ডাকাত বলে কেউ ভুল করবে তাও সম্ভব নয়; এমন সাদা ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরে চোর-ডাকাত চুরিচামারি বা ডাকাতি করতে বের হয় না। হয়তো সে-জন্যে লোকটি কেবল বিস্মিতই হয়েছে, ভয় পায় নি।

লোকটি আবার হাঁটতে শুরু করে, ধীরে-ধীরে, সন্তর্পণে, তবু নিশ্চিত পদে। সে কি এবার তার দিকেই আসছে? তাই মনে হয়। সে ধরা পড়ে গিয়েছে, পালাতে চাইলেও পালানো সম্ভব নয়, পা-দুটিও যেন গাছের গুঁড়ির মতো অনড় হয়ে পড়েছে। এবার মুহাম্মদ মুস্তফার মনে নিদারুণ ভয় জেগে উঠে তাকে প্রায় অসাড় করে ফেলে, হৃৎপিণ্ড প্রচণ্ড আওয়াজে ধক্‌ধক্ করে বুকের মধ্যে বাড়ি খেতে থাকে, গলার ভেতরটা রোদে ঝল্‌সানো জ্যৈষ্ঠ-মাসের জমির মতো শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে। নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করে, এবং সচল মূর্তিটির দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বলে মূর্তিটি তার চোখের সঙ্গে যেন খেলা করে; কখনো তা দেখতে পায় কখনো পায় না। তারপর একবার মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে অদৃশ্য থাকে, এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মুহাম্মদ মুস্তফার ভীতবিহ্বল মস্তিষ্ক অবশেষে বুঝতে পারে কুপিটাও অন্ধকারের মধ্যে সহসা মিশে গিয়েছে। তবে লোকটি বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছে কি?

মুহাম্মদ মুস্তফার সমগ্র দেহ টানা-ধনুকের মতো শক্ত-কঠিন হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ এবার শিথিল হয়ে পড়ে, সঙ্গে-সঙ্গে পা-দুটিতে অপরিসীম দুর্বলতা দেখা দেয়। তবে সে মনে-মনে বলে, আর বিলম্ব নয়, এবার পথ ধরা উচিত। সে বিলম্বও করে না। কেবল পা বাড়িয়েছে কি অমনি আবার একটি আওয়াজ শুনতে পেলে দ্বিতীয়বার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে দেখতে পায় কালু মিঞার বাহিরঘরের পাশে কুপি নিয়ে নয়, লণ্ঠন নিয়ে কে দাঁড়িয়ে, পাশে আরেকটি লোক। হয়তো দ্বিতীয় লোকটি আগের লোকই, কেবল তার হাতে এখন কুপিটি নেই। লোক দুটি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, নিঃসন্দেহে তাদের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত এমনি কাটে, যেন কিছু ঘটবে না। তবে মুহাম্মদ মুস্তফা এবার অপেক্ষাকৃতভাবে শান্ত বোধ করে; তার মনের ভয় যেন কিছু কমেছে, যেন অদূরে লোক দুটি বা তাঁদের পেছনে গভীর অন্ধকারে-ঢাকা কালু মিঞার বাড়িঘর তাকে আর ভীত করে না।

তারপর একটি বিকট কণ্ঠ রাত্রির নীরবতাকে খণ্ডবিখণ্ড করে।

"বটতলায় কে?"

হয়তো লণ্ঠন-হাতে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটি কথাটি জিজ্ঞাসা করে। সে কালু মিঞার বাড়ির মিঞামানুষ হবে। অন্য লোকটি হয়তো নাখাল মানুষ। প্রশ্নকারীর বিকট কণ্ঠের অন্তরালে কেমন ভয়ের আভাস। হয়তো ভূতে তার গভীর বিশ্বাস, এবং তাই সে নিশ্চিত হতে পারে না বটগাছের তলে মূর্তিটি রক্তমাংসের মানুষ না ভূতপ্রেত কিছু। হয়তো তার এই ভয় হয়, মূর্তিটি সহসা উত্তর দেবে সে অমুক মানুষের আত্মা তমুক গাছে বাস করে, যে-উত্তর নিঃসন্দেহে সচক্ষে ভূত দেখার চেয়েও অধিকতর ভীতিজনক শোনাবে।

মুহাম্মদ মুস্তফা বুঝতে পারে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু উত্তর দেওয়া কি সহজ? কী বলবে সে? আত্মপরিচয় দেওয়া যে এত শক্ত তা পূর্বে কখনো জানত না।

BanglaBook.org

অবশেষে সে উত্তর দেয়। গলার স্বর যেন বুকের গহ্বরে কোথাও আশ্রয় নিয়েছিল, সেখান থেকে কণ্ঠনালী দিয়ে বেরিয়ে আসতে কিছু সময় নেয়।

"আমি মুহাম্মদ মুস্তফা।"

একটু নীরবতা। লণ্ঠন হাতে লোকটি নিশ্চল। লণ্ঠনের আলোয় তার চৌকা নক্‌শার লাল লুঙ্গিটি স্পষ্টভাবে নজরে পড়ে।

"কে মুহাম্মদ মুস্তফা?"

লোকটি পূর্ববৎ বিকট কণ্ঠেই আবার জিজ্ঞাসা করে, তবে এখন তার কণ্ঠে ভয় নয়, কী একটা ভাব। হয়তো ইতিমধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফা কে তা সে বুঝে নিয়েছে, কেবল কথাটি তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

মুহাম্মদ মুস্তফা কী উত্তর দেবে? কে সে? বাপ খেদমুতুল্লার পরিচয় ছাড়া তার কি স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় আছে?

"আমি খেদমতুল্লার ছেলে মুহাম্মদ মুস্তফা।"

আবার গভীর নীরবতা নাবে—এমন নীরবতা যে তাতে কণ্ঠস্বর সহসা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সে কি সত্যিই কোনো উত্তর দিয়েছিল? সে নিশ্চিত হতে পারে না। সে অপেক্ষা করে। নিকটে কোথাও একদল কোলাব্যাঙ উচ্চস্বরে ডাকতে শুরু করে। পুকুরের পাড়ে কোথাও তারা মজলিশ বসিয়েছে। আকাশের মধ্যস্থলে অনেকখানি মেঘমুক্ত হয়ে পড়েছে বলে সেখানে অজস্র তারা দেখা দিয়েছে; তারাগুলি বৃষ্টিধৌত আকাশে নির্মল উজ্জ্বলতায় ঝলমল করে।

মুহাম্মদ মুস্তফা অবশেষে বুঝতে পারে, উত্তরটি সত্যিই দিয়েছিল, এবং বেশ উচ্চকণ্ঠেই; লণ্ঠন-হাতে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটির গভীর নীরবতা তার প্রমাণ। বটগাছের তলা থেকে বেরিয়ে সে যখন কালু মিঞার বাড়িঘর পশ্চাতে রেখে পুকুরের পাড় দিয়ে উল্টো পথ ধরে, তখনো লোকটি কিছু বলে না। মুহাম্মদ মুস্তফা ধীরস্থিরভাবে হাঁটে, পায়ের ভেজা জুতায় ভস্‌ভস্‌ আওয়াজ হয়।

তবারক ভুইঞা মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুনের কথা বলছিল।

মেয়েটি যখন স্কুলে যায় বা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে তখন দু-পাশের বাড়িঘর, দোকানপাট থেকে অনেক লোক তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে; সেটি তাদের একটি নিত্যকার অভ্যাস। তবে সে-দিন যেভাবে তার দিকে তাকায় সেভাবে কখনো তাকায় নি।

প্রতিদিন বেলা সাড়ে ন'টার দিকে নদীর ধারের বাড়ি থেকে সকিনা খাতুন বেরিয়ে আসে। মাথায় কালো ছাতা, পিঠের কাছাকাছি বেণীর শেষাংশে জীর্ণ কালো ফিতার প্রজাপতি-বন্ধন, পরনে সাদা শাড়ি যে-শাড়ির পাড় কোনোদিন লাল কোনোদিন পিঙ্গল হলেও কখনো নূতনত্বের ধবধবে চেহারা গ্রহণ করে না; পায়ে স্যাণ্ডেল যা শুষ্কদিনে ধুলাচ্ছন্ন এবং বৃষ্টির দিনে শীঘ্র কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। তার হাঁটার ধরনটি ধীর-মন্থর, কেমন একটু মাজা-ভাঙাও। খোঁড়া ন্যাংড়া নয়, হাঁটার একটা ঢঙ কেবল। হয়তো শরীরের গঠনের দোষ, বা লোকসমক্ষে দেহে-মনে গভীর লজ্জা দেখা দেয় বলে তারই অজান্তে হাঁটার ঢঙটা ঐ রকম হয়ে পড়ে। তবে নিত্য যারা তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে তারাও ঠিক বলতে পারবে না মেয়েটির চেহারা কী রকম, সে খাটো, লম্বা, কি মাঝারি ধরনের। কেবল দূর থেকে যাকে দেখতে পাওয়া যায়, তার মুখের ধরন বা উচ্চতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা কি কখনো সম্ভব? এমন মানুষ যার হাল্কা-পাতলা অস্থিতে মাস-মাংস বলে কিছু নেই, তাকে দূর থেকে রোগা মনে না-ও হতে পারে, অন্য কেউ রোগা না-হলেও কোথায় সে যেন তার স্থূলতা লুকিয়ে রাখে, দূরত্বে তা ধরা পড়ে না। আবার দূর থেকে যাকে বেশ লম্বা দেখায় সে হয়তো লম্বা নয়, যাকে খাটো মনে হয় সে পাশাপাশি এসে দাঁড়ালে বোঝা যায় তার উচ্চতার বিষয়ে ধারণাটি চোখের ভুল মাত্র। দূর থেকে মানুষের মুখ সম্বন্ধেও কখনো-কখনো তেমনি ভ্রম হতে পারে। কোনো মুখ দূরত্বের

BanglaBook.org

অস্পষ্টতায় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, আবার কোনো মুখ যৌবন-লাবণ্য বা সতেজ স্বাস্থ্যের জন্যে নিকটে সুশ্রী মনে হলেও দূরে গিয়ে রেখাসর্বস্ব হয়ে পড়লে সে-মুখের গরঠিক, অসুন্দর রেখাই ধরা পড়ে কেবল। তবে সকিনা খাতুনের মুখ কদাচিৎ দেখা যায়, কারণ সে-মুখ বরাবর একটি বড় ধরনের ছাতার তলে অদৃশ্য হয়ে থাকে। ছাতাটি তার জন্যে পর্দার মতো, তাই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ নিবর্ষণে গুমোট মেরে থাকলেও বা শীতের দিনে রোদটা মিঠেমিঠে হয়ে উঠলেও মাথা থেকে ছাতাটি কখনো সে নাবায় না। কোনোদিকে সে তাকায়ও না। হয়তো একরকমের চক্ষুহীন মাছের মতো ছায়া দেখে সামনের বাধা-প্রতিবন্ধক এড়িয়ে চলে। অথবা তার ধারণা হয়তো এই যে, তাকে দেখতে পাওয়া, তারপর তার জন্যে পথ করে সরে যাওয়া—এসব দায়িত্ব অন্যদের, তার নয়। গলি থেকে বেরিয়ে নদীর ধারের পথটি ধরে সকিনা খাতুন তার স্বাভাবিক ঈষৎ মাজা-ভাঙ্গা ধীর-মন্থর গতিতে হাঁটতে শুরু করলে ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের বৃদ্ধ পিতা তাকে সর্বপ্রথম দেখতে পায়। বৃদ্ধ মানুষটি তখন সকালের দীর্ঘ এবাদতের পর কাষ্ঠবৎ নিশ্চলতার মধ্যে কাকনিদ্রা সম্পন্ন করে শিক্-দেয়া জানালার ভেতর দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে বসেছে : আধাপাকা ঝুলে-পড়া ভ্রূর নিচে তার জ্যোতিহীন চোখ ছায়াচ্ছন্ন, ভাবশূন্য। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েটি যখন তার দৃষ্টিপথে দেখা দেয় তখন সে কেবল একটি নিরাকার শুভ্র ছায়াই দেখতে পায়, যে-ছায়া নিতান্ত নিস্পৃহভাবে সে অনুসরণ করে এবং তা অদৃশ্য হয়ে গেলে এবার বেদনাদায়ক অনিপুণতার সঙ্গে দেহবস্ত্রের অভ্যন্তর থেকে কম্পিতহস্তে একটি জেব-ঘড়ি বের করে সময়টা যাচাই করে নেয়; সে বুঝতে পারে ঘরে-তৈরি দুটি সন্দেশের সঙ্গে একটি দাওয়াই খাবার সময় হয়েছে। তার জীবনটা নিয়মানুবর্তিতার দাস, ছেলে ডাক্তার বলে যার কড়াকড়িটা বেশ মাত্রাতিরিক্ত; বৃদ্ধ বাপের দীর্ঘ জীবনটা দীর্ঘতর করার জন্যে ডাক্তার-ছেলের চেষ্টার অন্ত নেই। এবং সকিনা খাতুন তাকে দাওয়াইর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ডাক্তার-ছেলের পরিকল্পনায় সাহায্য করে যেন।

সেদিন বৃদ্ধের চোখে মেয়েটি সহসা একটি স্পষ্ট আকার ধারণ করে, সে দেখা দিলে বৃদ্ধের চোখে অতিশয় বিরল একটি সচেতন-ভাবও জাগে, তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেলে জেব-ঘড়িটা বের করতেও তার দেরি হয়।

ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের বৃদ্ধ-পিতার চোখের বাইরে যাবার আগেই সকিনা খাতুন আরেকটি মানুষের দৃষ্টিপথে ধরা দেয় : সে-মানুষ ডাক্তার-প্রতিবেশী উকিল আফতাব খানের বাড়িতে আশ্রিত খয়রাত মৌলভি। নিত্য এ-সময়ে ঘরের বারান্দায় বসে বাড়ির দুটি ছোট মেয়েকে সে কোরানপাঠ শেখায়, এবং সকিনা খাতুনকে যখন নিষ্পলক দৃষ্টিতে অনুসরণ করে তখন তার চোখে এমন একটি ভাব দেখা দেয় যেন এতদিন দেখেও মেয়েটির বেপর্দা-বিচরণ অনুমোদন করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু হয়তো সে বিস্মিতই হয়। বিস্মিত হয় এই কারণে যে তার মনে যুবতী-নারীর বেপর্দা বিচরণের বিরুদ্ধে যে-নিষেধাজ্ঞার কঠিন প্রাচীর তার পটভূমিতে মেয়েটিকে এত নিরীহ এত অনলোভনীয় মনে হয় যে সে-নিষেধাজ্ঞার প্রাচীরই সশব্দে ভেঙ্গে পড়ে। নিঃসন্দেহে সে-আওয়াজ তাকে চমকিত করে। তবে সেদিন মনে হয় খয়রাত মৌলভি অবশেষে সরল উন্মুক্ত দৃষ্টিতে মেয়েটির প্রতি তাকাতে সক্ষম হয়েছে। তার মুখটা খুলে থাকলেও তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ থেমে যায়; সে নিষ্পলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে।

উকিলের বাড়ির পাশে গাছপালা-ঢাকা পড়োজমি। তার পশ্চাতে কাছারির নাজির রহমত মিঞার কাঁচা বাড়িটি পথ থেকে কেবল আলিঝালি নজরে পড়ে। নাজিরের অল্পবয়স্কা পুত্রবধূ তাহেরা বানু স্নেহশীলা শ্বাশুড়ির হাতে সাংসারিক কাজকর্ম ছেড়ে যখন-তখন বাড়ির খিড়কিপথে—বাড়িটির মুখ নদীর দিকে নয়—এসে দাঁড়ায় গাছপালার মধ্যে দিয়ে পথে লোকচলাচল, অদূরে নদী বা খোলা আকাশে রঙের খেলা দেখবার জন্যে। তাহেরা স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত, কারণ তার স্বামী শিক্ষার্থে অন্যত্র বাস করে এবং কেবল ছুটিছাটাতে বাড়ি

BanglaBook.org

আসে। তাহেরা বানুও মোক্তারের শিক্ষয়িত্রী মেয়েটিকে নিত্য চেয়ে-চেয়ে দেখে, স্বাধীনভাবে যে-মেয়ে চলাফেরা করে তার প্রতি একটি ঈর্ষাজনিত কৌতূহল বোধ করে সে। তবে সেদিন সহসা সে-কৌতূহলের রূপটা যেন ঘোরতরভাবে বদলে যায়; দূর থেকে দেখা মেয়েটির অস্পষ্ট ক্ষীণতনুটি অকস্মাৎ যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে—যে-রহস্য যুগপৎ আকর্ষণ করে এবং মনে কেমন একটা ভয়ও জাগায়। বস্তুত পথের মেয়েটিকে দেখলে দুর্বোধ্য কারণে তাহেরা বানুর বুকটা দুরদুর করে কেঁপে ওঠে।

মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে তারপর ছেলেদের হাই ইস্কুলের সামনে উপস্থিত হয়। লম্বা ধরনের মাঠের শেষে লম্বা ধরনেরই টিনবাঁশের স্কুল-বাড়ি যেখানে সে-সময়ে ছাত্রদের না হলেও দু-একজন শিক্ষকের বিশেষ করে তরুণ শিক্ষক সুলতানের আগমন হয়ে থাকে; নিকটে কোথাও একটি গৃহস্থ পরিবারের বাহিরঘরে সুলতানের আস্তানা। সে-জন্যে শুধু নয়, অন্য এক কারণে সে সকালে-সকালে এসে স্কুলে উপস্থিত হয়। কারণটি সকিনা খাতুন। মেয়েটির প্রতি তার আকর্ষণটি হয়তো স্বাভাবিক নয়, কারণ মেয়েটি তার মনে কোনো মোহ বা ভাবাবেগ সৃষ্টি করে না। বস্তুত তরুণ বয়সেও নারীর প্রতি তার কোনো মোহ নেই এবং অত্যাশ্চর্য স্বচ্ছতার সঙ্গেই সে তাদের পানে তাকাতে পারে, ভালো-মন্দ যা দেখবার তাও প্রথমদৃষ্টিতে নির্ভুলভাবে দেখে নেয়। সে জানে সকিনা খাতুনের চেহারায় বা দৈহিক গঠনে দেখবার তেমন কিছু নেই, বস্তুত কল্পনার আদর্শ রূপবতী নারীর তুলনায় তার দোষঘাট অজস্র। তবে তাতে দুঃখের কিছু সে দেখতে পায় না; কখনো এ-কথা তার মনে জাগে নি যে মেয়েটিকে সে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে একদিন ঘরে নিয়ে আসবে। যে-কারণে নিত্য তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে সেটা তাই ঠিক আকর্ষণ নয়, বরঞ্চ বলা যেতে পারে এক রকমের গবেষণা; সকিনা খাতুন তার গবেষণার পাত্রী। তার বিশ্বাস একদিন মেয়েটির মধ্যে সহসা এমন কিছু সে দেখতে পাবে যার সাহায্যে তার প্রশ্নের উত্তর পাবে। প্রশ্নটি এই : যে-মেয়ে নিত্য একাকী পথে বের হয় সে-মেয়ে এখনো অক্ষতদেহ কুমারী কিনা। কৌতূহলটা যে নিতান্ত অশ্লীল তা নিজেই বোঝে এবং সে-জন্যেই গবেষণাটি একরকমের ভয়ানক নেশার মতো তাকে পেয়ে বসেছে।

তবে সেদিন গবেষণাটি সহসা অন্য, এবং নিতান্ত শ্লীল রূপ ধারণ করে। পূর্বের মতোই মেয়েটির আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে দেখে তবে তার মধ্যে অন্য এক প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করে, এবং কোনো উত্তর খুঁজে না পেলেও শীঘ্র একটু আশ্বস্ত হয়; মেয়েটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে পায় না।

শীঘ্র সকিনা খাতুন দুই রাস্তার সংযোগস্থলে এসে উপস্থিত হয়। সোজা পথটি যায় কাছারি-আদালতের দিকে। যেটি মোড় নেয় ডান দিকে নদীকে পশ্চাতে রেখে সেটি শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সকিনা খাতুন দ্বিতীয় পথটি ধরে। সামনে দোকানপাট; পথটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহরের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যায়। প্রথমে পড়ে সারিবাঁধা চার-পাঁচটি হোটেল যে-সব হোটেলে ব্যবসা-মামলা-মকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে কুমুরডাঙ্গায় এসে গ্রামবাসীরা দু-এক রাতের জন্যে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে। এত বেলাতেও সে-সব হোটেলে কেউ-না-কেউ অলসভঙ্গিতে এবং নির্বিকারচিত্তে ঘড়াগড়ি দেয়। অপরিচিত অজানা লোকেদের সান্নিধ্য যতটা সম্ভব এড়াবার জন্যে সকিনা খাতুন হোটেলগুলির সামনে পৌঁছাবার আগে রাস্তাটা অতিক্রম করে ওপাশে চলে যায়। এ-সময়ে অজ্ঞাতসারেই বুকের কাপড়টা আরো টেনে নেয়, পদক্ষেপটা একটু দ্রুত করে তোলে; দোকানপাটের লোকদের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তারা একই শহরের বাসিন্দা বলে তাদের তেমন লজ্জা হয় না, কিন্তু হোটেলের মক্কেলদের সামনে বড় লজ্জা হয়। তাছাড়া একদিন একটি হোটেলে একজোড়া চোখ দেখতে পেয়েছিল : পাথরের মতো নিশ্চল নিথর চোখ। সে-চোখে সে কী দেখেছিল জানে না, কিন্তু তখন থেকে হোটেলগুলির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে তার পিঠটা যেন শিরশির করে ওঠে।

BanglaBook.org

হোটেলগুলির পরে আসে মুদিখানা, যেখান থেকে চাল-ডাল রশুন-পেঁয়াজের ঝাঁজালো-মধুর গন্ধ ভেসে আসে। সে-দোকান থেকে পাল্লায় চাল-ডাল ওজন করতে-করতে দোকানের মালিক ফনু মিঞা তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তবে বেশিক্ষণের জন্যে নয়, কয়েক মুহূর্ত শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়েই আপন কাজে মনোনিবেশ করে। তবু সে-সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কালো ছাতার নিচে চিবুক হতে শুরু করে পা পর্যন্ত মেয়েটির সর্বাঙ্গ দেখে নেয়। মেয়েটিকে নিত্য তাকিয়ে দেখা যাদের অভ্যাস তাদের মধ্যে মুদিখানার মালিকই তার ঈষৎ মাজা-ভাঙ্গা ধরনের হাঁটার কারণ সন্ধান করে। চাল-ডালের ব্যবসা করে বলে সকলের বাড়ির হাঁড়ির খবর সে রাখে। সে জানে, দেশের বাড়ির আত্মীয়-স্বজনের দাবি-দাওয়ায় সদা উত্ত্যক্ত অনেক সন্তান-সন্ততির বাপ মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের আর্থিক অবস্থা আদৌ সচ্ছল নয়। মেয়েটা তাই মাইনর স্কুলে ছাত্রী পড়িয়ে সামান্য পয়সা কামিয়ে সংসারের অনটন কিছু লাঘব করার চেষ্টা করে, নিজে প্রায় অনাহারে থেকে বিশ্রাম না নিয়ে। মুদির বিশ্বাস, মেয়েটির মাজা-ভাঙ্গা ধরনের হাঁটার কারণ তার শারীরিক দুর্বলতা। তবে আজ সে সকিনা খাতুনকে দেখতে পেলে সে তার স্বাস্থ্যের কথা ভাবে না, অন্যদিনের মতো তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সরিয়েও নেয় না, বরঞ্চ তার দিকে তাকিয়ে প্রস্তরবৎ নিশ্চল হয়ে থাকে।

মুদিখানার কিছু দূরে পথের ডান ধারে সে-পথের একমাত্র ঔষধালয় দেখা যায়। নানা রঙের রহস্যময় পানিতে ভরা বড়-বড় কতগুলি কাচের পাত্র, দাওয়াইর শিশি-প্যাকেট ইত্যাদিতে সজ্জিত পুরানো কয়েকটা আলমারি, দেয়ালে বিভিন্ন ওষুধের বিজ্ঞাপন—একটি বিবর্ণ ঈষৎ ছেঁড়া বিজ্ঞাপনে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বিদেশিনী নারী দাঁত বের করে হাসছে আজ ক-বছর ধরে তার ইয়ত্তা নেই—এবং সে-সবের মধ্যে বসে যুগপৎ কম্পাউণ্ডার-ওষুধবিক্রেতা রুকুনুদ্দিন শেখ সকিনার দিকে যখন তাকায় তখন কখনো-কখনো তার কথা নয় তার মায়ের কথা সে ভাবে; মুদি যেমন মানুষের হাঁড়ির খবর রাখে সে তেমনি মানুষের নাড়ির খবর রাখে। সে জানে মেয়েটির মায়ের শরীর বড়ই খারাপ, পায়ে ভর দিয়ে একদিন উঠে দাঁড়ায় তো তিন দিন শয্যাশায়িনী হয়। ইদানীং সে-বাড়ি থেকে ওষুধপত্রের জন্যে কেউ আসে নি। মোক্তারের স্ত্রীর চিকিৎসার অবহেলাই হয়ে থাকবে। সে যে সহসা আরোগ্য লাভ করেছে তা সম্ভব নয়; তার ব্যাধি একটি নয়, এবং সর্দিকাশির মতো তুচ্ছ জিনিসও নয়; কোনো-কোনোদিন মুদির দোকানের মালিকের মতো সে সকিনা খাতুনের স্বাস্থ্যের কথাও ভাবে, তবে তার মাজা-ভাঙ্গা ধরনের হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে দোষের কিছু দেখতে পায় না। সে জানে দৈহিক গঠনের ওপর মানুষের হাঁটার ভঙ্গি নির্ভর করে, কিন্তু মেয়েটি যেভাবে ধীরে-ধীরে নিস্তেজভাবে হাঁটে তাই দেখে তার ধারণা হয়, এখনো সে সুস্থতার বাহ্যিক রূপ নিয়ে চলাফেরা করলেও সহসা একদিন তার স্বল্পপুঁজি স্বাস্থ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তখন তার মায়ের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে তেমনি নানাপ্রকার রোগব্যাধি দ্বিরুক্তি না করে তাকে আক্রমণ করবে।

তবে সেদিন রুকুনুদ্দিন মেয়েটির স্বাস্থ্যের কথা বা তার অসুস্থ মায়ের কথা ভাবে না, বস্তুত ঔষধালয়ে বসে থাকলেও মানুষের জীবন-মরণ ব্যাধি যন্ত্রণার কথা তার স্মরণ হয় না, কারণ সহসা এমনই স্থানে তার মন নিক্ষিপ্ত হয় যেখানে সবই যেন দুর্বোধ্য, যেখানে কোথাও কুলকিনারাও নজরে পড়ে না।

কুমুরডাঙ্গার একটি লোকই গভীর স্নেহমমতার সঙ্গে সকিনা খাতুনের প্রতি তাকায় : সে মোহনচাঁদ। চা-মিষ্টির দোকানের পর রতন নামক বোবা লোকটির কাঠগোলার পাশে কাপড়ের দোকানগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটি, সেটি মোহনচাঁদের। অনেক দিন আগে ইংরেজ-হিন্দুদের আধিপত্যের সময়ে পশ্চিমের কোনো অঞ্চল থেকে তার পূর্বপুরুষ এ-মফস্বল শহরে এসে গুড়ের ব্যবসা খুলেছিল যা পরে কী-করে থানকাপড়ের ব্যবসায় পরিণত হয়। বংশানুক্রমে তাদের ভাষা স্থানীয় জবানের সঙ্গে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে যে আজ তা না-দেশী না-বিদেশী, না-বাঙলা না-বিহারি-মাড়োয়ারী। তবে ভাষাটা জগাখিচুড়ির মতো

BanglaBook.org

হলেও মোহনচাঁদ যখন হাঁপর-হাসি হেসে শ্লেষ্মাঘনকণ্ঠে কিছু বলে তখন তার মনোভাব বুঝতে কারো বেগ পেতে হয় না এই কারণে যে প্রতিটি শব্দ যেন গোলাবারুদের মতোই নিঃসৃত হয় তার মুখ থেকে। যে-মানুষের পিতা-পিতামহ হরি-হরি করে ভজন গান ধরে সকালে দোকান খুলত, তাদেরই বংশধর কোনো-কোনোদিন সে-গানের সুরে বা কথায় কোনো পরিবর্তন না এনে কেবল হরির স্থলে খোদার নাম বসিয়ে শুভকাজ শুরু করে। সেদিন তার উদাত্ত কণ্ঠ দোকানপাটের রাস্তার এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত শোনা যায়। মধ্যে-মধ্যে মস্ত-মস্ত ফোকলা দাঁত দেখিয়ে দিলদরিয়াভাবে হেসে সে বলে, লোকেরা যেন তাকে মোহনচাঁদ নয়, মামুনচাঁদ বলেই ডাকে। কিন্তু সে-নাম কারো মুখে আসে না : লোকটির বিশাল দৈহিক আকারে এবং তার মুখের খাঁজে-খাঁজে যে-শাশ্বত প্রাচীনতা অপনেয়ভাবে লিখিত—তা উপেক্ষা করা সহজ নয়।

সকিনা খাতুন যখন দোকানের সামনে দেখা দেয়, তার ঘণ্টাকয়েক আগেই মোহনচাঁদ লোহার বেড়ি-দেয়া কাঠের মস্ত দরজা খুলে বহুব্যবহৃত শীতলপাটিতে আবৃত প্রশস্ত চৌকিতে আসনাধীন হয়ে বসেছে। মধ্যে-মধ্যে বেশ সকালেই তার দোকানে খদ্দেররা এসে উপস্থিত হয়; মামলা-মকদ্দমার জন্যে শহরে উপস্থিত গ্রামবাসীদের অনেকে আদালত বসার আগে কেনাকাটা করে ফেলতে চায়। তবে খদ্দের-পরিবেষ্টিত থাকলেও সকিনা খাতুন থানকাপড়ের দোকানের মালিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। দেড় বছর আগে মেয়েটি যখন প্রথম এ-পথে দেখা দেয় তখন মোহনচাঁদের মনে হয়েছিল, সে যেন ইঁদুরের ছা, এবং পরদিন মোহনচাঁদ যখন জানতে পারে সে স্কুলে পড়তে না গিয়ে পড়াতে যায় তখন তার বিস্ময়ের অবধি থাকে নি। কথাটি সে যথাসময়ে তার স্ত্রীকেও বলেছিল, এবং দোতলা-বাড়ির ওপর তলার জালি-ঢাকা জানলা থেকে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তার স্ত্রীও বিস্মিত না হয়ে পারে নি, হয়তো স্বামীর মতো মেয়েটির প্রতি একটা দরদভাবও সে বোধ করে তখন। মোহনচাঁদের স্ত্রী তার স্বামীর মতো বিশালকায় নারী; তার উচ্চপ্রশস্ত কাঠামোর ওপর নিয়মিতভাবে অকৃপণ মাত্রায় মেদের সঞ্চার চলছে বলতে গেলে আজন্ম থেকে, যার মাত্রা যৌবনোত্তরকালে আরো বেড়ে যায়। তার বিশাল নরম দেহে কিন্তু স্নেহের অন্ত নেই।

একদিন মোহনচাঁদ স্থির করে মেয়েটিকে একটি শাড়ি উপহার দেবে। মধ্যে-মধ্যে শহরের নেতৃস্থানীয় লোকদের দু-একটা শাড়ি বা কিছু থানকাপড় দিয়ে থাকে। কখনো সরাসরিভাবে উপহার হিসেবে দেয়, কখনো আবার বাকিতে দিয়ে পয়সার কথা আর তোলে না; কোনো-কোনো মানুষের বিবেকের জন্যে শেষোক্ত উপায়ে উপহার গ্রহণ করা সহজ। একদিন মোহনচাঁদ সকিনা খাতুনের জন্যে একটি টুকটুকে লাল শাড়ি তুলে রাখে এবং বিনা মতলবে নিঃস্বার্থভাবে কাউকে কিছু উপহার দেবে এ-কথায় গোপনে-গোপনে বেশ পুলকিত বোধ করে। তবে কীভাবে মনস্কামনাটি পূর্ণ করে তা বুঝতে না পারলে শেষ পর্যন্ত শাড়িটা দেওয়া হয় নি। মেয়েটা যদি কিছু মনে করে, বা ফিরিয়ে দেয়? অকারণে উপহার দেওয়া যেন শক্ত কাজই। কারণ যে নেই তা নয়, কিন্তু কারণটা বলা যেন কঠিন : মেয়েটিকে এ-পথ দিয়ে যেতে দেখি প্রতিদিন। আহা, ছোট এইটুকু মেয়ে মাষ্টারনিগিরি করে, কেমন মায়া হয়। তারপর গ্রাম থেকে এক জোতদার এসে শাড়িটা কিনে নিয়ে গেলে সেখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়। তবে সাময়িকভাবে, কারণ সম্প্রতি আবার খেয়ালটা ফিরে এসেছে। একটা শাড়িও হাতে পেয়েছে যা মেয়েটির কথা মনে করে খদ্দেরের সামনে বের করে নি এখনো : মিহিন সুতার শাড়ি, হাল্কা নীল রঙ, রক্তজবার মতো লাল পাড়।

সেদিন মেয়েটি পথে দেখা দিলে মোহনচাঁদ কিন্তু শাড়ির কথা ভুলে অস্পষ্ট কৌতূহলের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেলে হঠাৎ কেমন লজ্জিত বোধ করলে আপন মনে স্থির করে, হরি খোদা বলে আজই পাঠিয়ে দেবে শাড়িটা।

কাপড়ের দোকানগুলি শেষ হলে এবার পড়ে দুটি মনোহারী দোকান যে-দোকান দুটির

BanglaBook.org

দিকে তাকালে মনে হয়, তারা জোর করে গা-ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুটির কোনোটাতেই সামগ্রী বিশেষ কিছু নেই, খদ্দেরও তেমন নেই বলে বেচাকেনাও বিশেষ হয় না।

তারপর সাইকেলের দোকান, যে-দোকানের ঝাঁপ উঠলে নিত্য কয়েকটি সাইকেল আত্মপ্রকাশ করে। এ-শহরে সাইকেল-ক্রেতা বিরল, তাই দীর্ঘদিন ক্রেতার আশায় দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে দোকানের সাইকেলগুলি এতদিনে বেশ রঙচটা হয়ে উঠেছে। তবে সে-বিষয়ে দোকানের মালিকের অবজ্ঞা ভিন্ন কিছু নেই। দোকানদার ছলিম মিঞাও মোটা সোটা ধরনের মানুষ, যেন ব্যবসায়ের দরিদ্র অবস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। আকেরটি ব্যাপারেও একটু অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়। সেটি দোকানদারের মেজাজ, কারণ স্থূল মানুষ সম্বন্ধে সদা হাসিখুশি মেজাজের প্রচলিত জনমতকে মিথ্যা প্রমাণ করে লোকটি সর্বদা রুক্ষ মেজাজ প্রকাশ করে থাকে। তার কপাল জুড়ে বিরক্তি-ভাব কয়েকটি গভীর রেখায় স্থায়ীভাবে অঙ্কিত, চোখে সমগ্র জগতের প্রতি অবিশ্বাস-বিদ্রূপ, এবং কখনো যদি মুখে হাসি ফোটে সে-হাসি ব্যঙ্গমূলক মুখব্যাদানের মতো দেখায়। ধূলাচ্ছন্ন দোকানটিতে পরিচিত কেউ দু-দণ্ড কথালাপের জন্যে এসে হাজির হলে মধ্যে-মধ্যে সে কটূক্তি বা মুখবিকৃতি করে তিক্তরসসিঞ্চিত মতামত প্রকাশ করা ব্যতীত অধিকাংশ সময়ে ভ্রূকুটি-সহকারে রাস্তার দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে থাকে; সে ফালতু কথালাপের পক্ষপাতী নয়। সকিনা খাতুন যখন তার দোকানের সামনে দেখা দেয় তখন সে ভ্রূকুটি-সহকারেই তার দিকে তাকায়। তবে কখনো এক পলকের বেশি নয়। দেখামাত্র চোখ সরিয়ে নেয়, যেন প্রতিদিন তার দিকে একবার তাকানো একটি অভ্যাস হলেও অভ্যাসটি তার নিজেরই মনঃপূত নয়, মেয়েটির প্রতি তার কোনো কৌতূহলও নেই। তবে সেদিন মেয়েটি তার দোকানের সামনে দেখা দিলে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, ভ্রূকুটিটা তেমন সুস্পষ্ট মনে হয় না।

দোকানপাট শেষ হলে অল্পক্ষণের মধ্যে জাঙ্গার-পড়া তারের বেড়া এবং সারি বাঁধা গাছ-গাছালিতে ঘেরা একটি জায়গা পড়ে। ভেতরে লম্বা-লম্বা ঘাস, বনকাঁটা-ঝোপঝাড়, এক কোণে কলাবাগান। স্থানটি পতিতজমি বলে মনে হয়। গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে তাকালে পেছনে একটি পরিত্যক্ত দালানবাড়ির মতো নজরে পড়ে, কিন্তু ভালো করে তাকালে বোঝা যায় সেটি দালানবাড়ি নয়, কারণ সেটি এত ছোট যে তা মানুষের বাসস্থানের যোগ্য হতে পারে না। বস্তুত সেটি কুমুরডাঙ্গার সরকারি শবঘর।

শবঘর পেরিয়ে গেলে এবার একটি খোলামেলা মাঠের মতো পড়ে, তারপর দেখা দেয় কুমুরডাঙ্গার ক্ষুদ্র হাসপাতাল। হাসপাতালটির সামনের শবঘরের মতো অনেকটা জায়গা, তবে সেখানে কোনো গাছপালা-ঝোপঝাড় নেই। হাসপাতাল থেকে ডাক্তার নার্সরা অবাধেই তাকায় তার দিকে। আজ তারা যেন জটলা করে তাকায় তার দিকে।

হাসপাতাল পেরিয়ে তারই পাশ দিয়ে একটি গলি ধরে সকিনা খাতুন অগ্রসর হয়। কিছুক্ষণ বাড়িঘর পড়ে না; হাসপাতালটি ক্ষুদ্র হলেও তার সামনে-পেছনে বিস্তর জায়গা। হাসপাতালের সীমানা শেষ হলে একটি নিঃসঙ্গ তালগাছের পর দরিদ্র-পাড়া শুরু হয়। সেখান থেকে এবার আবার অনেক চোখ কৌতূহলের সঙ্গে তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে।

দরিদ্র-পাড়াটি একপাশে রেখে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে ভুঁই ফুড়েই যেন গরুগাড়ির চাকায় সুগভীরভাবে অঙ্কিত একটি পথ জেগে ওঠে যে-পথের আগামাথা নেই বলে মনে হয়।

শীঘ্র সকিনা খাতুনের পথ শেষ হয়। গরুগাড়ির চক্রাঙ্কিত পথটি রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে দু-পাশে দু-চারটে নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাড়িঘর আত্মপ্রকাশ করে যার একটি কারো বসতবাটি নয়; সেটি কুমুরডাঙ্গা শহরের মেয়েদের মাইনর স্কুল।

সচরাচর সকিনা খাতুনের আগেই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী করিমুন্নেসা বানু স্কুলের এসে পৌঁছায়। করিমুন্নেসা বানু বহুসমস্যা-জর্জরিত বিধবা মানুষ, শিক্ষয়িত্রী বা ছাত্রীর ওপর তার

BanglaBook.org

সদা-বিষণ্ন দৃষ্টি কদাচিৎ পড়ে থাকে। তবে সেদিন স্কুলে প্রবেশ করতেই সকিনা খাতুন করিমুন্নেসা বানুর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। "এই যে তুমি এসে গিয়েছ", প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলে। হয়তো স্বভাববিরুদ্ধ ধরনের অভ্যর্থনা জানিয়েছে বুঝে সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে কী বলবে তা স্থির করতে পারে না। এ-সময়ে সকিনা খাতুন আরো দু-একজন শিক্ষয়িত্রীকে দেখতে পায়। তারা প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে তারই দিকে কেমন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে, যেন তাকে আগে কখনো দেখে নি বা সে যেন কোনো প্রকারের গুরুতর অপরাধ করেছে। কয়েক মুহূর্তব্যাপী কেমন অস্বস্তিকর নীরবতার পর প্রধান শিক্ষয়িত্রী সকিনা খাতুনের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রশ্ন করে,

"তুমি নাকি কী-একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পাও?"

সকিনা খাতুন উত্তর দিতে একটু দেরি করে। অবশেষে শুষ্ককণ্ঠে আস্তে বলে,

"হ্যাঁ।"

তারপর তাদের দিকে তাকাতে সাহস হয় না বলে সে নতদৃষ্টিতে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

বৃহৎ বটগাছটির পাশে কালু মিঞার বাড়ির সামনে যেদিন মুহাম্মদ মুস্তফা দেখা দিয়েছিল তার দু-দিন পরে জুমার নামাজের সময় একজন মধ্যবয়সী জামাই আর একজন চাকরের কোলে চড়ে কালু মিঞা গ্রামের মসজিদে হাজির হয়। বৃদ্ধ কালু মিঞাকে বছর কয়েক যাবৎ বাইরে কেউ দেখে নি; অগ্রহায়ণ মাসের এক ভরা দুপুরে কী একটা নিদারুণ রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে তার বাইরে আসা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে।

কালু মিঞার চেহারা দেখে মসজিদে সমবেত গ্রামবাসীরা বিস্মিত হয়। একদিন যে দরাজগলা কর্মব্যস্ত স্থাস্থ্যবান লোক ছিল, বলবতী ধারার মতো যার মধ্য দিয়ে অফুরন্ত জীবনশক্তি প্রবাহিত হত, তাকে চেনাই দুষ্কর। ভ্রূ-দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছে, কোটরাগত চোখ অন্ধের চোখের মতো জ্যোতিহীন, অস্বচ্ছ, অস্থিচর্মাবিশেষ মুখ শত বলিরেখায় কুঞ্চিত। জামাই এবং ভৃত্যটি তার অথর্ব, হাড়সম্বল হাল্কা দেহটি সামনের সারিতে বসিয়ে দিলে দুর্বল মেরুদণ্ডের ধনুকসম বক্রতা নিমেষে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে, মুখটাও এমনভাবে বুকের ওপর ঝুলে পড়ে যে মনে হয় তা তুলে রাখার ক্ষমতা তার নেই, এবং শীঘ্র আরো মনে হয় দেয়াল-ফুটে-গজানো গাছের মতো সেটি যেন তার ধসে-পড়া বুক ভেদ করেই উঠেছে। তার কোটরাগত চোখ এ-সময়ে অদৃশ্য হয়ে পড়ে। হয়তো সে-চোখ শ্রান্তিতে নিমীলিত হয়ে পড়ে, হয়তো তাতে তন্দ্রা নেবে আসে; বর্ষার দিনে মেঘের মতো অতি অনায়াসে বৃদ্ধ মানুষের চোখে ঘুমতন্দ্রা আসা-যাওয়া করে।

কালু মিঞার চেহারা নামাজিদের মনে একটি বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করে, তাদের আকস্মিক দীর্ঘশ্বাসে ছোট মসজিদ-ঘর বার-বার প্রতিধ্বনিত হয়; তার চেহারা নিঃসন্দেহে কালের নির্দয়তার কথাই তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। একদা আপন চেষ্টায় কত কিছু না করেছে লোকটি : বিস্তর জোতজমি বিষয়আশয়, পুকুরের ধারে মস্ত আটচালা বাড়ি, ফলমূলের বাগান। ধীরে-ধীরে আশেপাশে এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয় যে সকলে তাকে মাতব্বর হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে; লোকেরা নানা ব্যাপারে উপদেশ-পরামর্শ চাইতে তার কাছে আসত, তার অনুমতি বিনা বিয়ে-শাদি বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করত না। দুঃস্থ মানুষেরাও তার সাহায্যপ্রত্যাশী হয়ে পড়ে, সে-ও তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে কখনো-কখনো মুক্তহস্তে তাদের ধান-চাল-পয়সা দিত, ধার-কর্জ হলে তা পরিশোধ করার জন্যে পীড়াপীড়ি করত না। তবে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ হয়তো কখনো সম্ভব নয়, কারণ আলো যেমন পতঙ্গ আকর্ষণ করে তেমনি মানুষের সৌভাগ্য হিংসুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই একদিন খেদমতুল্লা নামক একটি লোকের ছায়া এসে পড়ে কালু মিঞার সুখ স্বচ্ছন্দপরিপূর্ণ জীবনের প্রাঙ্গণে। সহসা সবাই জানতে পায় যে একখণ্ড পৈতৃক জমি ছাড়া

BanglaBook.org

অন্যান্য জোতজমির ওপর কালু মিঞার কোনো স্বত্বাধিকার নেই, দলিলপত্র জাল করে একটি সঙ্গতিপন্না কিন্তু মূর্খ নির্বোধ বিধবা এবং তার নাবালক সন্তান-সন্ততিদের ঠকিয়ে সে-সব সে নাকি আত্মসাৎ করেছে। বিধবা নারীটিকে পরামর্শ দিয়ে হক্ দাবিদাওয়া সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে কালু মিঞার হাত থেকে অন্যায়ভাবে কবলিত সে-সব সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয় খেদমতুল্লা। প্রতিদানে সে কী আশা করেছিল কে জানে, তবে তার অন্তরে অর্থলোভের চেয়ে ঈর্ষাই ছিল বেশি; পরের সুখে তার অন্তরে অর্থলোভের চেয়ে সর্বনাশী আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠত। গ্রামবাসীরা বুঝে উঠতে পারে নি কার পক্ষ নেবে—কালু মিঞার, না খেদমতুল্লার। কালু মিঞার প্রতি আনুগত্য দেখালেও এবং সময়ে-অসময়ে তার সুখের অংশীদার হলেও তারাও কি তার উন্নতিতে গোপনে-গোপনে ঈর্ষাবোধ করে নি? সকলের অন্তরেই ঈর্ষা থাকে। প্রতিবেশীর ক্ষেতে ভালো ফসল হয়েছে দেখে কার না ইচ্ছা হয় গরুটা ছেড়ে বা আইলটা কেটে সে-ফসল নষ্ট করে? ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ পরের ক্ষতি করে কেউ করে না, কিন্তু পরের ক্ষতিতে সবাই খুশি হয়। তাই কী হবে তা দেখবার জন্যে তারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে শুরু করে।

তবে সে-দফা কালু মিঞা রক্ষা পায়, কারণ যার মনে প্রচণ্ড ঈর্ষা দেখা দিয়েছিল এবং যে তার বিষম ক্ষতি করতে উদ্যত হয়েছিল, সে-ই নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ হারায়। হয়তো অদৃশ্য বিচারের খড়্গ সদা খাড়া, সদা প্রস্তুত, কখন এবং কেন কার মাথায় নেবে আসে তা সব সময়ে বোঝা সম্ভব নয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কালু মিঞা বলেছিল, খোদার দুনিয়ায় সুবিচারের অভাব নেই, হিংসাত্মক হয়ে যে নির্দোষ মানুষের ধ্বংস করতে চায় সে-ই ধ্বংস হয়। তবে লোকেরা অবিলম্বে একটি কথা শুনতে পায়। সেটি এই যে, খেদমতুল্লার মৃত্যুতে কালু মিঞার নাকি হাত ছিল। হয়তো ছিল, হয়তো ছিল না : বিচারের খড়্গ কখন কার হাতে গিয়ে ওঠে কে জানে। গ্রামবাসীরা সব সময়ে সে-সব কথা জানতে চায় না। অতএব সে যে নির্দোষ তা জানাবার জন্যে কালুমিঞা যে-কথাটি প্রচার করেছিল সে-কথা বিশ্বাস করে নি, অবিশ্বাসও করে নি, শুধু শুনে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে কথাটি আজগুবি, তবু তারা যা স্বচক্ষে দেখে নি তার সত্যাসত্য নিয়ে কী করে মতামত প্রকাশ করে? তাছাড়া খেদমতুল্লা আর বেঁচে নেই, ওদিকে কালু মিঞার জীবন জোতজমি প্রভাবপ্রতিপত্তি সবই অক্ষত অক্ষুণ্ন। মানুষের আত্মরক্ষার প্রয়োজনও তারা বোঝে না? শত উপায়ে মানুষকে আত্মরক্ষা করতে হয়, কখনো সত্য বলে কখনো মিথ্যা বলে। এবং কখনো সত্য অবিশ্বাস্য মনে হয় আবার কখনো জলজ্যান্ত মিথ্যা বিচারকের ঘরেও অখণ্ডনীয় সত্য বলে গৃহীত হয়। কথাটি না বলে কালু মিঞার উপায়ই-বা কী ছিল। যে-স্থানে খেদমতুল্লার মৃত্যু ঘটে তার নিকটে মীরন শেখ নামক কালু মিঞার একজন বিশ্বস্ত লোককে কি দেখা যায় নি?

কালু মিঞা বলেছিল, সিন্দুরগাঁ-এ নিঃসন্দেহে কোনো নিরপরাধ পরিবারের ধ্বংসের মতলব এঁটে খেদমতুল্লা যখন কামলাতলা বিলের পাশ দিয়ে চাঁদেরগণঘাট অভিমুখে যাচ্ছিল তখন সে-পথ দিয়ে মীরন শেখও বাড়ি ফিরছিল। সন্ধ্যা হয় হয়। মীরন শেখ সহসা দেখতে পায় খেদমতুল্লাকে, বগলে ছাতা নিয়ে লুঙ্গিটা একহাতে দিয়ে কিছু তুলে ধরে নত মাথায় হন্‌হন্ করে তীব্র বেগে সে হেঁটে আসছে। খেদমতুল্লা বেশ কাছে এসে পড়েছে এমন সময়ে হঠাৎ সে সচকিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মীরন শেখ প্রথমে ভাবে খেদমতুল্লা তাকে দেখেই এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু শীঘ্র বুঝতে পারে খেদমতুল্লার দৃষ্টি অন্য কোথাও, তাছাড়া তার মুখে বিস্ময়াভিভূত নিথর ভাব। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে এবার মীরন শেখ ভীষণাকার দৈত্যের মতো একটি মূর্তি দেখতে পায়। ভীষণাকার হলেও মূর্তিটি যেন রক্তমাংসের নয়, সেটি যেন শূন্যের মধ্যে ধুঁয়ার মতো জেগে উঠেছে। তবে আচম্বিতে খাপ থেকে তলোয়ার খোলার মতো বিদ্যুৎঝলকের মতো হঠাৎ, আকস্মিকভাবে। তারপর নিমেষে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে : আবছা মূর্তিটি ঘি-ঢালা আগুনের মতো দপ্ করে জ্বলে উঠে সন্ধ্যাকাশ আলোকিত করে

BanglaBook.org

তোলে, সঙ্গে-সঙ্গে সুগম্ভীর কণ্ঠের গর্জন শোনা যায়, পায়ের তলে জমি কাঁপতে শুরু করে থরথর করে। মীরন শেখের পক্ষে আর তাকানো সম্ভব হয় নি। একটু পরে সে যখন আবার তাকাতে সক্ষম হয় ততক্ষণে চোখ-ধাঁধানো আলোটা নিভে গিয়েছে, পায়ের তলে জমিও স্থির হয়ে পড়েছে, কোথাও দৈত্যের মতো মূর্তিটির বা খেদমতুল্লার কোনো চিহ্ন নেই। মীরন শেখ প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দৌড়াতে-দৌড়াতে কোনোমতে বাড়ি ফিরে আসে।

কথাটি নিঃসন্দেহে অতিশয় বিচিত্র, হয়তো তা তাদের বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু কী সে-আগুন যা দপ্ করে জ্বলে উঠে সন্ধ্যাকাশ আলোকিত করে তুলেছিল, বিদ্যুৎঝলকের মতো আবির্ভূত হওয়া সে-দৈত্যটাই-বা কী—তা কি তারা বুঝতে পারে নি? সে-আগুনের উত্তাপ সে-দৈত্যের ছায়া তারাও কি কখনো-কখনো তাদের অন্তরে অনুভব করে না? হয়তো তাই তেমন অবিশ্বাস্য কথাটি আবার বিশ্বাসও হয়েছে। সে-জন্যে কালু মিঞাকে মিথ্যাবাদী বলে নি, এবং হয়তো মনে-মনেও তাকে দোষান্বিত করে নি।

দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই বলে কালু মিঞা বসে-বসে নামাজ পড়ে, তারপর নামাজ শেষ হলে উঠবার চেষ্টা না করে পূর্ববৎ নত মাথায় বসে থাকে। হাতটা একটু কাঁপে, যেন তসবি পড়ে, কিন্তু হাতে তসবি নেই।

সে-দিন নামাজিরা অন্যদিনের মতো নামাজের শেষে যে-যার পথে চলে না গিয়ে অপেক্ষা করে, তাদের কৌতূহলী দৃষ্টি কালু মিঞার ওপর নিবদ্ধ। ইমামও ঘুরে বসে। নামাজ-খোতবা শেষ হয়েছে বলে তাকে অসহায় দেখায়; কী করবে বুঝে উঠতে পারে না বলে সে শূন্য চোখে নিঃশব্দে দোয়াদরুদ পড়ে। কে জিজ্ঞাসা করবে কেন কালু মিঞা তার অক্ষম অথর্ব দেহটি মসজিদে টেনে নিয়ে এসেছে? কৌতূহলটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলে নামাজিরা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে, তবে কালু মিঞার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে তাদের সাহস হয় না। তাদের কেমন মনে হয়, সে যদি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মসজিদে এসে থাকে সে-উদ্দেশ্যেরই কোনো বিশেষ আকার নেই : বৃদ্ধ মানুষটি তার জীবনের এমন একটি স্তরে এসে উপনীত হয়েছে যেখানে তার উদ্দেশ্য ইহজগতের মানদণ্ডে মাপা আর সম্ভব নয়। উপরন্তু, তার অন্তরে যেন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, ঘৃণা-বিদ্বেষ নেই, ভয়-আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই, নিরাশাও নেই। যদি কিছু থেকে থাকে তা দুঃখ, কারণ সব কিছুর শেষ হলেও দুঃখের শেষ হয় না, অবশেষে দুনিয়ার সব কিছুই অটুট দুঃখে পরিণত হয় ; মানুষ যখন তার কবরস্থান অভিমুখে রওনা হয় তখন কেবল দুঃখেই তার প্রাণহীন দেহ জমাট হয়ে থাকে।

অবশেষে ইমাম প্রশ্ন করে। "কিছু বলবেন কালু মিঞা?"

নিঃশব্দ মসজিদ-ঘরে আকস্মিক প্রশ্নটি বৃদ্ধ কালু মিঞাকে চমকিত করে। হয়তো সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ইমামের প্রশ্নে তার নিদ্রাভঙ্গ হয়। ঈষৎ বিহ্বলভাবে মুখটি কিছু তোলে, কয়েকমুহূর্তের জন্যে তার কোটরাগত চোখের খানিকটা দেখা যায়। তবে শীঘ্র সে-মুখ আবার বুকের ওপর ঝুলে পড়ে, যেন বুকের মধ্যেই তার মুখ আশ্রয় সন্ধান করে; যে-বুকের মধ্যে একদিন কত আশা-নিরাশা আলোছায়ার মতো খেলা করেছে, কত ভালো-মন্দ বাসনা-কামনা ঝড়ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করেছে, সে-বুকে এখন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কারণ সেখানে সমস্ত আলোছায়ার খেলা সব ঝড়ঝঞ্ঝার অবসান ঘটেছে। তারপর মনে হয় বৃদ্ধ মানুষটি কাঁদতে শুরু করেছে; তার শীর্ণ দেহটি থরথর করে কাঁপে। কেবল চোখে অশ্রু দেখা দিয়ে থাকলেও সময়কাল-কর্ষিত চিবুকে কোনো সজলতার আভাস দেখা যায় না।

"বলেন কালু মিঞা", ইমামটি দরদীকণ্ঠে বৃদ্ধকে আবার বলে।

কালু মিঞা নিজেকে সংযত করে, অথবা যে-ভাবাবেগ তার দেহে সহসা কম্পন সৃষ্টি করেছিল সে-ভাবাবেগ নিঃশেষ হয়ে যায়; তার দেহ ধীরে-ধীরে স্থির হয়ে পড়ে। কেবল হাত-দুটি পূর্ববৎ কেঁপে চলে। এবার সে কী-যেন বলে, কিন্তু তার ক্ষীণকণ্ঠ মুখ হতে বেরিয়ে

BanglaBook.org

এসে পিপীলিকার মতো শুভ্র দাড়ি বেয়ে বস্ত্রের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে যায়, সে-কণ্ঠ কারো কান পর্যন্ত পৌছায় না।

ইমাম নয়, অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করে, "কিছু বললেন কালু মিঞা?"

কালু মিঞার কণ্ঠ দ্বিতীয় বার শোনা যায় না। একটু অপেক্ষার পর কালু মিঞার জামাই শ্বশুরের পক্ষে বলে, "তিনি বললেন—খেদমতুল্লাকে খুন করেন নাই, করানও নাই।"

তবে, এ-কথা বলবার জন্যেই বৃদ্ধ কালু মিঞা দুটি মানুষের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে মসজিদে এসেছে। মসজিদে কেউ মিথ্যা বলে না; সেখানে মিথ্যা বললে যে-গুনাহ্ হয় সে-গুনাহ্র মাফ নেই।

ঘরময় সহসা গভীর নীরবতা নাবে, সবাই শ্বাসরুদ্ধ করে অপেক্ষা করে। হয়তো তাদের মনে হয় হঠাৎ অতি অত্যাশ্চর্য কিছু ঘটবে, কোথাও একটি বিশাল হাওয়াই তারাবাজি সমগ্র দুনিয়া আলোকিত করে বিকট আওয়াজে ফেটে পড়বে, পায়ের তলে অতল গহ্বর সৃষ্টি করে ধরণী দ্বিধাকৃত হয়ে পড়বে। তারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে। এমন সময়ে মানুষের কিছু করতে নেই : নাইওরে যেতে নেই, বরাতে শরিক হতে নেই, কাস্তে-কোদাল হাতে নিতে নেই, খাজনা-খেসারত দিতে নেই, দাখিলি জমা করতে নেই, গঞ্জে গিয়ে দাদন দিতে নেই, প্রসূতির স্তনে ঠোন্কা জাগলে অধীর হতে নেই।

তবে কিছুই ঘটে না। এক সময়ে তারা দেখতে পায় জামাই আর ভৃত্যটি হাতে-হাত মিলিয়ে যে-আসন তৈরি করেছে, সে-আসনে বসে বৃদ্ধ কালু মিঞা মসজিদ ত্যাগ করছে। মসজিদ-ঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশটি অতিক্রম করে দরজার নিকটে পৌছুলে আকস্মিক আলোতে বৃদ্ধের চোখ দুটি মিটমিট করে ওঠে, অন্ধের চোখে যেন প্রাণ সঞ্চার হয়, এবং সে-আলোয় তার শুভ্র দাড়ি তার মুখমণ্ডল শীতল তারার শুদ্ধ নির্মল রূপ ধারণ করে।

কালু মিঞা নিরাপদে মসজিদ ত্যাগ করে।

তবারক ভুইঞা বাজারে সাইকেলের দোকানের মালিক ছলিম মিঞার কথা বলছিল। ছলিম মিঞা জনপ্রিয় মানুষ নয়। বরঞ্চ বদমেজাজি জন্তু-জানোয়ারকে মানুষ যেমন এড়িয়ে চলে তেমনি লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলে, অকারণে বড় একটা তার নিকটে আসে না। তবু সকলে গোপনে-গোপনে তাকে সমীহ না করে পারে না। মানুষের তুচ্ছতম দোষ-ত্রুটিও তার সহ্য হয় না, কিছু পছন্দ না হলে পরিষ্কারভাবে বলে ফেলে, তবে নীচমনা কুৎসা-পরনিন্দায় তার প্রবৃত্তি নেই। এবং দুনিয়ায় কোথাও সে ভালো কিছু দেখতে না পেলে মনে হয় সত্যিই কোথাও ভালো কিছু নেই। মানুষের চরিত্র-আচরণ-ব্যবহারে অনেক কিছু সে দেখতেও পায় যা অন্যদের চোখে ধরা পড়ে না। অনেকদিন আগে স্টিমারঘাটের বাদশা মিঞা যখন প্রথমবার খৈনিমুখে বাজারের পথে দেখা দিয়েছিল তখন সে-ই তার চোয়ালের অস্ফুট সঞ্চালন লক্ষ করেছিল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গভীর বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে বলেছিল : "কাকের ময়ূর হবার সখ, কুচকুচার কদলীগাছ হবার সাধ।" তবু লোকটি নির্দয় নয়। ঘাট বন্ধ হবার পর যখন জানা যায় বাদশা মিঞা চাকুরি হারিয়েছে তখন উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, "ঐ যে ব্যাটা খৈনি খায়, উড়ে-বিহারি ভাব দেখায়—এবার কী হবে তার?" ছলিম মিঞার খিটখিটে মেজাজের পশ্চাতে কোথায় যেন ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়ে গভীর সচেতনতা।

মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন যে একটি বিচিত্র কান্না শুনতে পায় সে-খবর শোনার পর ছলিম মিঞা প্রথমে কিছু বলে নি, কেউ প্রশ্ন করলে সবেগে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নীরব হয়ে থেকেছে যেন অবান্তর কথার ওপর কোনো উক্তি করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হয় তার কাছে। তবে সেদিন রাতে স্ত্রীর মুখে কথাটি শুনলে সহসা রাগান্বিত হয়ে পড়ে।

BanglaBook.org

বেশ রাত করে দোকানে ঝাঁপ দিয়ে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসেছে এমন সময়ে তার স্ত্রী করিমন কথাটি তোলে। করিমন বলে,

"আমার কেমন মনে হয় কিছু একটা হবে। সেদিন থেকে মধ্যে-মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব যেন বুকের ভিতর।"

ছলিম মিঞা নীরবেই শোনে, কিন্তু অবান্তর কথাটির উত্থাপনে অসন্তুষ্ট হয় বলে খাওয়ার ভঙ্গিতে ক্ষিপ্রতা এসে পড়ে। বস্তুত, কথাটি কখনো তাকে প্রীত করে নি। মেয়েটি কী শোনে কে জানে। তাছাড়া কিছু শুনতে পায় তাই-বা কী করে বলা যায়। হয়তো সেটি তার কল্পনা, বা কানের ভুল। যা ছলিম মিঞাকে আরো অসন্তুষ্ট করে তা এই যে, মেয়েটি কিছু শুনে থাকলেও লোকেরা এমন শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়বে কেন? জীবনে কখনো কান্না শোনে নি তারা?

তবু ছলিম মিঞা রাগান্বিত হত না যদি তার স্ত্রী সহসা একটি অদ্ভুত কথা না বলত। স্বামীর অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলেও করিমন নিরস্ত হয় না। করিমন সাদাসিধে মানুষ, কথাও তেমন বলে না, তবে ক্বচিৎ কখনো কিসে তাকে যেন পেয়ে বসে, অকস্মাৎ কথা বলতে শুরু করে। তখন তার শ্রোতার প্রয়োজন হয় না, অনেক সময়ে শ্রোতা থাকেও না। এ-সময়ে তার মুখে-চোখে কেমন একটা ভাব জেগে ওঠে, যেন বুকের মধ্যে থেকে যে-সব কথা উদ্বেলিত হয়ে শব্দাকারে দেখা দিয়েছে তারই আওয়াজে সে সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। জীবনের দুঃখ-দুর্দশা নিয়েই সে কথা বলে এবং কোনো ঘটনা অনেকদিন আগে ঘটে থাকলেও এমনভাবে তার অবতারণা করে যে মনে হয় তা সম্প্রতি ঘটেছে, এবং তা তার বুকে যে আঘাতের সৃষ্টি করেছিল সে-আঘাত সবেমাত্র কাটিয়ে উঠেছে। কখনো-কখনো তার কথায় ছলিম মিঞা বিস্মিত হয়, কারণ তার স্ত্রী অকস্মাৎ এমন কথা পাড়ে যা আগে কখনো শোনে নি। কোত্থেকে আসে, কোথাই-বা দীর্ঘদিন ধরে লুকিয়ে রাখে সে-সব কথা? তবে ছলিম মিঞার বিশ্বাস, যা তার স্ত্রী বলে তার অধিকাংশই অসত্য। সে যে সজ্ঞানে মিথ্যা বলে তা নয়; তার মস্তিষ্কটি এমনই যে সেখানে সময়কাল, সত্য-অসত্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভীতি-আশঙ্কা—এসব কী-করে গোলতাল পাকিয়ে যায়। এ-জন্যে সচরাচর স্ত্রীর কথায় বড় একটা কান দেয় না, কেবল তা অসহ্য রকমের ঘ্যানঘ্যানানিতে পরিণত হলে বা অসম্ভবের সীমানা ছাড়িয়ে গেলে ধমকে বলে, "চুপ করো।" ধমক খেয়ে করিমন চুপ করে, সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তব জগতেও প্রত্যাবর্তন করে।

মনের অসন্তুষ্টি চেপে ছলিম মিঞা আপন ভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়েছে এমন সময়ে সহসা সকর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ সে শুনতে পায় মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ের কথা বলতে-বলতে তার স্ত্রী অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। পনেরো-বিশ বছর আগে একবার কুমুরডাঙ্গায় যে-বসন্ত রোগের মহামারী লেগেছিল, কোনো কারণে সে-মহামারীর কথাই তুলেছে। প্রথমে ছলিম মিঞা ভাবে, অবশেষে তার স্ত্রী সকিনা খাতুনের কথা ভুলেছে। কিন্তু শীঘ্র তার ভ্রান্তি দূর হয়।

করিমন বলে, "তখনো মড়ক লাগে নি, সহসা আমি কী একটা কান্না শুনতে শুরু করি সকিনা খাতুনের মতোই। একে-ওকে জিজ্ঞাসা করি, কোনো কান্না শুনতে পাও? সবাই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকায় যেন, আমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমি অবশেষে বুঝতে পারি কোথাও কেউ যদি কেঁদে থাকে সে-কান্না আমিই কেবল শুনতে পাই। তারপর মড়ক লাগে। কত লোক মারা গেল সেবার!" একটু থেমে আবার বলে, "মড়ক লাগবে বলেই অন্তরে কান্নাটি শুনতে পেতাম। অন্তর অনেক সময়ে অনেক কিছু জানতে পায়।"

কথাটি শোনামাত্র ছলিম মিঞা বুঝতে পারে তাতে একরত্তি সত্য নেই, এবং খুব সম্ভব পূর্বে তেমন কথা তার স্ত্রীর মনে কখনো দেখা দেয় নি; কী-করে মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ের কথায় তেমন একটি ধারণা মাথায় এসে সহসা সত্যের রূপ গ্রহণ করেছে।

BanglaBook.org

এবার ভাত-মাখা হাতে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ছলিম মিঞা ব্যগ্রকণ্ঠে বলে,

"চুপ করো, চুপ করো বলছি।"

শীঘ্র খাওয়া শেষ করে নিত্যকার মতো ভেতরের উঠানের পাশে হুঁকা নিয়ে সে বসে, তবে হুঁকায় স্বাদ পায় না। তার মনে হয় বিষম ক্রোধে তার সমস্ত অন্তর যেন কুঁকড়ে রয়েছে।

পরদিন ছলিম মিঞা যখন দোকানে যাবার আগে অন্যদিনের মতো বাড়ির পেছনে আতাফলের গাছগুলি দেখতে যায় তখনো তার রাগ পড়ে নি, মুখে থমথমে ভাব। আতাফলের গাছগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়ে সেদিন তার আনন্দ হয় না যদিও নিত্য এ-সময়ে গাছগুলির ওপর চোখ পড়তেই তার চোখ তৃপ্তিতে নরম হয়ে ওঠে। গাছগুলি শ্রমের ফল, বড় শখেরও জিনিস। চার বছর আগে বৈশাখ মাসে চারা লাগানোর পর থেকে স্নেহভরে তাদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করে এসেছে, নিচে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না যায় আবার শুষ্কতাও দেখা না দেয় বা গোড়াতে আগাছা না জন্মায়—এসব বিষয়ে সতর্কতারও সীমা থাকে নি। চার বছরের যত্ন-সতর্কতার ফলে গাছগুলি বড় হয়ে উঠেছে, কিছু ফলও ধরেছে। তবে প্রথম ফল কখনো ভালো হয় না। তার বিশ্বাস দু-এক মাসের মধ্যে বর্ষাটা ভালো করে নাবলে বেশ উত্তম ফল ধরবে এবং এক-এক গাছ থেকে দুই-শ আড়াই-শ ফলও পাবে। ফলমূলের গাছ করার ব্যাপারে তার বড় উৎসাহ এবং নিজের হাতে যা লাগায় তা ভালোও হয়। কেবল বেশি কিছু করার সুযোগ নেই। ঐ তো ছোট জমিটা, বাড়ির পেছনে। তবু সেখানে কত কিছুই না করে : আলু পটল মটর হতে শুরু করে লেবু লিচু এবং এখন আতাফল। বাল্যকালে ছলিম মিঞা এতিম হবার পর লোকেরা বলত বড় হয়ে সে ভাগ্যবান হবে। ভাগ্যের নমুনা এখনো দেখে নি, তবে কখনো-কখনো তার মনে হয় অল্প বয়সে পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত মানুষটির প্রতি গাছ-লতাপাতা যেন কিছু করুণা বোধ করে।

প্রিয় গাছগুলির দিকে প্রায় না তাকিয়েই ছলিম মিঞা দোকান অভিমুখে রওনা হয়। দোকানে পৌঁছে ঝাঁপ তুলে নির্দিষ্ট স্থানে বসে, মুখের থমথমে ভাব তখনো কাটে নি। শেষরাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। সামনের সাদা মাটির পথটি এখনো সিক্ত, এখানে-সেখানে জমা পানি। সে-পথের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছলিম মিঞা যেন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে স্থির হয়ে থাকে, ঠোঁটের প্রান্তে বক্র রেখায় মানুষের নির্বুদ্ধিতার প্রতি গভীর বিতৃষ্ণার ভাব। একটু পরে একটা খরিদ্দার আসে। সাইকেলের খরিদ্দার নয়; সাইকেলের খরিদ্দার কালেভদ্রে আসে। ছলিম মিঞা তার দোকানে অন্যান্য জিনিসও মজুত রাখে : পেরেক বল্টু লোহা-লক্কড় সুচ-সুতা—এই ধরনের নানাপ্রকারের চুটিচাটি জিনিস। খরিদ্দারটি কিছু বলে, কিন্তু তার কথা ঠিক তার কর্ণগোচর হয় না, কারণ সহসা পথে একটি ছায়া জেগে উঠলে সেদিকে তার দৃষ্টি ছুটে যায়। ছায়াটি মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুনের রূপ ধারণ করে : অন্যদিনের মতো কালো ছাতা মাথায় সকিনা খাতুন বাজারের পথ দিয়ে স্কুল অভিমুখে চলেছে। নুয়ে-থাকা ছাতার জন্যে মুখের নিম্নাংশ শুধু চোখে পড়ে, এবং সে-অংশটিও ছায়াচ্ছন্ন বলে তেমন পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। অন্যদিনের মতো ঈষৎ মাজা-ভাঙ্গা ভঙ্গিতে ধীর-মন্থর গতিতে সে হাঁটে, তবে পথের এখানে-সেখানে জমে-থাকা পানির জন্যে আজ তাকে এঁকেবেঁকে চলতে হয়।

ছলিম মিঞা প্রথমে নিথর দৃষ্টিতে সকিনা খাতুনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত এমনি কাটে। তারপর কী যেন ঘটে, সহসা কোথায় যেন একটি শিরা ফেটে যায়, তার চোখ দুটি নিমেষে রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে, কী একটা দুর্বোধ্য ক্রোধে তার নাসারন্ধ্র কাঁপতে শুরু করে। এবার ক্ষিপ্রবেগে উঠে দাঁড়িয়ে উন্মত্ত পশুর মতো দোকান থেকে পথে নেবে সকিনা খাতুনের পথরুদ্ধ করে দাঁড়ায়, আসবার সময়ে পানি জমা স্থানে পা পড়লে ছলাৎ করে কিছু পানি যে তার লুঙ্গি ভিজিয়ে দেয় তা লক্ষ্য করে না।

BanglaBook.org

এবার একটি তীক্ষ্ণ আর্তনাদে পথের এ-মাথা ও-মাথা যেন কেঁপে ওঠে।
"কী কান্না শোনেন, কোথায় কান্না শোনেন?"

মুহাম্মদ মুস্তফা অতিশয় সাবধানী মানুষ; জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর থেকে অসাবধান হয়ে কখনো কিছু করে নি, অসতর্কভাবে কখনো এক পা-ও নেয় নি। আমার মনে হয়, বাল্যবয়সে তার মধ্যে যে-উচ্চাশা দেখা দিয়েছিল (উচ্চাশা ছাড়া অশিক্ষিত প্রায় দরিদ্র পরিবারের ছেলে অতদূর কি যেতে পারত?) সে-উচ্চাশার বিষয়ে কখনো আপন মনেও স্পষ্টভাবে ভাবতে সাহস করে নি এই ভয়ে যে তা নিয়ে উচ্চবাক্য করলে কোথাও কোনো হিংসাত্মক শক্তি তাকে ধ্বংস করার জন্যে খড়্গহস্ত হবে। তার অগ্রসর হওয়ার পথে কোনো বাধাবিপত্তি দেখলে তার বহর খাটো করে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে নি, মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে নি, বরঞ্চ ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবার চেষ্টা করেছে এবং দুর্জয় শত্রু নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে নিদ্রাভিভূত হলে সুযোগ বুঝে আস্তে সরে পড়েছে। ছুটিছাটাতে দেশের বাড়ির পথ ধরলে তার মনে যে-ভাবটি দেখা দিত তাও তার সাবধানী চরিত্রের পরিচায়ক। চাঁদবরণঘাটে স্টিমার থেকে নেবে খালের পথ ধরলে সহসা তার কেমন মনে হত সে যেন কখনো ইস্কুলে কলেজে পড়ে নি বড়বড় পরীক্ষা পাস দেয় নি, এমনকি যে-গ্রাম যে-জীবন থেকে নিস্তার পাবার জন্যেই এত শ্রম-অধ্যবসায়, সে-গ্রাম বা জীবন ছেড়েও কখনো কোথাও যায় নি। দেশের বাড়ির পথে চৈত্র মাসের বৃক্ষপল্লবের মতো তার সমস্ত তালিম-শিক্ষা নিঃশব্দে ঝরে-পড়া, তারপর গ্রামের সামীপ্যে উপস্থিত হলে পদক্ষেপে জড়তা মুখে-জবানে ঊনবুদ্ধি ঢিলেমি দেখা দেয়া—এ-সবের কারণ এই নয় যে দরিদ্র অশিক্ষিত গ্রাম এত দুর্বল এত অসহায় যে সেখানে শিক্ষাদীক্ষার ঈষৎ চিহ্নপ্রদর্শনও অন্যায়, সাবধানতাই ঐ ভাবটির আসল কারণ : দন্তহীন নিরীহ জন্তুকেও উস্কাতে নেই, কোনো আপদ-বিপদ চোখে দেখা না গেলেও নিরাপদ বোধ করা অনুচিত। এ-ধরনের সাবধানতার আসল উপাদান হল ভীতি এবং সে-কথা নিজে বুঝলেও মুহাম্মদ মুস্তফা কখনো লজ্জা বোধ করে নি, বরঞ্চ নিরাপত্তার জন্যে ভীতি একান্ত আবশ্যকীয়—এমন একটি দৃঢ়বিশ্বাসে সচেতনভাবে সে-ভীতি লালিত-পালিত করে তাকে তার চিন্তাধারা আচরণ-ব্যবহারের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে নেয়; ভীত মানুষ কখনো বেপরওয়া হয়ে হঠকারী কাজ করে বসে না, তেমন কাজের পরিণামও তাকে ভোগ করতে হয় না। এমন মানুষ কি সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় কালু মিঞার বাড়ির সামনে উপস্থিত হবে? তবে সজ্ঞানে না হোক, তারই অজানিত কোনো দুর্বোধ্য তাড়নায় সেখানে উপস্থিত হয়ে থাকবে—এমন একটি সন্দেহ মুহাম্মদ মুস্তফার মনে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করতে তার দেরি লাগে নি। তাও-বা কী করে সম্ভব? তার বিশ্বাস মানুষ তার নিজের মনের মতিগতি বুঝতে পারবে না তা হতে পারে না। অন্যের কাছে একটি মানুষের মন দুর্বোধ্য বা রহস্যময় মনে হতে পারে যার কারণ শুধুমাত্র এই যে, সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে পরের কাছ থেকে অনেক কিছু ঢাকতে হয়, ছলনা-কৌশলের শরণাপন্ন হতে হয়, যে-পথ ধরে সে পথও সকল সময়ে সোজা চলে না। কিন্তু নিজের কাছে মানুষের মন দিবালোকের মতো সদাস্বচ্ছ সুস্পষ্ট, সেখানে অজানার ছায়া বা গুহাপথের রহস্যের অবকাশ নেই। এ কি সম্ভব যে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কালু মিঞার বাড়ির সামনে দেখা দেবে অথচ সে-উদ্দেশ্য তার কাছেই অজ্ঞাত থাকবে?

তবে মুহাম্মদ মুস্তফা যে পথভ্রষ্ট হয়ে কালু মিয়ার বাড়ির সামনে প্রাচীন বটগাছটির নিকট হাজির হয়েছিল এবং বাল্যকালের স্মৃতি স্মরণ করেই তার তলায় একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল—এ-সব কথা বাড়ির লোকদের বিশ্বাস হয় নি। সে-অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে একটি আশা, কেমন একটা উত্তেজনাও, ধীরে-ধীরে তাদের গ্রাস করে, এবং সত্য বলতে কী, আমিও কিছু আশান্বিত কিছু উত্তেজিত হয়ে উঠি। সবারই মনে হয়, এবার মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু করবে। তার বাপের মৃত্যুর পর অলসপ্রকৃতির ছোট চাচা হঠাৎ কী কারণে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

BanglaBook.org

করেছিল এই মর্মে যে এখন মুহাম্মদ মুস্তফা নাবালক, কিন্তু তাকে বড় হতে দাও, তখন দেখবে। সহসা সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি সকলের মনে পড়ে। মুহাম্মদ মুস্তফা আর নাবালক নয়, ইতিমধ্যে অনেক পাস-পরীক্ষাও দিয়েছে, যে-দিনের জন্যে ছোট চাচা অপেক্ষা করতে বলেছিল সেদিন হয়তো এসেছে।

আমরা যে আমাদের আশা-উত্তেজনার কারণ বা স্বরূপ ঠিক বুঝতে পারি তা নয়। দিনটা এসে থাকলেও কিসের জন্যে সে-দিন এসেছে, কীই-বা করবে মুহাম্মদ মুস্তফা? তবু আশাটি একবার দেখা দিলে সেটা নূতনও মনে হয় নি; একদিন মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু করবে সে-বিশ্বাস খেদমতুল্লার মৃত্যুর পরেই কি আমাদের মনে দেখা দেয় নি?

খেদমতুল্লার মৃত্যুর পর তার প্রতি আমাদের মনোভাবের বিষম পরিবর্তন ঘটে। তার জীবনের শেষ দিকে সে আর বাড়ির লোকেদের স্নেহমমতার পাত্র ছিল না। বলতে গেলে, খেদমতুল্লাই সমস্ত স্নেহের বন্ধন নিজ হাতে ছিন্ন করেছিল। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের প্রতি তার উদাসীনতা স্বার্থপরতা অবিবেচনার ফলে সকলের মনে গভীর বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। তার অবিবেচনা সহ্য করতে না পেরে ছোট চাচা তার নাম মুখে নেয়া বন্ধ করেছিল, বাপজান একবার বড় অর্থকষ্টে পড়লে তার কাছে সামান্য সাহায্য চেয়ে সাহায্য না পেলে স্থির করেছিল হৃদয়হীন ভাই-এর মুখ কখনো দেখবে না। দেখাদেখির অবকাশও ছিল না। চাঁদবরণঘাটে বসবাস শুরু করার পর খেদমতুল্লা দেশের বাড়িতে আসা ছেড়ে দিয়েছিল, এমনকি ঈদের দিনে কম ভাগ্যবান ভাইবোনের ছেলেমেয়েদের স্মরণ করে কখনো একটা ছিটের জামাও পাঠিয়ে দিত না। তবু তার অপঘাতে মৃত্যুর পর ভাইদের মন থেকে সমস্ত বিরূপতা অদৃশ্য হয়ে যায়, তার বিধবা স্ত্রী এবং পিতৃহারা অল্পবয়স্ক ছেলেকেও তারা সাদরে বাড়িতে গ্রহণ করে। খেদমতুল্লা নিষ্ঠুরপ্রাণ দুর্বৃত্ত লোক ছিল, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের দিকে মুখ ফিরেও তাকাত না, তবু সে এ-বাড়িরই কারো ভাই কারো চাচা-জেঠা ছিল, তাদের সবাইকে উপেক্ষা করে অন্যত্র চলে গেলেও এ-বাড়িতেই তার জন্ম হয়েছিল। তবে কে জানে, যদি স্বাভাবিক কোনো কারণে খেদমতুল্লার মৃত্যু ঘটত তবে হয়তো এমন ভাবান্তর ঘটত না। হয়তো খেদমতুল্লার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে জবাই-করা গরুর নিথর নিস্তেজ দেহের মতো যে-অসহায়তা প্রকাশ পায় সে-অসহায়তা, তারপর অন্যায়ের বিচার দেখার যে-বাসনা স্বভাবতই জেগে ওঠে তাদের মনে সে-বাসনা—এ সবের তলে মৃত লোকটির দোষঘাট নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তবে তখন তারা কিছু করতে পারে নি, সামান্য আস্ফালন করে নিরস্ত হয়। তারা জানত, সরকার বা পুলিশ কিছ করবে না, সুবিচারের আশা দুরাশা মাত্র। কালু মিঞার তখন সমগ্র অঞ্চলে প্রচণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তি; কালু মিঞাই যে খেদমতুল্লার হত্যার জন্যে দায়ী সে-বিষয়ে কারো কাছে জলজ্যান্ত সাক্ষি-প্রমাণ থাকলেও সে-সাক্ষি-প্রমাণ নিয়ে এগিয়ে আসবে না—তাও জানত। বস্তুত, কেউ একবার বেফাঁসে একটি কথা বলে ফেলে মুখে যে খিল দিয়েছিল আর টুঁ শব্দ পর্যন্ত করে নি; একটি মানুষের ঘাড়ে ক'টাই-বা মাথা?

তবে যারা কিছু করতে পারে নি তাদের মনে সে-সময়েই আশাটির জন্ম হয় : বড় হয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু করবে। তাই তার বাপের মৃত্যুর পর সে যখন পড়াশুনা করে যাবে বলে দৃঢ়সংকল্প হয় তখন সে-সংকল্পের মধ্যে একটি অর্থই দেখতে পায় সবাই—একদিন কিছু করতে চায় বলে সে পড়াশুনা করে প্রথমে মানুষ হতে চায়। তার চরিত্রগত সাবধানতা-সতর্কতার মধ্যেও তার সেই অনুচ্চারিত উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেখতে পায় : একবার মানুষ হয়ে শক্তি-সামর্থের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে চলা সমীচীন নয় কি? তারা কেউ বিশ্বাস করে নি খেদমতুল্লা অতিশয় দুর্বৃত্ত চরিত্রের লোক ছিল বা নিদারুণ শাস্তিটা তার প্রাপ্য ছিল—এ-সব মুহাম্মদ মুস্তফা নির্বিবাদে গ্রহণ করে নিয়েছে। তা কী করে সম্ভব? বাপ-মায়ের বিষয়ে কোনো সন্তানের হৃদয় লৌহগঠিত নয়। তাছাড়া তা বিশ্বাস করলে জীবনে আর থাকে কী? এমন একটা ধারণাতেই কোথাও সমস্ত কিছু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় না কি?

BanglaBook.org

মুহাম্মদ মুস্তফা যে দৈবক্রমে কালু মিঞার বাড়ির সামনে উপস্থিত হয় নি—তা প্রথমে তার মুখের ওপর বলতে আমাদের সাহস হয় নি; ততদিনে প্রায়-গ্রামছাড়া উচ্চশিক্ষার্থী মুহাম্মদ মুস্তফা সকলের অজান্তেই দূরে, কিছু ঊর্ধ্বেও চলে গিয়েছে, এবং স্নেহমমতা বা শুভাকাঙ্ক্ষার কমতি না হলেও তার এবং বাড়ির মধ্যে ইতিমধ্যে একটি অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছিল বলে সম্পর্কে পূর্বের সরলতা বা স্বচ্ছন্দতা ছিল না। তবে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, স্ব-ইচ্ছায় সজ্ঞানেই মুহাম্মদ মুস্তফা কালু মিঞার বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সেখানে তার আবির্ভাব এবং একদিন কালু মিঞার সম্বন্ধে লোকেরা যা বলাবলি করত এ-দুটির মধ্যে সম্বন্ধ না থেকে পারে না। পথ ভুল হয় কী করে? যারা নিয়মিতভাবে গ্রামে বসবাস করে তাদের মতো সময়-অসময়ের ধুলা উড়িয়ে বা কাদা ভেঙ্গে সে আর সারা অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় না, হয়তো অঞ্চলটি তেমন আর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেও না, কারণ কয়েক বছর যাবৎ ছুটিছাটাতে বাড়ি এলে সচরাচর বই-খাতাপত্রেই ডুবে থাকে, বাইরে গেলেও সামনের মাঠ ধরে কিছু বেড়িয়ে ফিরে আসে। তবু সে বিদেশী নয়। ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হোক, চোখে দেখা-যায়-না এমন অন্ধকারে পরিচিত নিশানা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, কোনো কারণে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড় ক, তবু পথ-হারানো সত্যি অসম্ভব।

প্রথমে বাড়িতে একটা গম্ভীর ভাব নেবে আসে, গোপনে-গোপনে আমরা মুহাম্মদ মুস্তফার আচরণ লক্ষ্য করে দেখতে শুরু করি যদি তার মধ্যে তার পরবর্তী চালের বা তার পরিকল্পনার কোনো ইঙ্গিত দেখতে পাই। তার মা আমেনা খাতুন হঠাৎ তার জন্যে ভাপা পিঠা বানাতে বসে। সে-পিঠা মুহাম্মদ মুস্তফার বড়ই প্রিয়। উত্তর-বাড়ি থেকে মা-জান এবং খোদেজা ছুটে আসে আমেনা খাতুনকে সাহায্য করবার জন্যে। এক সময়ে আমেনা খাতুনের চোখ ছাপিয়ে সহসা অশ্রু দেখা দেয়। তবে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সে সংযত করে এই ভয়ে যে কেন কাঁদছে তা কেউ জিজ্ঞাসা করলে কী উত্তর দেবে? হয়তো সবাই যখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু করবে তখন মায়ের প্রাণেই কেবল একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল : কালু মিঞাই কি তার বাপকে খুন করে নি?

সেদিন অপরাহ্নবেলায় মা-জান উত্তর-ঘরের ছায়ায় উঠানে বসে খোদেজার চুলে বেণী বাঁধছিল এমন সময় বাইরে থেকে আমার বাপজানের গলা শোনা যায় : ক-দিন ধরে বিকল-হয়ে-থাকা ঢেঁকিটি সারাবার জন্যে বাপজান ছুতার মিস্ত্রি ডেকে নিয়ে এসেছে এবং মেয়েদের উঠান থেকে সরে যেতে বলছে। মেয়েরা অদৃশ্য হয়ে গেলে ছুতার মিস্ত্রিকে নিয়ে ভেতরে এসে উঠান অতিক্রম করছে এমন সময়ে আমরা শুনতে পাই বাপজান লোকটিকে কালু মিঞার বাড়ির সামনে মুহাম্মদ মুস্তফার আবির্ভাবের কথা বলছে। বাপজানের গলা বেশ চড়া। ছুতার মিস্ত্রির সঙ্গে ঢেঁকির ঘরে ঢোকার পরেও তার উচ্চকণ্ঠ উত্তর-ঘরে দক্ষিণ-ঘরে, হয়তো বেড়ার ওপাশে ছোট চাচার ঘরেও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তার কণ্ঠে গর্বের ভাব, যেন মুহাম্মদ মুস্তফা এমন একটি কাজ করেছে যার দরুন লাঞ্ছিত অপমানিত পরিবারের সম্মান রক্ষা হয়েছে বা হতে যাচ্ছে। বিবরণে কিছু অতিরঞ্জনও। নিঃসন্দেহে ছুতার মিস্ত্রির এই ধারণা হয় যে মুহাম্মদ মুস্তফা কালু মিঞার সঙ্গে দেখা করেছিল, তাকে শাসিয়েছিলও, না হলে গৃহস্বামীর মুখ ভয়ে এমন সাদা হয়ে উঠেছিল তা মুহাম্মদ মুস্তফা কী করে জানবে?

এ-সময়ে আমার বুকটা দুরুদুরু করে ওঠে। আমি জানতাম, দক্ষিণ-ঘরে চৌকিতে হাঁটু তুলে ঝুঁকে বসে মুহাম্মদ মুস্তফা পড়ছিল; বাপজানের উচ্চকণ্ঠ তার কর্ণগোচর হয়ে থাকবে। ছুতার মিস্ত্রি ঢেঁকিঘরে বলে এবার মা-জান এবং খোদেজা বেরিয়ে আসে; চুলবিনুনির বাকি কাজ ঘরেই শেষ হয়েছে। খোদেজা কলসি হাতে বাড়ির পেছনে পুকুরের দিকে রওনা হয়, তবে মা-জান উঠানে দাঁড়িয়ে থাকে—কানটা ঢেঁকিঘরে কিন্তু চোখ দক্ষিণ-ঘরে অদৃশ্য মুহাম্মদ মুস্তফার দিকে। তখনো ঢেঁকিঘরে বাপজান মুহাম্মদ মুস্তফার কথা বার-বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলছিল, এবং একই কথার পুনরাবৃত্তিতে অতিরঞ্জনটাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হয়তো আমার মতো

BanglaBook.org

মা-জানের মনেও এই ভয় দেখা দেয় যে মুহাম্মদ মুস্তফা সহসা দক্ষিণ-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাপজানের কথা মিথ্যা বলে ঘোষণা করে আমাদের আশা-উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটাবে।

তবে মুহাম্মদ মুস্তফা বেরিয়ে আসে নি, তার কোনো সাড়াও পাই নি। আমাদের মনে যদি কিছু সন্দেহ বাকি ছিল সে-সন্দেহ এবার দূর হয়, এবং তখন থেকে বাড়ির সকলে নিতান্ত খোলাখুলিভাবে সেদিনের ঘটনাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে শুরু করে, মুহাম্মদ মুস্তফা নিকটে থাকলেও দমিত হয় না। মুহাম্মদ মুস্তফা নীরব হয়েই থাকে, মুখে আত্মমগ্নভাব, হয়তো ঈষৎ বিহ্বলতা, যেন বাড়ির লোকেদের কথায় তার মনে সন্দেহ জেগেছে সে সত্যি দৈবচক্রেই কালু মিঞার বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়েছিল কিনা সে-বিষয়ে। এ-সময়ে বাড়ির লোকেরা খেদমতুল্লার স্মৃতি স্মরণ করে নানাভাবে মৃত ব্যক্তিটির গুণ গাইতে শুরু করে। এটা নূতন নয়, তবে এমন উচ্ছ্বসিতভাবে সমস্বরে তার গুণকীর্তন কখনো করে নি। সে নয়, সমাজই অসৎ নির্দয় নির্মম ন্যায়বিচারজ্ঞানশূন্য—যে-সমাজ তাকে সর্বপ্রকারে নিপীড়িত করেছিল। সে যদি অমানুষিক পরিশ্রম করে স্ত্রী-পুত্রের কথা ভেবে সৎ উপায়ে দুটি দানার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিল, দয়াহীন পাষণ্ড মানুষেরা সে-দুটি দানা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে দ্বিধা করে নি। এমন একটি সময় আসে যখন অন্যায়-অবিচার সহ্যাতীত হয়ে পড়ে। যে-সাপ কারো কোনো ক্ষতি করতে চায় না তাকে অযথা অকারণে মারতে গেলে সে যেমন ফণা তুলে ফুঁসে দাঁড়ায়, তার মুখে বিষ চড়ে—তেমনি একদিন খেদমতুল্লাও রুখে দাঁড়িয়েছিল, তার মুখে প্রতিহিংসার বিষ এসে গিয়েছিল। তার হৃদয় ছিল মহৎ, উদার, পরার্থপর; সে-হৃদয় হিংসাত্মক লোকেরা পদদলিত করেছিল। সে দুর্বলের রক্ষক ছিল, প্রতারিত উৎপীড়িত অসহায় মানুষের জন্যে তার দরদী মন কাঁদত। অন্যায়ভাবে জোতজমি দখল করে কালু মিঞা যে স্বামীহারা অবলা নারীকে ঠকিয়েছিল সে-নারীকে সে সাহায্য করতে চেয়েছিল যাতে যা তার হক তা সে ফিরে পায়। এবং সে-জন্যেই তাকে প্রাণ দিতে হয়।

এ-সবও মুহাম্মদ মুস্তফা নীরবে শোনে।

তারপর চতুর্থ দিনে খবরটি আমাদের গ্রামে এসে পৌঁছায়। খবরটি এই যে, অথর্ব কালু মিঞা মসজিদে গিয়ে ঘোষণা করেছে সে নির্দোষ।

খবরটি বাড়ির সবাইকে স্তম্ভিত করে। বস্তুত কিছু সময়ের জন্যে সকলে কেমন বাক্‌শূন্য হয়ে পড়ে। তাদের মনে হয়, মসজিদ-ঘরে কথাটি বলে ধূর্ত কালু মিঞা আমাদের সঙ্গে বড়ই শয়তানি করেছে, যেন যাকে আমরা প্রায় ধরে ফেলেছিলাম সে হাত থেকে ফস্কে গিয়ে একটি দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। দুর্গটি সাধারণ দুর্গও নয়, সেটি আকায়িদ-ঈমানে তৈরি দুর্গ।

বাপজান অবশেষে কালু মিঞার কারসাজির বিষয়ে তার মত প্রদান করে। উঠানে দাঁড়িয়ে লুঙ্গির গিঁট খুলে আবার শক্ত করে বাঁধতে-বাঁধতে (কোনো কারণে ক্রুদ্ধ বা বিচলিত হয়ে পড়লে বাপজান অমনি লুঙ্গির গিঁট খুলে আবার শক্ত করে বাঁধে) উচ্চস্বরে বলে, "যে-মানুষ খোদার বান্দাকে খুন করতে ভয় পায় না সে-মানুষ খোদার ঘরে মিথ্যা বলতে ভয় পাবে কেন?"

সে-রাতে বাপজান মুহাম্মদ মুস্তফাকে সরাসরি প্রশ্ন করে, "কী করতে চাও, বাবা?"

মুহাম্মদ মুস্তফা কোন উত্তর দেয় নি। সেদিন তাকে সত্যি বড় বিহ্বল মনে হয়, যেন যে-মানুষ কোনো প্রকারের দ্বিধা-সংশয় পছন্দ করে না সে-ই নিদারুণ একটি দ্বিধা-সংশয়ের কবলে পড়ে প্রায় দিশেহারা হয়ে উঠেছে।

তার মানসিক অবস্থার কারণ পরদিন জানতে পাই।

মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু করবে—এমন একটা আশায় আমরা যখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম সে-সময়ে অন্য একটি কথায় সে ভাবিত হয়ে পড়ে। সেটি এই যে, কালু মিঞার বাড়ির সামনে তার আবির্ভাব গৃহস্বামীকে সন্দিগ্ধ, হয়তো-বা সন্ত্রস্তই করে থাকবে। তারপর বৃদ্ধ লোকটি মসজিদে গিয়েছে সে নির্দোষ সে-কথা বলতে—তা জানার পর মুহাম্মদ মুস্তফা দেখতে

BanglaBook.org

পায় তার সন্দেহটি অযথার্থ ছিল না : সত্যি, অথর্ব অক্ষম রোগব্যাধি জর্জরিত লোকটি ভয়ানকভাবেই ভীত হয়ে পড়েছে। কালু মিঞা দোষী হোক্ নির্দোষ হোক্, মুহাম্মদ মুস্তফা সেদিন কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে তার বাড়ির সামনে দেখা দেয় নি। সে-কথা তাকে জানানো এবার তার কর্তব্য বলে মনে হয়।

কালু মিঞাকে কথাটি জানানোর দায়িত্ব আমার ওপর পড়ে। আমি একটু বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালে সে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে বাপজানের কথা যেন শোনে নি এমনিভাবে শুধু বলে, "মসজিদে কেউ মিথ্যা কথা বলে না।"

অল্পক্ষণের মধ্যে খালি পায়ে ছাতাবগলে আমি মুক্তাগাছি গ্রাম অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ি এবং বাড়ির গভীরভাবে নিরাশ হওয়া ক্ষুব্ধ প্রবঞ্চিত লোকেদের বিষয়ে না ভেবে বা মুহাম্মদ মুস্তফার আচরণের অর্থ বুঝবার চেষ্টা না করে সজোরে পদসঞ্চালন করে এগিয়ে চলি। যে-কথা দুর্বোধ্য মনে হয় সে-বিষয়ে ভাবতে আমার ভালো লাগে না।

কী কারণে তবারক ভুইঞা থামে। বাইরে, রাতের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে, নদীর বিক্ষুব্ধ অশ্রান্ত পানি আর্তনাদ করে। সে-আওয়াজই সহসা কানে এসে লাগে। শ্রোতাদের মধ্যে একজনের চোখ নিমীলিত হয়ে পড়েছে, মুখটা ঈষৎ খুলে সোজা হয়ে বসে সে ঘুমায়। শান্ত মুখ, তাতে ঘুমের কোনো ছায়া নেই। তাই মনে হয় সে বুঝি জেগেই চোখ বুজে রয়েছে, অথবা সে অন্ধ।

তারপর আবার তবারক ভুইঞার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

সে বলে : সেদিন সকালে ক্রোধোন্মত্ত পশুর মতো ছুটে গিয়ে সকিনা খাতুনের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে ভীষণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেও সম্বিৎ ফিরে পেতে ছলিম মিঞার দেরি হয় নি। তারপর মেয়েটির ভীতবিহ্বল মুখ দেখতে পেলে সে গভীরভাবে লজ্জিত বোধ করে এবং এ-সময়ে কেউ এসে তার হাত ধরলে সে বশীভূত পশুর মতো মেয়েটির পথ ছেড়ে দোকানে ফিরে আসে, তার রাগের কারণটি সহসা নিজেই যেন বুঝতে পারে না।

তবে শহরবাসীরা তার রাগের কারণটা অবিলম্বে বুঝতে পারে। নিঃসন্দেহে ছলিম মিঞা একটু বাড়াবাড়ি করেছে, কিন্তু তার মতো তারাও কি জানতে চায় না মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন কী শোনে, কোথায় শোনে, তার অর্থই-বা কী? কান্নার কথাটি সকলের মনে কী-একটা আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে যেন। সে-আশঙ্কাই ছলিম মিঞার আকস্মিক ক্রোধের কারণ। লোকটির আত্মসংযম নেই, ঝট্ করে তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়, একবার রক্ত চড়লে সে যেন চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। তবু আশঙ্কাটি অহেতুক নয়। শহরবাসীরা কেন, মোক্তার মোছলেহউদ্দিনও বুঝতে পারে ছলিম মিঞার আচরণটি অন্যায্য নয়। বাজারের পথে তার মেয়ে অপমানিত হয়েছে খবর পেয়ে প্রথমে তার রাগের সীমা থাকে নি, সাইকেলের দোকানের বদমেজাজি মালিকের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেবে বলে শাসায়। সকিনা খাতুন যদি কিছু একটা শুনে থাকে তবে তাদের কী? সে কারো ক্ষতি করে নি, সমাজ বা নীতিবিরুদ্ধ কোনো কাজও করে নি, তারা তাকে পথে-ঘাটে অপমান করতে শুরু করবে কেন? তবে এক সময়ে তার রাগ পড়ে এবং রাগের স্থলে চিন্তা দেখা দেয়। বিচিত্র কান্নাটির কথায় অন্যেরা যদি বিচলিত হয়ে পড়ে থাকে, তাদের মনে অস্ফুট একটি আশঙ্কার ছায়া দেখা দিয়ে থাকে, বা তারা জানতে চায় কী সে-কান্না যা মেয়েটি শুনতে পায়, তবে তাদের সত্যি দোষ দেয়া যায় না। সে-ও কি মনে-মনে কেমন বিচলিত বোধ করতে শুরু করে নি, সে-ও কি কান্নাটির রহস্যভেদ করতে চায় না? প্রথমে স্ত্রীর মুখে কথাটি জানতে পারলে তাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নি এবং নিজেই বিচিত্র খবরটি সবিস্তারে বলে বেড়িয়েছে। হয়তো তখন অন্যদের বললেও তা তার আবার কেমন বিশ্বাস হয় নি, বিশ্বাস হলেও ভেবেছে তার পশ্চাতে ধরাছোঁয়া যায় এমন কোনো কারণ থেকে থাকবে : হয়তো কোথাও একটি মেয়েলোক কাঁদে,

BanglaBook.org

হয়তো–বা কোনো জীবজন্তুই কাঁদে এমনভাবে; যা অস্বাভাবিক তা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তবে একদিন খট্‌কা লাগে। তাই যদি হয় তবে শুধু মেয়েটিই কেন তা শুনতে পাবে? সে–কথা যেদিন বুঝতে পারে সে–দিন মনে সহসা দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। তারপর মেয়েকে বারবার জিজ্ঞাসা করে কিন্তু মেয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারে নি। কেবল এই বিষয়ে তাকে নিশ্চিত মনে হয় যে থেকে–থেকে একটি কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় সে, নারীকণ্ঠে কে যেন কোথায় কাঁদে নদীর দিক থেকে, কিন্তু জানে না কে কাঁদে, কেন কাঁদে, কেনই–বা তার আওয়াজ অন্য কারো কর্ণগোচর হয় না।

ছলিম মিঞা সকিনা খাতুনের প্রতি অযথা অন্যায় ব্যবহার করেছে বা আশঙ্কাটি অহেতুক—এমন ধারণা কারো মনে থেকে থাকলে তা তখন দূর হয় যখন সবাই স্ত্রী করিমনের অদ্ভুত কথাটি শুনতে পায়। স্বামীর আচরণের কারণ বোঝাবার চেষ্টায় বা হঠাৎ যা আবিষ্কার করেছে তা বলার লোভ সামলাতে পারে না বলে করিমন সকলকে কথাটি বলে বেড়ায়, সাইকেলের দোকানে কর্মরত স্বামী তাকে বাধা দিতে পারে না। তারপর অন্যদের পক্ষেও আশঙ্কাটি আর চেপে রাখা দায় হয়ে পড়ে।

সেদিন সন্ধ্যার পর নবীন উকিল আরবাব খান, ইস্কুলের থার্ড–মাস্টার মোদাব্বের, মুহুরি হবু মিঞা এবং আরো দু–একজন শহরবাসীদের স্ত্রীরা বিচিত্র কান্নাটির রহস্যভেদ করার চেষ্টায় মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের বাড়ি এসে উপস্থিত হয়। স্ত্রীরা আসে, কারণ ইস্কুলের চাকরির খাতিরে পথে বেরুতে হয় বটে তবে সকিনা খাতুন কেমন পর্দাও করে, বাইরে বৈঠকখানায় পরপুরুষের সামনে দেখা দেয় না।

স্ত্রীর দল সরাসরি অন্দরে এসে অযথা কালক্ষেপ না করে সকিনা খাতুনকে জেরা করতে উদ্যত হয়। নবীন উকিল আরবাব খানের স্ত্রী আয়েষাই জেরা–কার্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। আয়েষার মধ্যে বংশের একটু দেমাগ। আজ তার বাপদাদার অবস্থা তেমন সুবিধাজনক না হলেও এককালে তারা যে বড় জমিদার ছিল, তারই দেমাগ। স্বামীর পেশাজনিত সার্থকতার জোরে তার দেহে গহনা–অলঙ্কারের ছড়াছড়িও, যে–গহনা অলঙ্কারের দীপ্তি এবং ঝঙ্কারের সঙ্গে নূতন শাড়ির খসখস শব্দ, কণ্ঠের নাকী উচ্চ সুর, ধনুকের মতো বাঁকা ভ্রূর ওঠা–নাবা, ঠোঁটের পাশে একটু তুচ্ছ–তাচ্ছিল্যের আভাস, কটকটে চোখ—এসব মিলে যে–একটি ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় তা অনেকের মনে যুগপৎ ঈর্ষা এবং আনুগত্যের ভাবের সৃষ্টি করে।

সামনে সকিনা আড়ষ্ট হয়ে বসলে সে প্রথমে কটকটে চোখে নয়, নরম চোখেই মেয়েটির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে, দেখে তার শীর্ণ লাবণ্যহীন চেহারা, হাসিশূন্য মুখ। সকিনা খাতুনের জন্মদাগটিও লক্ষ করে দেখে। জন্মদাগটি তেমন স্পষ্ট নয়, শ্যামল রঙের ওপর আরেকটু শ্যামল একটা ছাপ যা মুখের নিম্নাংশ থেকে শুরু হয়ে গলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। তারপর সে দেখে তার কণ্ঠাস্থি, অলঙ্কারশূন্য বুকের উপরাংশ, প্রায় সমতল বুক। অবশেষে সে মিষ্টি কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,

"সত্যি কিছু শুনতে পান নাকি?"

এমনভাবেই সে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে যেন কান্নার কথা সে বিশ্বাস করে না, বা তা সত্য নয় সে–কথা মেয়েটিকে বলার সুযোগ দেওয়াই তার ইচ্ছা।

সকিনা খাতুন একটু ভাবে, যেন সঠিক উত্তর সে জানে না। বস্তুত, আয়েষার নরম দৃষ্টি এবং মিষ্টি কথা তাকে হঠাৎ কেমন নিরস্ত্র করে ফেলে, সদলবলে এতজন মেয়েলোকের আকস্মিক আবির্ভাবে মনে যে–কোণঠাসা ভাব দেখা দিয়েছিল সে–ভাবটি দূর হয়। হয়তো একবার ভাবে, যদি সে বলতে পারত কিছুই সে শোনে না, কী কারণে তেমন একটা খেয়াল হয়েছিল গত কয়েকদিন কিন্তু সে–খেয়াল কেটে গিয়েছে, তবে স্বস্তিই পেত। কিন্তু সে জানে তা সত্য নয়। প্রথমে কান্নাটি শুনতে পেলে মনে হত, সত্যি কি কিছু শুনতে পায়? এখন তা–ও মনে হয় না, যখন কিছু শুনতে পায় না তখনও কান্নার রেশটি অন্তরে কোথাও যেন ঘোরাঘুরি করে।

BanglaBook.org

"না, একটা কান্নার শব্দ থেকে-থেকে শুনতে পাই।" অবশেষে ক্ষীণকণ্ঠে সে বলে।

"শুধু আপনিই শোনেন, আর কেউ শুনতে পায় না—তা কী করে সম্ভব?"

এ-প্রশ্নের কী উত্তর দেবে সকিনা খাতুন? সে জানে সে-ই কেবল শুনতে পায়, আর কেউ শুনতে পায় না। কেন, তা বলতে পারবে না। অনেক সময় কান্নার আওয়াজটি এমন সশব্দে ফেটে পড়ে যে তার মনে হয় শহরের অন্য প্রান্তে পর্যন্ত সে-আওয়াজ পৌঁছানো উচিত, কিন্তু কেউ এক হাত দূরে বসে থাকলেও কিছু শুনতে পায় না।

সকিনা নীরব হয়েই থাকে। একটু অপেক্ষা করে আয়েষা আবার জিজ্ঞাসা করে,

"কান্নার আওয়াজটা কেমন ধরনের?"

এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত নয়। কান্নার আওয়াজটা কেমন ধরনের? নিঃসন্দেহে গলাটা কোনো মেয়েলোকের। অজানা মেয়েলোকটি কখনো কাঁদে করুণ গলায়, কখনো বিলাপের ভঙ্গিতে, কখনো গুমরে-গুমরে, কখনো মরণকান্নার ঢঙে। কখনো মনে হয় কাছে কোথাও কাঁদছে, কখনো আবার মনে হয় আওয়াজটি বেশ দূরে সরে গিয়েছে। কখনো কাঁদে উচ্চ তীক্ষ্ণকণ্ঠে, কখনো অস্ফুটভাবে নিম্নকণ্ঠে।

"তবে আওয়াজটা সব সময়ে একদিক থেকেই আসে।"

"কোন্‌দিক থেকে?"

"নদীর দিক থেকে।"

"কান্নাটি শুনলে ভয় করে না?"

সকিনা আবার একটু ভাবে। কান্নাটি শুনলে সে কি ভয় পায়? হয়তো আগে যেমন ভয় পেত তেমন ভয় আর পায় না, সে যেন কেমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। হয়তো সে বুঝতে পেরেছে, কে কাঁদে কেন কাঁদে তা জানে না বটে কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। কণ্ঠস্বরটি কেমন চিনেও ফেলেছে। সে-কণ্ঠের বিভিন্ন খাদ, বিভিন্ন সুর—সবই চিনে ফেলেছে এবং এমনও মনে হয় যে, যে কাঁদে তার সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়।

"না, ভয় করে না।"

না, সত্যি ভয় করে না আর। যে-কণ্ঠস্বর এত পরিচিত মনে হয়, সে-কণ্ঠস্বরে ভয় হবে কেন? এমনকি তার কেমন মনে হয়, কণ্ঠস্বর যেন জারুনার মা নামক মেয়েমানুষটির যার নিকট বালিকাবয়সে কতগুলি ছড়া শিখেছিল। তবে তার কণ্ঠস্বর চিনতে কষ্ট হয় কারণ তাকে কখনো কাঁদতে শোনে নি। সে সর্বদা হাসত, কখনো কাঁদত না। কিন্তু জারুনার মা কাঁদবে কেন? এই দুনিয়ায় যে কোনোদিন কাঁদে নি দুনিয়া ত্যাগ করার পর, সমস্ত দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সে কাঁদবে কেন? কখনো কখনো মনে হয় : জীবিতকালে না কেঁদে হেসে গিয়েছিল বলে, হাসির তলে সব ব্যথাবেদনা লুকিয়ে রেখেছিল বলে এখন সে কাঁদছে, এখন তার পক্ষে কান্না ঢাকা সম্ভব নয়; মৃত্যুর পর যা সত্য তা কেউ ঢাকতে পারে না, কারণ দেহহীন হবার পর কিছু ঢাকার শক্তিও বিলোপ পায়।

আয়েষা কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সকিনা খাতুনের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর সহসা তার চোখে কটকটে ভাবটি ফিরে আসে। সে ভাবে, সকিনা খাতুন ভয় পায় না তবে মানুষের মনে আশঙ্কার ভাব দেখা দিয়েছে কেন, সকালে ছমির মিঞা ক্রোধে এমন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেফিল কেন, সকিনা খাতুনের চোখের নিচে এমন কালচে দাগ পড়েছে কেন?

"মন খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে বুঝি?" বিদ্রূপের স্বরে আয়েষা বলে।

সকিনা খাতুন তার উক্তিটি ঠিক শুনতে পায় না, কারণ সহসা সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। সে ভাবে, না, জারুনার মা কাঁদবে কেন? তাছাড়া তার কান্না কখনো শোনে নি বটে কিন্তু সে কাঁদলেও তার কণ্ঠস্বর নির্ভুলভাবে চিনতে পারবে; হাসির কণ্ঠে এবং কান্নার কণ্ঠে তেমন আর কী প্রভেদ? না, গতকাল থেকে একটি বিচিত্র কথাই বারবার মনে দেখা দিচ্ছে। হয়তো কান্নাটি কোনো মানুষের নয়, কোনো জীবজন্তুরও নয়, জীবিতের নয় মৃতেরও নয়, অন্য

BanglaBook.org

কারো। কে জানে, কান্নাটি হয়তো নদীরই, হয়তো তাদের মরণোন্মুখ বাকাল নদীই কাঁদে।

"কী, কান্নার আওয়াজ শুনলে মন বুঝি খুশিতে ভরে ওঠে?" আয়েষা আবার বলে। আয়েষার কথা না হলেও তার কণ্ঠের রুক্ষতা এবার সকিনা খাতুনের কানে পৌঁছায়। চকিত দৃষ্টিতে সে উকিলের স্ত্রীর দিকে তাকায়, তার চোখের কটকটে ভাবটি লক্ষ্য করে, সহসা সাইকেলের দোকানের মালিকের রক্তাক্ত চোখের কথাও একবার তার স্মরণ হয়। সে কি বলবে কথাটি? হয়তো বলাই উচিত হবে। দৃষ্টি সরিয়ে সকিনা খাতুন কয়েক মুহূর্ত লণ্ঠনের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে; সে-আলো তার চোখে প্রতিফলিত হয় বলে মনে হয় সহসা তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"ভয় হত, তবে আর হয় না। নদীর কান্নায় ভয় কী? নদী কাঁদে, বাকাল নদী কাঁদে।"

সেদিন কিন্তু শেষপর্যন্ত মুক্তাগাছি গ্রামে কালু মিঞার বাড়ি যাই নি। যেতে পারি নি। যে-দায়িত্বের ভার গ্রহণ করেছিলাম সে-দায়িত্ব অক্ষরে-অক্ষরে পালন করব এমন একটি সংকল্প নিয়েই পথ ধরেছিলাম, তবে ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করার পর কী কারণে আমার পদক্ষেপ মন্থর হয়ে ওঠে, তারপর কখন একেবারে থেমে পড়ে। নিকটে একটি হিজল গাছ দেখতে পাই। ভাবি, একটু বিশ্রাম করি। তারপর গাছের তলে বসে অদূরে একটি ক্ষেতে কার্যরত লোকেদের দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। তখন রোদটা বেশ চড়ে উঠেছে, শুষ্ক-হয়ে-ওঠা হাওয়ায় চড়চড়ে ভাব দেখা দিয়েছে। নিকটে কোথাও একটি ভ্রমর গুনগুন করে শব্দ করে, দূর আকাশে একটি চিল শ্লথগতিতে কালো বিন্দুর মতো ভাসে, তারপর কোত্থেকে একটি ফড়িং এসে কিছুক্ষণ লাফালাফি করে আমার দৃষ্টিপথে। হয়তো অনেকক্ষণ এমনি বসেছিলাম। তারপর এক সময়ে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ক্ষেতের লোকেদের সন্ধান করি, দেখতে পাই তারা ক্ষেতের ওপাশে আরেকটি গাছের তলে মধ্যাহ্নের রোদ থেকে আশ্রয় নিয়েছে। এবার উঠে পড়ে আবার পথ ধরি। তবে সে-পথ মুক্তাগাছি গ্রাম বা আমাদের বাড়ির দিকে আমাকে নিয়ে যায় নি, সময় কাটাবার জন্যে অন্যত্র চলে গিয়েছিলাম। ততক্ষণে বুঝে নিয়েছিলাম, কালু মিঞার বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। তবু কিছুক্ষণ মনটা কেমন খচ্‌খচ্ করে। মুহাম্মদ মুস্তফা যদি জানতে পায়? অবশেষে মনকে এই বলে প্রবোধ দেই যে সে কখনো জানতে পারবে না, কারণ কালু মিঞা বা সে-বাড়ির কোনো লোকের সঙ্গে তার আর কখনো মোকাবিলা হবে না। কালু মিঞা কি মসজিদে গিয়ে বলে নি সে নির্দোষ?

তবে ক-দিন আগে মুহাম্মদ মুস্তফা পথ ভুলে মুক্তাগাছি গ্রামে কালু মিঞার বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়ে ভীমরুলের চাকে কাঠি দেয়ার মতো কিছু করেছিল—তা যদি তখন বুঝতে পারতাম তবে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে-কাজ করার ভার পড়েছিল আমার ওপর, সে-কাজটি করতাম। কেবল করলে কোনো ফল হত কিনা জানি না। ভীমরুলের চাকে একবার কাঠি দিলে রোষান্বিত ভীমরুলদের বশ মানানো সহজ নয়।

পরদিন দুপুরের দিকে কালু মিঞার জামাই দুটি রঙাগোছের লোক এবং একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে সঙ্গে করে আমাদের বাড়ির সামনে দেখা দেয়। বাপজানই বোধ হয় প্রথম তাদের দেখতে পায়। একটু পরে কেমন বিচলিত হয়ে বাপজান ভেতরে আসে এবং দক্ষিণ-ঘর থেকে মুহাম্মদ মুস্তফাকে ডেকে নিয়ে আবার বাইরে যায়।

সেদিনের কথা মনে পড়লে আকাশের ঘনঘটা, এবং অঝোরে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বৃষ্টি পড়ার কথাই মনে পড়ে। সেদিন এক মুহূর্তের জন্যেও যেন বৃষ্টি থামে নি, কখনো-কখনো ধারাটা কিছু ক্ষীণ হয়েছে তবে আবার মুষলধারায় নেবে আসতে দেরি হয় নি। স্তরে-স্তরে সজ্জিত পুঞ্জীভূত মেঘের তলেও দিনটা হয়তো তেমন অন্ধকার ছিল না, কিন্তু স্মৃতিতে কেবল কী একটা বিষাদভরা সুনিবিড় তমসাচ্ছন্ন দিনই দেখতে পাই। যে-বৃষ্টি অঝোরে ঝরেছিল

BanglaBook.org

ক্লান্তিহীনভাবে সে-বৃষ্টিতে, যে-ঘনীভূত অন্ধকারে দিনটা সন্ধ্যার মতো হয়ে উঠেছিল সে-অন্ধকারে সব কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি কেন? যে-কথা সত্য নয় কিন্তু অতিশয় জঘন্য, সে-কথাই-বা কেন শুনতে হয়েছিল, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির উচ্চ শব্দের তলে তা ঢাকা পড়ে যায় নি কেন?

বাহিরঘরে পৌঁছুতে আমার দেরি হয় নি। আমাদের বাহিরঘরটি নামেই বাহিরঘর, আসলে সেটি গোয়ালঘর। একপাশে শুধু নিচু করে তৈরি বাঁশের মাচার মত; সে-মাচায় রাখাল লোক রাত্রিযাপন করে। সে-ঘরে উপস্থিত হলে দেখতে পাই কালু মিঞার জামাই এবং ষণ্ডাগোছের লোকদুটি মাচার ওপর বসে। দরজার কাছে বাপজান, পাশে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা। তারপর মাচার পশ্চাতে আবছা অন্ধকারের মধ্যে ছেলেটিকে দেখতে পাই। আবছা অন্ধকারে তার চেহারা ভালো করে দেখতে না পেলেও কেমন চমকে উঠি, কারণ, মনে হয় ছেলেটি যেন খেদমতুল্লার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ : একই মুখের আকৃতি, একই নাক, একই থুতনি, একই ধরনের কেমন ছড়ানো কান। তারপর ছেলেটি আমার দিকে ক্ষণকালের জন্যে তাকালে তার চোখে যে-রুক্ষতা দেখতে পাই সে-রুক্ষতাও অবিকল মুহাম্মদ মুস্তফার জন্মদাতার চোখেরই রুক্ষতা; খেদমতুল্লার চোখে এমন একটি ভাব ছিল যে মনে হত নিদ্রা বলে কোনো জিনিস সে জানত না।

বাপজান বড় উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল। হয়তো আসলে সে তখন উত্তেজনার চেয়ে ক্রোধ-আক্রোশই বেশি বোধ করছিল, কিন্তু যা সে সবেমাত্র শুনতে পেয়েছে তাতে সে এমনই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে ক্রোধ-আক্রোশ প্রকাশ করার ক্ষমতা তার ছিল না। বাপজান কী বলছে তা প্রথমে বুঝতে পারি নি; বাপজান বোধগম্য ভাষায় কিছু বলার ক্ষমতাও সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলে থাকবে। থেকে-থেকে একটি মেয়েলোকের নাম শুনতে পাই, কিন্তু বাপজান তার বিষয়ে কিছু জানে বলে মনে হয় না। সে কে, তা আমিও গোড়াতে ধরতে পারি নি। তারপর সহসা একটি মুখ ভেসে ওঠে মনশ্চক্ষে। একটু পরে ভালোভাবেই মনে পড়ে তার কথা : খেদমতুল্লা তার জীবনের শেষভাগে কী দুর্বোধ্য তাড়নায় একটি-একটি করে যে-কয়েকজন বাঁদি ঘরে আমদানি করেছিল সে তাদেরই একজন। গ্রাম্য মেয়ে, নাক ভোঁতা, চোখ কুতকুতে, রঙ বেশ কালো। তবে মুখে-চোখে আবার কালো মিছরির মিষ্টতা। সুযোগ পেলেই হাতমুখ নেড়ে কাচের চুড়িতে ঝঙ্কার তুলে সে সোনাপুর গ্রামের মস্ত বিলের কথা বলত, ছোটবেলায় ভাইবোনে মিলে রাতের অন্ধকারে সে-বিলে নাকি মাছ ধরত। অমনি করে অনেকে মাছ ধরে, পরে ভুলেও যায়, বা সে-বিষয়ে কিছু বলার কোনো কারণ দেখতে পায় না। কিন্তু কোনো কারণে বিলে মাছ-ধরার কথা ভুলতে পারে নি সে। হয়তো মাছ ধরা নয়, যা ভুলতে পারে নি তা বিলের স্মৃতি : যে-বিলের পানি একদিন তার অন্তরে বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সে-পানি তখনো হয়তো নেবে যায় নি, সে-পানিতে তখনো তার অন্তর মাছের মতো খেলা করত। হয়তো বিলের কথা এমনভাবে তার মনে পড়ত কারণ খেদমতুল্লার সংসারে সে জাওলা মাছের মতোই বোধ করত।

মেয়েটির নাম কেন বারে-বারে শুনতে পাই তা এবার বুঝি। এবার ছেলেটির দিকেও আবার তাকাই। সাদৃশ্যটা অত্যাশ্চর্য : মৃতলোকটি যেন বালকরূপে ফিরে এসেছে। তবে মুখটা এবার ভালো করে দেখতে পাই না। কী কারণে হঠাৎ সে লজ্জা বোধ করতে শুরু করেছে বলে তার মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর, কাঁধটা উঠে এসেছে। নতমুখে সে পায়ের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে থাকে।

তবে বাপজানের কণ্ঠস্বর ততক্ষণে অতিশয় উচ্চ হয়ে উঠেছে, যে-ক্রোধ-আক্রোশ এতক্ষণ প্রকাশের পথ খুঁজে পায় নি তা দুর্বার বেগে ফেটে পড়েছে। জামাইটি একবার এক পলকের জন্যে বাপজানের দিকে তাকায়, ভাবভঙ্গি অবিচল, কেবল মনে হয় সে বাপজানের প্রচণ্ড ক্রোধ-আক্রোশের কোনো কারণ দেখতে পায় না। বস্তুত তখন আমিও ঠিক দেখতে পাই নি।

BanglaBook.org

সে-সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফার ওপর আমার দৃষ্টি পড়ে। দেখতে পাই চোখ বুজে সে কেমন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর আরেকটি জিনিস নজরে পড়ে। তার ঠোঁট কাঁপছে, প্রচণ্ড শীতে ঠিরঠির করে কাঁপার মতো। একটু পরে বুঝতে পারি, ঠোঁট দুটি কাঁপছে না, সে নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে কী বলছে, সে যেন দোয়াদরুদ পড়ছে। হয়তো তার ঠোঁটের নিঃশব্দ কম্পন দেখেই সহসা সব কিছু পরিষ্কার হয়ে ওঠে, বাপজানের কথা যা হেঁয়ালির মতো মনে হয়েছিল তা বোধগম্য হয়ে ওঠে, সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরটা কেমন শীতল হয়ে পড়ে। তখন মেঘের ভারে নুয়ে-পড়া আকাশ থেকে উচ্চ শব্দে ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু হয়তো কিছুক্ষণ সে-শব্দ কানে পৌঁছায় নি, হয়তো-বা কিছুক্ষণ কিছু দেখতেও পায় নি। মনে বারবার একটি প্রশ্নই জাগে : এ কী-ধরনের কথা বলতে এসেছে লোকটি? তারপর সহসা বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাই। মনে হয় মুষলধারে ঝরতে-থাকা বৃষ্টির শব্দ নয়, মহাপ্লাবনের গর্জন শুনছি, কোথাও মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে যে-মহাপ্লাবনে ষণ্ডাগোছের লোকটি সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ভেসে যাবে। তারপর তাদের দেখতে পাই : প্রথমে ষণ্ডাগোছের লোক দুটিকে। তারা কেমন নিশ্চল ভঙ্গিতে বসে। তারপর দৃষ্টি যায় কালু মিঞার জামাই-এর দিকে। এবার তার মুখে হয়তো অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাব ভেবেছিলাম কিন্তু তাতে অস্বাভাবিক কিছু নজরে না পড়লে বিস্মিত হই : অতি সাধারণ মধ্যবয়সী একটি চেহারা, চ্যাপটা ধরনের মাথা, ঈষৎ ভারী চোয়াল, কানের প্রান্তে মোটা কর্কশ লোম। মুখে কেমন বেজার ভাব, যেন কারো অন্যায় আচরণে সে অসন্তুষ্ট, তাছাড়া সে-মুখে কোনো অস্বাভাবিকতার বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই। তবু সে-ই কথাটি বলেছে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে দুটি ষণ্ডাগোছের লোক এবং বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে যে খেদমতুল্লার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। ছেলেটি হয়তো খেদমতুল্লারই ঔরসজাত সন্তান, তারই রক্তমাংস এবং লালসায় সৃষ্ট : তা বিশ্বাস্য। কিন্তু তা না বলে এমন একটি অবিশ্বাস্য কথা বলছে কেন? ছেলেটির মা যদি বলেই থাকে খেদমতুল্লা নয় মুহাম্মদ মুস্তফাই তার বাপ—তা কেউ বিশ্বাস করবে কেন? সে-কথাই বাপজান বারবার চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করছিল। একটু পরে জামাইটির মুখের অসন্তুষ্টির ভাবটি একটু গাঢ় হয়েছিল কেবল, তার আত্মসংযমে টোল পড়ে নি। সে শান্ত অনুচ্চ গলায় বলেছিল, সে কেবল একটি অসহায়া অবলা নারীর কথা বহন করে এনেছে। সে-ই বলে খেদমতুল্লা নয়, মুহাম্মদ মুস্তফা ছেলেটির জন্মদাতা। সত্যাসত্য বিচারালয়ে নির্ধারিত হবে, কারণ ছেলেটির মা মনস্থির করেছে ছেলেটির জন্মদাতা সন্তানের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করলে উকিল সঙ্গে নিয়ে আদালতে হাজির হবে। অনেক ন্যায়পরায়ণ দরদবান লোক তাকে সাহায্য করতেও প্রস্তুত। কিন্তু এতদিন পরে কেন, কোথায়-বা ছেলেটিকে লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন? লোকটি উত্তরে বলেছিল, এতদিন ছেলেটির এক মামা দয়াপরবশ হয়ে তার দেখাশুনা করছিল, কিন্তু কিছুদিন হল রক্তবমি করে সে ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছে, তার দেখাশুনা করার আর কেউ নেই। তাছাড়া এতদিন কারো রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবার ক্ষমতা ছিল না মুহাম্মদ মুস্তফার, এখন সেয়ানা হয়েছে, অনেক পড়াশুনা করে লায়েক হয়েছে।

বাপজান আইনকানুনের কথা বিশেষ জানত না, তবু প্রথমে আইনকানুনের কথাই সে ভাবে। যা জলজ্যান্ত মিথ্যা তা মিথ্যাই, সে-বিষয়ে কোনো তর্কের অবকাশ নেই—তা বুঝতে পারলেও আদালতের কথা বার-বার তার মনে আসে, যেন লোকটি ইতিমধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সে ভালোভাবে বুঝে নিয়েছিল যে সেদিন মুহাম্মদ মুস্তফা মুক্তাগাছি গ্রামে প্রাচীন বটগাছটির তলে দেখা দিয়েছিল বলেই ছেলেটিকে খুঁজে বের করে কালু মিঞার জামাই আমাদের বাড়ি উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু খেদমতুল্লাকে নয় তার সন্তানকে কেন ছেলেটির জন্মদাতায় পরিণত করার চেষ্টা করছে তা বুঝতে পারে নি। সে ভাবে, বাপ বেঁচে নেই বলে সৎভাইকে জন্মদাতায় রূপান্তরিত করলে ভরণপোষণ আদায় করা হয়তো সহজ এবং এমন ধরনের রূপান্তর যে অতিশয় জঘন্য তা হয়তো নীচ প্রকৃতির লোকেদের পক্ষে

BanglaBook.org

উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে সহসা সে বুঝতে পারে। সে বুঝতে পারে, কথাটি আদৌ ভরণপোষণের কথা নয়, যুক্তিতর্ক নিয়েও তারা আসে নি।

বজ্রাহত মানুষের মতো বাপজান কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে, তারপর তার দৃষ্টি যায় মুহাম্মদ মুস্তফার দিকে। ততক্ষণে বাপজানের চোখে খুন চড়েছে। উন্মাদের মত চিৎকার করে সে বলে, "চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমি মরদ না মাগী, বুকে একটু হিম্মত নাই?"

হয়তো কালু মিঞার জামাই এসে আমাদের যা বলে তা মুহাম্মদ মুস্তফাও প্রথমে সম্যকভাবে বোঝে নি; এমন কথা ছেলে কী করে বোঝে? তবে বাপজানের উক্তির পর না বুঝে উপায় থাকে না। কয়েক মুহূর্ত সে পূর্ববৎ নিমীলিত চোখে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পূর্ববৎ দোয়াদরুদ পড়ে চলে, যেন বাপজানের কথা শোনে নি। তারপর সহসা সে চোখ খুলে লোকটির দিকে তাকায়। এ-সময়ে ষণ্ডাগোছের দুটি সঙ্গী থাকা সত্ত্বেও লোকটি ঈষৎ ভীত হয়ে থাকবে, কারণ আড়চোখে সে মুহাম্মদ মুস্তফার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত কাটে।

তারপর মুহাম্মদ মুস্তফা বমি করতে শুরু করে। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই সে বসে পড়ে দেহের অভ্যন্তরে কী-একটা ভীষণ শব্দ করে-করে বমি করতে থাকে। দুপুরের আগে যা খেয়েছিল তা তখনো হজম হয় নি, সে-সব খণ্ড-খণ্ড হয়ে বেরিয়ে আসে, ন্যাক্কারজনক একটি দুর্গন্ধ ঘরে ভারি-হয়ে-থাকা গো-দেহ এবং গোবরের গন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পড়ে। আমার মনে হয়, এতক্ষণ নিঃশব্দে সে যে-সব দোয়াদরুদ পড়ছিল সে-সব দোয়াদরুদ বেরিয়ে আসছে। সে-সব কোথাও পৌঁছায় নি।

এর কিছুক্ষণ পরে ষণ্ডাগোছের দুটি লোক এবং ছেলেটিকে নিয়ে কালু মিঞার জামাই বমি-ছড়ানো স্থানটি এড়িয়ে ঘরত্যাগ করে বাড়িমুখো হয়। তখন বৃষ্টি কিছু ধরেছে।

তারপর বাপজান কিছু বলে নি। বস্তুত সহসা তার মুখের কথা শুকিয়ে যায় যেন কিছুই আর বলার নেই। এ-ও মনে হয় হঠাৎ তার মধ্যে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার কিছু আগে মুহাম্মদ মুস্তফা প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেলে সে কোনো কৌতূহলও দেখায় নি।

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যে অপেক্ষা করি, কোথায় গিয়েছে কেন গিয়েছে কী করছে—এ-সব বিষয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করতে সাহস হয় নি। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে। দক্ষিণ-ঘরে উত্তর-ঘরে যে যার বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করে, কেবল মুহাম্মদ মুস্তফার মা আমেনা খাতুন উত্তর-ঘরে এসে খোদেজাকে নিয়ে টিপটিপ করে জ্বলতে থাকা একটি পিদিমের আলোয় কাঁথা সেলাই করতে বসে। একসময়ে তাদের দিকে দৃষ্টি গিয়েছে এমন সময়ে দেখতে পাই আমেনা খাতুন তার বুক উন্মুক্ত করে খোদেজাকে নিম্নকণ্ঠে বলছে, সে-বুকের দুধ দিয়েই সে একদিন শিশু মুহাম্মদ মুস্তফার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করত। খোদেজা ঘুম জড়ানো চোখে অনেকটা নির্বোধের মতো আমেনা খাতুনের বুকের দিকে নয়, মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত।

মুহাম্মদ মুস্তফা যখন ফিরে আসে তখনো বৃষ্টি থামে নি। তবে সে-সময়ে তাকে দেখি নি; দক্ষিণ-ঘরে কে যেন অনুচ্চ স্বরে কথা বলে উঠলে বুঝতে পারি সে ফিরে এসেছে। ততক্ষণে আমেনা খাতুন দক্ষিণ-ঘরে ফিরে গিয়েছিল।

সে-রাতে মুহাম্মদ মুস্তফা কোথায় গিয়েছিল, কার সঙ্গে দেখা করেছিল, দেখা করে কী বলেছিল—এ-সব কথা কখনো সে না বললেও আমরা ঠিক অনুমান করতে পেরেছিলাম। তারপর মুক্তাগাছি গ্রামের কালু মিঞার বাড়ির দিকে থেকে আর কোনো সাড়া পাওয়া না গেলে, এবং বাপজান তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করলে অনুমানটি নিশ্চিত জ্ঞানে পরিণত হয়।

তবারক ভুইঞার মুখে একটি হাসির আভাস দেখা দিয়েছে যেন। হয়তো এতদিন পর কুমুরডাঙ্গা নামক মহকুমা শহরের মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মাস্টারনি মেয়ে সকিনা

BanglaBook.org

খাতুনের অদ্ভুত ধারণাটির কথা মনে পড়ায় তার একটু হাসি পেয়েছে। শ্রোতাদের মধ্যে সহসা কেউ সশব্দে হেসে ওঠে। হাসি ঠিক নয়, নাকে একটা আওয়াজ হয়, যে-আওয়াজ নাকে জেগে-উঠে নাকেই থেমে যায়। ততক্ষণে তবারক ভুইঞার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে।

"অদ্ভুত ধারণা, তবু তা শোনার পর কী যেন হয়, যাদের মনে মেয়েটির প্রতি ধিকিধিকি করে একটা রাগ জ্বলতে শুরু করেছিল, তাদেরই কেউ-কেউ এবার কী-যেন শুনতে শুরু করে," তবারক ভুইঞা বলে।

মিহির মণ্ডল বলে একটি লোক একদিন সকালে বলে, গভীর রাতে কী কারণে ঘুম ভেঙেছে এমন সময়ে সে শুনতে পায় নদীর দিকে একটি মেয়েলোক যেন আর্তস্বরে কাঁদছে। মিহির মণ্ডল কাপড়ের ব্যবসায়ী মোহনচাঁদের গদিতে কাজ করে; সাবধানী হুঁশিয়ার লোক, সত্যবাদী বলেও সুনাম। তবে মোহনচাঁদ তার স্বাভাবিক শ্লেষ্মাঘন কণ্ঠে হাপর-হাসি হেসে—বক্তব্যের বিষয় যাই হোক, হাসিছাড়া মোহনচাঁদকে কল্পনা করা যায় না—বলে, মানুষের জীবনে আপদ-বিপদ অসময়েই আসে, অসময়েও তাকে পথ ধরতে হয়। কে জানে, কোনো মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনে একটি মেয়েলোক নিশীথ রাতে নৌকায় সওয়ার হয়ে কোথাও যাচ্ছিল। সে-মেয়েলোকের বুকফাটা কান্নাই তার কর্মচারীটি শুনে থাকবে।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত, নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্যও বটে, কিন্তু ক-দিন ধরে মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুনও কি তেমন একটা কান্না শুনতে পায় বলে দাবি করে না?

পরদিন আরেকটি খবর শোনা যায়। সেটি এই যে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধ ঈমান মিঞা যে অন্ততপক্ষে পাঁচ বছর ঘর থেকে বের হয় নি, সে-ও একটি বিচিত্র কান্না শুনতে পেয়েছে। এত বয়সেও কানে তার দোষ-দুর্বলতা নেই, বরঞ্চ নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই বলে তার শ্রবণশক্তিটা অতি প্রখর হয়ে উঠেছে, বিড়ালের পদধ্বনিও সে শুনতে পায়। তাছাড়া, তার বাড়ি নদীর ধারে; বাড়ি এবং নদীর মধ্যে কেবল একটি কাঁঠালগাছ এবং সরু একটি পথ। নদীর কলতান, ঝড়ের সময়ে তার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের আর্তনাদ, কখনো-কখনো তার নীরবতাও সে শুনতে পায়; মধ্যে-মধ্যে নদীও জন্তুর মতো নিথর হয়ে ঘুমায়। তারপর নদীর বুক থেকে মাঝিদের কণ্ঠধ্বনি শোনে, যে-কণ্ঠধ্বনি স্থলের মানুষের কণ্ঠধ্বনির মতো নয় : দুটি কণ্ঠ ভিন্ন ধরনের। তবে নদী থেকে কখনো কোনো কান্না শোনে নি, এবং সে-জন্যে সেদিক থেকে কান্নার শব্দটি শুনতে পেলে সে বড় বিস্মিত হয়েছিল। কেউ জিজ্ঞাসা করে, কান্নাটি কেমন? কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বৃদ্ধ ঈমান মিঞার পক্ষে সহজ নয়। উত্তর দেবার চেষ্টায় তার ঠোঁট কিছুক্ষণ নড়ে, হয়তো অন্য বৃদ্ধ মানুষের মতো বর্তমান সময়ের কোনো ঘটনার বিষয়ে উত্তর দিতে গিয়ে তার মন সুদূর অতীতে উপনীত হয় বলে চোখে দূরত্বের ভাব জাগে, কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারে না। অবশেষে ঈমান মিঞা বলে, না, কান্নাটি কী রকম সে জানে না, কেবল জানে কণ্ঠটা কোনো মেয়েমানুষের, এবং আওয়াজটা নদীর দিকে থেকেই এসেছিল।

কান্নার কথাটি অবিশ্বাস করার আর যেন উপায় থাকে না; একজন নয়, দুজন নয়, তিন-তিনটে লোক শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তা শুনতে পেয়েছে। সহসা কুমুরডাঙ্গার অনেকে এবার ঘোরতরভাবে শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কে কাঁদে, কেন কাঁদে, এ কান্নার অর্থই-বা কী? এ-সময়ে কান্নাটি শুনবার জন্যে কারো-কারো মনে একটি প্রবল কৌতূহলও দেখা দেয়। হয়তো তারা ভাবে, কোথাও যদি সত্যিই কিছু শোনা যায় তবে তা নিজের কানে শুনতে পেলে তার রহস্যভেদ করতে সক্ষম হবে। অন্যের অগোচরে তারা কান্নাটি শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে শুরু করে, একা হলে একাগ্রমনা সকর্ণতার মধ্যে দিয়ে, মানুষের কণ্ঠস্বর-মুখরিত স্থানে কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকলে থেকে-থেকে সমগ্র অন্তরে নিথর-নীরব হয়ে পড়ে, রাতে শুতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘুম ঠেকিয়ে নিশ্চলভাবে জেগে থাকে।

BanglaBook.org

তাদের এই শোনার চেষ্টা বা তাদের এই অপেক্ষা ব্যর্থ হয় না, কারণ শীঘ্র একে-একে তাদের মধ্যে অনেকেরই মনে হয় তারাও কান্নাটি শুনতে পেয়েছে।

ওষুধের দোকানের রুকুনুদ্দিন বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল এমন সময়ে তার স্ত্রী সচকিতকণ্ঠে তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে সে কিছু শুনতে পাচ্ছে কিনা। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পেছনের দেয়ালের পাশে কাঁঠালগাছে অসংখ্য পাখি কলরব তুলে হয়তো সারাদিনের খবরাখবর আদান-প্রদান করতে শুরু করেছে, দূরে রাস্তায় কোনো গরুগাড়ি চাকায় ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ করে বাড়ির পথ ধরেছে, তাছাড়া চতুর্দিকে গভীর নীরবতা, কোথাও কোনো শব্দ নেই। রুকুনুদ্দিন কিছু শুনতে না পেলেও তার স্ত্রী গভীর বিস্ময়ে কী যেন শুনে চলে। তারপর আওয়াজটি আর শুনতে না পেলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কেমন এক গলায় বলে, সে যেন কী-একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল।

বাজারের পথে তার দোকানে বসে মুদিখানার মালিক ফনু মিঞা ছাদ থেকে ঝোলানো লণ্ঠনের পল্‌তেটা একটু উস্‌কিয়ে দিতে যাবে এমন সময়ে সহসা সে চমকে ওঠে। প্রথমে তার মনে হয়, কোথাও একটা সাঁ-সাঁ আওয়াজ উঠেছে। কিন্তু একটু কান পেতে শোনার পর বুঝতে পারে, আওয়াজটি যেন তীক্ষ্ণ বিলম্বিত নারীকণ্ঠের কান্নার মতো যে-আওয়াজ ক্রমশ নিকটে আসছে বা হয়তো কেবল উচ্চতর হয়ে উঠছে। অবশেষে আওয়াজটি থামলে মুদিখানার মালিক লণ্ঠনের কথা ভুলে অনেকক্ষণ নিথর হয়ে থাকে।

শহরের অন্য পাড়ায় হবু মিঞা মুহুরির স্ত্রী জয়তুনবিবি কঙ্কালসার অসুস্থ ছেলের মুখে দাওয়াই দেবার চেষ্টা করছিল। ছেলের মুখে দাওয়াই দেয়া সহজ নয়; চামচ-ভরা ওষুধ নিয়ে অনুনয়-মিনতি করছে এমন সময়ে মুহুরির স্ত্রী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে পড়ে, কারণ হঠাৎ সে শুনতে পায় অদূরে কে যেন বাঁশি বাজাতে শুরু করেছে : কেমন মন উদাস-করা করুণ সুর, তেমন উঁচু নয়। মধ্যে-মধ্যে দূরে কেউ বাঁশি বাজায়, তবে বেশ রাত হলেই বাজায়, তাও সচরাচর চাঁদনি-রাতে। মুহুরির স্ত্রী শীঘ্র বুঝতে পারে আওয়াজটা ঠিক বাঁশির মতো নয়, তাতে সপ্তস্বরের খেলা নেই, কোনো সুর নেই, বাঁশি হলেও উচ্চ একটি স্বরে যেন থেমে রয়েছে। তারপর সে চমকে ওঠে, বুকের ভেতরটা সহসা থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। তবে সে কি বিচিত্র কান্নাটি শুনছে? হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আরো দ্রুততর হয়ে উঠে তারপর সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে, মনে কী-যেন একটা দুর্বোধ্য আলোড়ন উপস্থিত হয়। তবু যা সে শুনতে পায় তা স্পষ্টভাবেই শুনতে পায়, যা বাঁশির আওয়াজ নয় নারীর-কণ্ঠের কান্নার ধ্বনি : তীক্ষ্ণ কিন্তু করুণ স্বর, গলাছাড়া আর্তনাদের মতো হলেও আবার গোপন-কান্নার মতো সংযত, অশ্রুহীন হাহাকার হলেও আবার বর্ষাসিঞ্চিত হাওয়ার মতো সজল।

সে-সন্ধ্যায় হয়তো কান্নাটি আর কেউ শোনে নি। তবে ততক্ষণে দুর্বোধ্য ব্যাখ্যাতীত কান্নাটি কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের অন্তরে পৌঁছে গিয়েছে, তা আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয় যেন। ধীরে-ধীরে অনেকে সময়ে-অসময়ে সে-কান্না শুনতে পায়, যে-কান্না কখনো বাঁশঝাড়ে হাওয়ার মর্মরের মতো শোনায়, কখনো-বা বাঁশির সুর ধরে, কখনো আবার রাতের অন্ধকারে পাখি-শাবকের কাতর আর্তনাদের মতো শুরু হয়ে অবশেষে বিলম্বিত রোদনে পরিণত হয়।

দু-দিন পরে কাছারি-আদালতের নিকটে এক-কামরার বার-লাইব্রেরিতে মধ্যবয়সী উকিল সুরত মিঞা বসেছিল। এ-ঘরে বসে কুমুরডাঙ্গার কতিপয় উকিলের মামলা-যুদ্ধের ফন্দি-কাররবাই-এর সন্ধান করে, গল্পগুজব করে, চা-সিগারেট পান করে, গা-ঢালা নিস্পন্দতায় চুপ করে থেকে আরাম করে, অথবা চতুষ্পার্শ্বের কলরব বা সামনের মাঠ থেকে জনতার যে-অশ্রান্ত গুঞ্জন ভেসে আসে সে-গুঞ্জন অগ্রাহ্য করে নিদ্রা দেয়। ঘরের এক কোণে একটি আলমারিতে ঠাসা ইংরেজ-হিন্দুদের আমলের পুরাতন আইনের বই। তবে আলমারির কাচের দরজা অনেকদিন হল ভেঙে গিয়েছে বলে সে-সব বইতে ধুলার প্রলেপ : সামনের

BanglaBook.org

ঘাসশূন্য, শুষ্ক মাঠ থেকে নিরন্তর যে-ধুলা ভেসে আসে সে-ধুলা ছোট ঘরটির সর্বত্র অবাধে বিচরণ করে একটি ঘন আবরণ ছড়িয়ে রাখে। কখনো-কখনো কেউ চৌকিদারকে ডেকে নিজের কুর্সিটা ঝেড়ে নিয়ে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করে, ঘরের অন্যত্র দৃষ্টি দেয় না; যে-সমস্যা সর্বব্যাপী তার বিষয়ে উদাসীনতাই হয়তো বুদ্ধিসঙ্গত।

তবে সেদিন সুরত মিঞার দৃষ্টি যেন পড়ে ঘরের ধুলার দিকে। তার চোখ ঘুরতে থাকে চতুর্দিকে : মেঝে, বইঠাসা কাচশূন্য আলমারি, বিবর্ণ দেয়াল, কোণে স্থাপিত সুরাহি—কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। এ-ধরনের অনুসন্ধান তার চরিত্রবিরুদ্ধ বলে শীঘ্র তা উপস্থিত সহযোগীদের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি করে; পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তো বটেই, জীবন সম্বন্ধেও সুরত মিঞা সম্পূর্ণভাবে নিস্পৃহ—যে-জন্যে কদাচিৎ মক্কেল তার শরণাপন্ন হয়।

"কী দেখছেন?" কেউ প্রশ্ন করে।

সে উত্তর দেয় না; তার চোখ পূর্ববৎ ঘুরতে থাকে। বস্তুত সে কিছু দেখবার চেষ্টা করে না, শুনবারই চেষ্টা করে; হঠাৎ সে যে-অস্বাভাবিক একটি শব্দ শুনতে পায় তা কোথেকে আসছে তাই বুঝবার চেষ্টা করে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। হয়তো ঘরের কোণে একটা ডানা-ভাঙ্গা পাখি এসে পড়েছে। বা ইঁদুর কি? কিন্তু আওয়াজটা যেন কেমন। ক্রমশ সুরত মিঞার চোখে-মুখে বিস্ময়াভিভূত ভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তারপর তাতে দেখা দেয় উপলব্ধির স্বচ্ছতা : এবার তার দৃষ্টি ধুলাচ্ছন্ন ছোট ঘরটি ত্যাগ করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘাসশূন্য মাঠ অতিক্রম করে নদীর দিকে যায়, কারণ সে-দিক থেকেই আওয়াজটি যেন আসে। সে আর দেখে না, শুধু শোনে, কী একটা কান্না শোনে। ঘরময় ততক্ষণে গভীর নীরবতা নেবেছে, যেন অন্যেরাও কান্নাটি শুনতে পেয়েছে।

এ-সময়ে কেউ আবার জিজ্ঞাসা করে,

"কী হল সুরত মিঞা?"

সুরত মিঞার চমক ভাঙে। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থেকে সজোরে মাথা নেড়ে বলে, "কিছু না।"

ডাক্তার বোরহানউদ্দিন নদীর তীরে বাস করলেও কান্নাটি নিজের কানে শোনে নি, তবে একদিন রাতের বেলায় তারই সামনে স্থানীয় স্কুলের হেডমাষ্টার তা বেশ স্পষ্টভাবে শুনতে পায়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে হেডমাষ্টারের উৎকট চিন্তা এবং প্রয়াশ নানাপ্রকার কল্পিত বা কিছু সত্য ব্যাধির দরুন গভীর মানসিক অশান্তিতে ভুগে থাকে। সে-রাতে ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার দুর্বোধ্য ব্যাধির বিভিন্ন লক্ষণের সুদীর্ঘ বিবরণ দিচ্ছে—এমন সময়ে সহসা অস্বাভাবিকভাবে সে নীরব হয়ে পড়ে। প্রথমে তার মনে হয় কানে বুঝি ঝাঁ-ঝাঁ ধরেছে; সেটি তার রোগের একটি নূতন লক্ষণ হবে। একটু অপেক্ষা করে কানে আঙ্গুল দিয়ে সে-আঙ্গুল ভীষণভাবে ঝাঁকে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না, ঝাঁ-ঝাঁ ধ্বনিটি থামে না।

তারপর সহসা সে বুঝতে পারে।

এ কি সম্ভব? তারও কি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে? ঘোর অবিশ্বাস সত্ত্বেও সে কিন্তু নিশ্চল হয়ে থাকে, ক্ষীণদেহ মানুষটির বড় ধরনের চোখ বিস্ফারিত হয়ে আরো বড় হয়ে ওঠে। তবে বিস্ময়ে নয়, ক্রোধে, কারণ সে-ও কান্নাটি শুনতে পেয়েছে মনে হলে নিজের ওপর তার ভয়ানক ক্রোধ হয়।

বোরহানউদ্দিনের দৃষ্টি লক্ষ্য করে অবশেষে ঈষৎ লজ্জা-লাল মুখে বলে, "কানেও ঝাঁ-ঝাঁ ধরে মধ্যে-মধ্যে।"

একদিন তবারক ভুইঞা বিস্মিত হয়ে তার স্ত্রী আমিরুনকে জিজ্ঞাসা করে, "কী শুনছ?"

আমিরুন মাথা হেলিয়ে শোনার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে ছিল, সচকিত হয়ে বলে, "না, কিছু শুনছি না। তবে লোকেরা যে কী কান্না শুনতে পায়, সে-কথা ভাবছিলাম।

"ওসব বাজে কথায় কান দিয়ো না।" স্ত্রী আমিরুনকে সে ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলে।

BanglaBook.org

"কিন্তু এত লোক শুনতে পায় যে।"
"কোনো রকমের কানের ভুল বা খেয়াল হবে।"
কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আমিরুন উত্তর দেয়,
"তবু কথাটায় মনটা কেমন-কেমন করে যেন।"

লোকটির দিকে একবার আড়চোখে তাকাই এবং একদা তার চেহারার যে-বর্ণনা শুনেছিলাম সে-বর্ণনার সঙ্গে তার মুখটি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। তবে বহুদিন আগে শোনা বর্ণনা থেকে একটি মানুষকে চেনা সহজ নয় : কারো চরিত্র বা মুখের চেহারা বহুদিন এক থাকে না, কালের স্পর্শ পড়ে দুটিতেই। তাছাড়া একদিন তার চেহারা-চরিত্রের যে-বর্ণনা শুনেছিলাম সে-সবের সঙ্গে সে-দিনই আসল লোকটির তেমন সাদৃশ্য ছিল কিনা কে জানে। যাকে কখনো দেখি নি যার কণ্ঠস্বর শুনি নি যার চলনভঙ্গি মুখভঙ্গি বা মুদ্রাদোষ লক্ষ্য করার সুযোগও পাই নি, পরের মুখে তার কথা শুনলে আমরা তাকে সাধারণত মনে সদা-মওজুদ মানুষ-চরিত্র সম্বন্ধে ছাঁচে-ঢালা নির্দিষ্ট কতকগুলি নকশার একটির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে লোকটি কেমন তা বুঝবার চেষ্টা করি। আমাদের সকলের মনে এমন কতকগুলি নকশা থাকে—মানুষ-চরিত্রের বিভিন্ন নিদর্শন নানাপ্রকার দোষ-গুণের প্রতীক, যা আসলে মানবজাতি সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা-মতামত ছাড়া আর কিছু নয় : আমরা কেউ মানবজাতির দিকে তাকাই আশার চোখে, কেউ নিরাশার, কেউ বিশ্বাসের চোখে, কেউ অবিশ্বাসের, কেউ প্রেমের চোখে, কেউ ঘৃণা-বিদ্বেষের; আমরা কখনো তাতে সর্বপ্রকারের দুষ্ট প্রবৃত্তি, কখনো আবার নিষ্কলঙ্ক ফেরেশতার গুণাবলি আরোপ করি। অতএব যার কথা শুনি ঠিক তাকে নয়, তার নামে আমাদের নিজস্ব মতামতই বলিষ্ঠ করি, মুষ্টিমেয় কয়েকটি নিদর্শনের মধ্যে যে সর্বচরিত্র সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে তা ভুলে গিয়ে মানুষ-চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু অনবগত নেই—সে-গর্বকে তুষ্ট করে আত্মতৃপ্তি লাভ করি। অজানা-অপরিচিত লোকটির কথা যে বলে তার বর্ণনাও দোষমুক্ত নয়, কারণ যে-মানুষ তার অন্তরপথে ঘুরে আবার বাইরে প্রকাশ পায় সে-মানুষ তার দৃষ্টিরঙে রঞ্জিত হয়ে পড়ে, নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ সততাও সে-রঞ্জন ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কেউ যখন কারো কথা বলে তখন সে কেবল তার কথাই বলে না, দশজনের কথা এবং নিজের কথাও বলে; কাউকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে বিচার করা সম্ভব নয়। বিস্ময় কী যে, যার বিষয়ে পরের মুখে শুনেছি তাকে যখন স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয় তখন দেখতে পাই কল্পনার লোকটির সঙ্গে তার সাদৃশ্য তেমন নেই, দুজন যেন ভিন্ন মানুষ।

তবে সন্দেহটি কেন আবার দেখা দিয়েছে, তা বুঝতে পারি। চেহারা বা চরিত্রের জন্যে নয়, সন্দেহ জাগে এই কারণে যে, সে এখনো একবারও মুহাম্মদ মুস্তফার নাম নেয় নি। তবে সে কি তবারক ভুইঞা নয়?

অল্পক্ষণ সন্দেহের দোলায় দুলে সে যে তবারক ভুইঞাই হবে—সে-বিশ্বাসটি আবার দৃঢ়বদ্ধ হয় আমার মনে। সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ময়টিও বাড়ে। কেন তবারক ভুইঞা মুহাম্মদ মুস্তফার নাম নেবে না তা আমার বোধগম্য হয় না। অথচ যখন কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে চরা পড়ে থাকলেও স্টিমার-চলাচল বন্ধ হবার কারণ নেই এবং শীঘ্র স্টিমার ফিরে আসবে, তখন শহরবাসীদের নির্বুদ্ধিতার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতে প্রায়ই মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে সে দেখা করতে আসত। স্টিমারঘাট বন্ধ বলে তখন সে বেকার। তার বাড়িটা ছিল মুহাম্মদ মুস্তফার সরকারি বাংলোর পশ্চাতে, সুযোগ পেলে কারণে-অকারণে এসে হাজির হত। তারপর শহরবাসীরা কী-একটা বিচিত্র কান্না শুনতে শুরু করার পর তার আসা-যাওয়াটা যেন বেড়ে যায়। ততদিনে সে মুহাম্মদ মুস্তফার চিত্ত জয় করে নিয়েছে; হাসি-খুশি সরলচিত্ত সশ্রদ্ধ, তার সুখসুবিধার বিষয়ে সদা সজাগ লোকটির প্রতি মুহাম্মদ মুস্তফার মনে কেমন একটা স্নেহভাব জেগে উঠেছিল। মনে হত তার খেদমত করার শখের অন্ত নেই যেন তবারক

BanglaBook.org

ভুইঞার। বস্তুত, একটি ইচ্ছা প্রকাশ করেছে কি অমনি তা পূর্ণ করার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেত, কোনো-কোনো সময়ে তার কী দরকার তা নিজেই লক্ষ্য করে দেখে যথাবিধি ব্যবস্থা করত।

এ-সময়ে শ্যাওলা-আবৃত ক্ষুদ্র পুকুরে খোদেজার মৃত্যুর কথা কেউ উল্লেখ করত না—না তবারক ভুইঞা না মুহাম্মদ মুস্তফা। মুহাম্মদ মুস্তফা ধরে নিয়েছিল যে খোদেজার মৃত্যু সম্বন্ধে বাড়ির লোকেদের আজগুবি কথাটা তবারক ভুইঞা বিশ্বাস করে না। তেমন কথা বিশ্বাস করা কি সহজ? কে না জানে আপন হাতে নিজের প্রাণ নেওয়া কত কঠিন। একমাত্র সন্তান হারালেও অত্যন্ত স্নেহশীলা মাতা আত্মহত্যা করে না, জীবনের শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে মর্মান্তিক শোক সহ্য করে নেয় কারণ জীবনের মায়ার চেয়ে বড় মায়া নেই, যতক্ষণ শ্বাস থাকে ততক্ষণ প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণের আশারও শেষ নেই। সে যদি বিশ্বাস করে খোদেজা আত্মহত্যা করেছিল—তাতেই-বা আপত্তি করা যায় কি? বাড়ির লোকেরাও কি তেমন একটি কথা বিশ্বাস করে না? তাছাড়া, বিশ্বাস করলেও অবাক হবার কিছু নেই। আত্মহত্যার চেয়ে অপঘাতে মৃত্যুর কথা গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হলেও মানুষের পক্ষে আপন প্রাণ নেয়া অত্যন্ত কঠিন বলে তা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি চমকপ্রদ, অনেক বেশি চাঞ্চল্যকর। আত্মহত্যার মধ্যে মানুষ সর্বপ্রধান, কিন্তু দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর মধ্যে সে কোরবানির গরু-ছাগলের মতো অসহায়। বিকৃত কোনো মানসিক অবস্থার সাহায্যে হলেও কেউ সেই চরম নিঃসহায়তার ঊর্ধ্বে উঠেছে—এমন কথা মনে আঘাত করলেও আবার চিত্তাকর্ষক। খোদেজা আত্মহত্যা করেছে তা যদি সে বিশ্বাস করে, তবে সে-জন্যেই করে।

তারপর একদিন সহসা মুহাম্মদ মুস্তফা নিজেই কথাটি তোলে কোনো কারণ ছাড়া। সে বলে, "বাড়ির লোকেদের কথাটি ভাবছিলাম। কী করে তারা তেমন একটা কথা ভাবতে পারে বুঝি না।"

তখন বেশ রাত হয়েছে। নিত্যকার মতো শুতে যাওয়ার আগে তবারক ভুইঞা নদীর ধারে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল, এমন সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফাকে দেখতে পেয়ে দু-দণ্ড আলাপ করবার জন্যে বারান্দার প্রান্তে এসে বসেছে, সিঁড়ির ধাপে পা। সহসা উত্তর না পেলে মুহাম্মদ মুস্তফা তার দিকে দৃষ্টি দেয়। অন্ধকারে তার চেহারা স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু মনে হয় উক্তিটি তার চোখে কী-একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, যেন পানির গভীরে একটা বড় গোছের মাছ সন্ত্রস্তভাবে লেজ সঞ্চালন করাতে তার সামান্য আভাস দেখা দিয়েছে পানির বুকে।

তারপর হঠাৎ তবারক ভুইঞা মাথা নিচু করে, তার চোখ অদৃশ্য হয়ে যায়।

"আমিও তাই ভাবি।"

এবার দু-জনেই নীরব হয়ে থাকে। একবার অল্প সময়ের জন্যে একটু হাওয়া ভেসে আসে নিঃস্পন্দ রাতের বুক থেকে, তার পালক-হাল্কা স্পর্শ লাগে মুখে-চোখে, রাস্তার পাশে নিমগাছের পাতায় মর্মরধ্বনি জাগে; সে-মর্মরধ্বনি যেন কিসের প্রতিধ্বনি। একটু পরে মুহাম্মদ মুস্তফা অন্ধকারের মধ্যে আবার তবারক ভুইঞার দিকে তাকায়। লোকটি তখন দূরে কোথাও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নিথর হয়ে বসে। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এমন সময় মুহাম্মদ মুস্তফার মনে একটি বিচিত্র কথা দেখা দেয়। তার মনে হয়, সে জানে তবারক ভুইঞার দৃষ্টি কোথায়, জানে সে-দৃষ্টি কী দেখছে তাকিয়ে-তাকিয়ে। তার দৃষ্টি একটি পুকুরের ওপর নিবদ্ধ। পুকুরটি শ্যাওলা-আবৃত বদ্ধ ডোবার মতো, যে-পুকুরে একটি মেয়ে ধীরে-ধীরে নাবছে। পাড় থেকে ধাপ-কাটা একটি নারকেলগাছের গুঁড়ির যে-সিঁড়ি পানির দিকে চলে গিয়েছে, সেটা বেয়ে নাবছে। এক ধাপ, দুই ধাপ—পাশাপাশি করে রাখা দুটি পায়ে সন্তর্পণে কিন্তু অনায়াসে সে নেবে যাচ্ছে অনেকদিনের অভ্যাসের ফলে। এবার তৃতীয় ধাপ। সে-ধাপের পরে কালো পানি, নিস্তরঙ্গ বদ্ধ পানি। মেয়েটি নেবেই চলে। প্রথমে হাঁটুপানি—তারপর কোমরপানি, অবশেষে বুক পর্যন্ত ওঠে সে-পানি। এবার মেয়েটি আর না নড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, দৃষ্টি কালো

BanglaBook.org

পানির দিকে। যেন তার মধ্যে দ্বিধা-সংশয় দেখা দিয়েছে, যেন এবার কী করবে তা সে ঠিক বুঝতে পারছে না, তার গাঢ় শ্যামল ক্ষুদ্র মুখাবয়বে নিথর ভাব। তারপর হঠাৎ সে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন পেছন থেকে কেউ তাকে ধাক্কা দিয়েছে, মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ নিঃসৃত হয়। শীঘ্র তার মাথা, মাথার উপরাংশ, তারপর মাথার যে-চুল পানিতে ছড়িয়ে পড়েছিল সে-চুল অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু আবার তাকে দেখা যায়, কারণ সে ভেসে ওঠে। হয়তো অল্পক্ষণ সে ভয়ানকভাবে হাত-পা নাড়ে, ভেসে থাকার চেষ্টা করে, কিন্তু ক্রমশ তার দেহ স্তব্ধ হয়ে পড়ে, কাঠের মতো, তারপর পাথরের মতো। এবং একবার তার দেহ পাথরে পরিণত হলে চোখের পলকে সে শ্যাওলা-আবৃত বদ্ধ পানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ-ভাবেই কি মানুষ পানিতে ডুবে মরে?

মুহাম্মদ মুস্তফা নিজেকে সংযত করে। তবে তার মনে হয় সহসা তার তন্দ্রাভঙ্গ হয়েছে। সে কি তার অগোচরে ঘুমিয়ে পড়েছিল? রাত্রি পূর্ববৎ নীরব, কেউ কোথাও নেই, সিঁড়ির ধাপে পা রেখে যে-লোকটি বসে—সে-ও যেন নেই। সচকিত হয়ে সিঁড়ির দিকে তাকালে সে তাকে দেখতে পায়। সেখানে শুধু যে বসে তা নয়, কেমন একটা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। সহসা মুহাম্মদ মুস্তফা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে।

"যাই, শুয়ে পড়ি গিয়ে।" আড়মোড়া ভেঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফা বলে, তৎক্ষণাৎ উঠেও পড়ে।

তবে সে-রাতে ঘুমোতে গিয়েও মুহাম্মদ মুস্তফা সহজে ঘুমাতে পারে না। বার-বার তবারক ভুইঞার কথাই তার মনে আসে। সে যে-কথা বলেছিল তা যে সত্য নয় তা বলামাত্রই বুঝেছিল, তা অপ্রত্যাশিতও মনে হয় নি। তবু সে-কথা তাকে কেমন নিপীড়িত করে যেন।

অনেকক্ষণ ঘুমের প্রতীক্ষায় নিশ্চল হয়ে-থাকার পর মুহাম্মদ মুস্তফা উঠে পড়ে। ঘরের কোণে সুরাহি থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে ঢক্‌ঢক্ করে তা নিঃশেষ করে গ্লাসটি দেয়ালের পাশে ছোট একটি টেবিলে রেখে তার ওপর অকারণে তবারক ভুইঞার স্ত্রীর হাতে তৈরি পুঁতি ঝোলানো জালিটি রাখে, পুঁতিগুলি গ্লাসের গায়ে বাড়ি খেয়ে একটু বেজে ওঠে। হয়তো সে-অস্ফুট ঝঙ্কার তাকে কী একটি কথা মনে করিয়ে দেয় সহসা। আলোর তেজ বাড়িয়ে সে বিছানায় ফিরে আসে এবং মশারির ভেতর থেকে পুঁতি-ঝোলানো জালিটির দিকে তাকিয়ে থাকে। জালিটির প্রান্তদেশ ঢেউ-খেলানো, যার ধার দিয়ে সবুজ সুতার রেখা; সেখান থেকে পুঁতিগুলি ঝোলে। জালিটি যে সযত্নে তৈরি করেছে তার কথা মুহাম্মদ মুস্তফা ভাবতে চেষ্টা করে, তবে যাকে দেখে নি তার বিষয়ে বেশি ভাবা সম্ভব হয় না। হয়তো একজোড়া কার্যনিযুক্ত হাত দেখতে পায় যে-হাত কোনো নির্দিষ্ট মানুষের নয়, হয়তো একটা ইচ্ছা বা একাগ্রতাও অনুভব করে কিন্তু সে-ইচ্ছা বা একাগ্রতা কোনো বিশেষ আকার ধারণ করে না। তাছাড়া জালিটি যে তৈরি করেছিল তার মুখ নয়, আরেকজনের মুখই সে দেখতে পায়। মুখটি তবারক ভুইঞার; তবারক ভুইঞাই জালিটি বহন করে এনে তাকে দিয়েছিল। তেমন কিছু না, ক্ষুদ্র একটি উপহার, শ্রদ্ধা-সম্মানের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন, সহৃদয়তার প্রমাণ। তাছাড়া তখন মুহাম্মদ মুস্তফা বেশ জ্বরে পড়েছে। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবহীন অবিবাহিত নিঃসঙ্গ প্রতিবেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবাযত্নের ইচ্ছাটি স্বাভাবিকভাবেই জাগে। বিছানার পাশে পানি থাকলে রোগীর সুবিধা হয়, জালি ঢাকা পাত্রে কীটপতঙ্গ পড়ে না—এই মনে করে সেটি সে এনে দিয়েছিল। জিনিসটাই-বা কী! মণিমুক্তা নয়, পুঁতির মালা দিয়ে ঘেরা হাতের তালুর আকারের একটি জালি যা তৈরি করতে আধমণ সুতার প্রয়োজন হয় নি। ইতিমধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফা এ-কথাও বুঝে নিয়েছিল যে একটি শহরের হাকিম হলে তাকে অনেক লোক অনেক কিছু দিতে চায়। এ-সবের পেছনে কখনো মোসাহেবি-তোষামুদির ভাব বা মতলব-দুরভিসন্ধি থাকে, কখনো থাকে না : কেউ সরলচিত্তে নিঃস্বার্থভাবে পদমর্যদার প্রতি সম্মান দেখায়, কেউ-বা শুধুমাত্র সামাজিক প্রথা পালন করে; হাকিম হলেও বর্তমানে সে কুমুরডাঙ্গার সমাজের একজন।

BanglaBook.org

কারো বাড়িতে গ্রাম থেকে ঝুড়িভরা আম লিচু এসেছে, কারো ঘরে ছেলের খাৎনা উপলক্ষে মিঠাই-মণ্ডা তৈরি হয়েছে, কেউ আবার বিশেষ কোনো কারণে গরু-বকরি জবাই করেছে—এ-সব বাড়ি-বাড়ি বিতরণ করা সামাজিক প্রথা। সুখে-দুঃখে একটি মানুষ আরেকটি মানুষকে স্মরণ করে—এই তো সমাজ। তাই ক্ষুদ্র জালিটির মধ্যে সে অন্যায়জনক কিছু দেখতে পায় নি। তবে এখন পুঁতির মালা দিয়ে ঘেরা জালিটির দিকে তাকাবার সঙ্গে-সঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফার মনশ্চক্ষে যে-মুখটি জেগে ওঠে সে-মুখটি হাসিখুশি সরলচিত্ত সহৃদয় তবারক ভুইঞার হলেও সহসা একটি কথা তার মনে আসে : তার সুখ-সুবিধার জন্যে লোকটির এত উদ্বিগ্নতা সেবা-যত্নের জন্যে এত তৎপরতা—এ-সবের পশ্চাতে যেন গূঢ় অভিসন্ধি। সে যেন কিছু জানতে চায়, সরলতা সহৃদয়তার মধ্যেও কোথাও এক জোড়া চোখ সর্বক্ষণ তার ওপর নিবদ্ধ যে-চোখ তার অন্তরটা তছনছ করে খুঁজে দেখে। তার মধ্যে কী সে সন্ধান করে এমন করে? নিঃসন্দেহে সে দেখতে চায় মুহাম্মদ মুস্তফা বাড়ির লোকেদের কথা বিশ্বাস করেছে কিনা, এ-কথা মেনে নিয়েছে কিনা যে খোদেজা আত্মহত্যাই করেছিল, তারপর তার মনে অনুতাপ-অনুশোচনা দেখা দিয়েছে কিনা।

সে-রাতে সর্বপ্রথম তবারক ভুইঞার মনোভাব তাকে ভয়ানকভাবে ভাবিত করে, একটি অনাত্মীয় মানুষকে ঘরের কথা বলেছে বলে নিজের ওপর রাগও হয় তার। কেন বলেছিল কথাটি, বলরার দরকারই-বা কী ছিল? মনে হয় মুখ থেকে এমনিই বেরিয়ে এসেছিল, পশ্চাতে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তবে সেটি সত্য নয়, ঠিক এমনিতে বেরিয়ে আসে নি, জ্বরঘোরে বলে থাকলেও বিলাপ বকেছিল তা নয়, যদিও জ্বরে না-পড়লে হয়তো বলতে পারত না। বলেছিল এই জন্যে যে সমস্ত ব্যাপার শোনার পর তবারক ভুইঞা কী বলে তা জানার ইচ্ছা হয়েছিল হঠাৎ। সে বাড়ির লোক নয়, এ-ধারে ও-ধারে কোনোদিকে তার টান নেই, নিঃসন্দেহে সে নিরপেক্ষ মত দেবে। মতটি যে কী হবে—সে-বিষয়েও তার সন্দেহ ছিল না, কারণ তার মনে হয়েছিল নিমেষের মধ্যেই কী সত্য কী অসত্য তা সে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। কিন্তু তা হয় নি, সব শুনেও সে বাড়ির লোকেদের পক্ষ নিয়েছে। কেন? সত্যের চেয়ে অসত্যের শক্তি কি বেশি?

তবারক ভুইঞার মনোভাব তার নিকট সর্বযুক্তিবিরুদ্ধ বলে মনে হয়। বাড়ির লোকেদের নিতান্ত ভিত্তিহীন কথাটি কেন তার বিশ্বাস হবে? অথচ সব কিছুই সে শুনেছে; সে তাকে সব কিছু খুলে বলেছে, কিছু ঢেকে রাখে নি। সে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেছে কেন বাড়ির লোকেদের ধারণাটি সত্য হতে পারে না, কেন খোদেজার পক্ষে আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। মানুষ কত কথা বলে—দায়িত্বহীন কথা, উদ্ভট অবান্তর কথা। যা প্রথমে সুনিয়ন্ত্রিত ধারার মতো শুরু হয় তা-ও এক সময়ে সহসা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বন্যার পানির মতো দু-কূল ছাপিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, সত্যের ক্ষেত্র ছেড়ে অসত্যের ক্ষেত্রে চলে যায়, বাস্তবের যুক্তিসঙ্গত সীমানা ত্যাগ করে অবাস্তবের উচ্ছৃঙ্খল অর্থহীনতার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে; প্রথমে গুঁড়ি বেয়ে শাখায় ওঠে, তারপর এ-শাখা থেকে সে-শাখা এ-ডাল থেকে সে-ডাল করে আচম্বিতে লাফিয়ে অন্য গাছে চলে যায়। মানুষের কথা কোণাকুণিভাবে চলে, ছোটে তির্যকগতিতে, যেহেতু শীঘ্র যাত্রার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে বা উদ্দেশ্যটি আর দেখতে পায় না সেহেতু কোথাও পৌঁছুতে পারে না এবং পৌঁছুতে পারে না বলে থামতেও পারে না। মানুষের কথায় যতি নেই। বিষয়বস্তু যা-ই হোক, মানুষ তার নিজের কথার বানে ভেসে যায়, কোনো ঘাটে পৌঁছুলেও কোথাও পৌঁছায় না, কারণ যেখানে থামে সেটি তার গন্তব্যস্থল নয়।

তবারক ভুইঞা কিছু বোঝে নি। কেন বোঝে নি?

তবে শেষরাতের দিকে মুহাম্মদ মুস্তফা তন্দ্রার মতো বোধ করে এবং তার অর্ধঘুমন্ত মনে অকস্মাৎ একটি প্রশ্ন দেখা দেয় : হয়তো তবারক ভুইঞা বাড়ির লোকেদের কথা বিশ্বাস করেছে কারণ সেটিই সত্য, খোদেজা আত্মহত্যাই করেছিল। চমকিত হয়ে জেগে উঠলে সহসা

BanglaBook.org

সে শুনতে পায় পাখিরা কলতান করতে শুরু করেছে। কিন্তু তা যে পাখিরই কলতান তা তার বিস্ময়াভিভূত মন অনেকক্ষণ বুঝতে পারে নি।

তবারক ভুইঞা তখনো বিচিত্র কান্নার কথাই বলছিল। সে বলছিল, তার মতো অনেকেই ভেবেছিল কান্নাটি কানের ভুল বা কোনোরকমের খেয়াল হবে কিন্তু সে-কান্না যারা শুনতে পায় তাদের সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে তেমনি কান্নার আওয়াজও দিনদিন স্পষ্টতর, উচ্চতর হয়ে ওঠে। একদিন উকিল কফিলউদ্দিন আর চুপ করে থাকতে পারে না। প্রথমে কথাটি কানে তোলে নি; আজে-বাজে কথা সহজে সে কানে তোলে না। তাছাড়া স্টিমারের সর্বশেষ চিহ্ন অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সহসা সে এমন একটি গভীর নিরাশায় সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে অন্যান্য কথায় মন দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি; ক-দিন সে কেমন নিস্পৃহ নিস্তেজ হয়ে থাকে, মুখে-চোখে বার্ধক্যের এবং পরাজয়ের গভীর শ্রান্তি।

বিচিত্র কথাটি সম্যকভাবে বুঝতে পারলে সে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে। শহরের লোকেরা কি মতিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে? তারপর হঠাৎ তার মনে একটা সন্দেহ দেখা দেয়। ওটা স্টিমারের লোকেদের কারসাজি নয় তো? যতই ভেবে দেখে ততই সন্দেহটা ঘনীভূত হয়। হয়তো তারা ধ্বনি-বিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে কোনো গুপ্তস্থান থেকে একটা কান্নার শব্দ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করার ব্যবস্থা করেছে। যন্ত্রটন্ত্র না হলেও হয়তো ঘুষ দিয়ে কাউকে সে-কাজে লাগিয়েছে। তারা কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের বিশ্বাস করাতে চায় যে বাকাল নদীটি সত্যই মরতে বসেছে এবং সে-জন্যে ঘাট তুলতে তারা বাধ্য হয়েছে, তারা নির্দোষ।

গম্ভীর কণ্ঠে উকিল কফিলউদ্দিন বার-লাইব্রেরিতে ঘোষণা করে, "ওদেরই কাজ হবে। তারা হাড়ে-হাড়ে শয়তান, নেমকহারামের দল।"

স্টিমারের লোকেরা কান্নার জন্যে দায়ী তা কেউ বিশ্বাস করেছিল কিনা কে জানে, তবে সেটা যে কোনো মানুষের দুষ্টামি নয় সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য স্বয়ং দারোগার নেতৃত্বে একদল লোক শহরের অলিগলি ঝোপঝাপ তন্ন তন্ন করে তালাশ করে দেখেছিল, কিন্তু কোথাও কিছু খুঁজে পায় নি।

এবার শহরের মোল্লা-মৌলভিরাও কান্নার বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে শুরু করে। আজগুবি কথাটি যেন সর্বমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। খোদার দুনিয়ায় নানা প্রকারের শব্দ হয়, কিন্তু সে-সব শব্দ কারো অজানা নেই, কেয়ামতের সময় যে-ভীষণ আওয়াজ একদিন সবাই শুনতে পাবে তা তাদের ভয়ানকভাবে ভীত করলেও বিস্মিত করবে না কারণ তার কথাও কেতাবে লিখিত। বস্তুত, খোদার দুনিয়ায় রহস্যের অন্ত না থাকলেও সে-রহস্যের আবার সীমা রয়েছে এবং যেখানে সে-সীমারেখা অতিক্রান্ত হয় সেখানে যা ন্যায্য বা সঙ্গত, জায়েজ বা অনুমোদিত—সে-সবেরও শেষ হয়। মানুষ যে-কান্নার সাহায্যে তার শোক-দুঃখ প্রকাশ করে থাকে, সে-কান্নার অনুরূপ যে-শব্দ শোনা যায় তার অর্থ কী, কোত্থেকেই-বা তা আসে? কিছু সভা-মজলিস আলাপ-আলোচনার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে কান্নাটি শয়তানের কারসাজি হবে : শয়তান বহুরূপী। তার স্থির করে কিছু একটা করতেই হবে যাতে কান্নাটির হাত থেকে কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা মুক্তি পায়। তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে ক্ষীণতম দ্বিধাও দূর হয় তাদের মন থেকে যখন তোবারক আলী মুন্সীর ঘোর পর্দানশীন স্ত্রী জয়নাব খাতুনের বিস্ময়কর আচরণের খবর শুনতে পায়। যে-জয়নাব খাতুন জীবনে কখনো বাইরের দরজার চৌকাঠ অতিক্রম করে নি সে-ই নাকি মধ্যরাতে বিচিত্র কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মন্ত্রমুগ্ধ মানুষের মতো নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল। মোল্লা-মৌলভিরা এবার রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়ে, আর বিলম্ব করে না। তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে আজানের ব্যবস্থা করে যাতে তার আওয়াজ শহরের সর্বত্র পৌঁছায়, প্রত্যেক শহরবাসীর কর্ণগোচর হয়। সঙ্গে-সঙ্গে মিলাদ পড়ানো বা ছদকা-শিরনি দেয়ার ব্যবস্থা করে। একদিন

BanglaBook.org

রাতে মসজিদে অনেক রাত পর্যন্ত বিশেষ নামাজেরও আয়োজন করে। তাতে শরিক হলে বিচিত্র কান্নার আওয়াজ বন্ধ হবে—এই বিশ্বাসে অসংখ্য লোক জড়ো হয় মসজিদে, অনেক রাত পর্যন্ত নামাজিদের সমবেত বলিষ্ঠ কণ্ঠধ্বনিতে রাতের আকাশ খণ্ডবিখণ্ড হয়।

তবে এ-সবের কোনো ফল হয় নি, এমনকি সেদিন রাতে নামাজে মগ্ন লোকেরাও দুর্বোধ্য, অত্যাশ্চর্য কান্নাটি ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি, প্রবল ঢেউয়ের মতো তা বার-বার এসে তাদের হৃদয়-তটে আছড়ে পড়েছিল। বিস্ময়-বিমূঢ় একজন নামাজি বলেছিল, এত মানুষের কণ্ঠধ্বনিও সে আওয়াজ ঢেকে রাখতে পারে নি।

নিঃসন্দেহে কোথাও কে যেন কাঁদে—তা কি আর অবিশ্বাস করা যায়? অবিশ্বাসটি ধীরে-ধীরে কমজোর হয়ে ওঠে, অবিশ্বাসীদের কণ্ঠস্বর সন্দেহের দোলায় দুর্বল হয়ে পড়ে, কেউ-কেউ আবার তা নীরবেই সহ্য করতে শুরু করে যেমন দুঃখকষ্টে মতিভ্রষ্ট মানুষের যুক্তিহীন বিলাপ অসহ্য মনে হলেও অনেকে নীরবে সহ্য না -করে পারে না। হয়তো তাদের মনে হয়, রহস্যময় দুনিয়ার সব কিছু তারা জানে না। হয়তো সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে সব মানুষের মনে একটি আশা লুকিয়ে থাকে যে হঠাৎ একদিন অলৌকিক কিছু দেখতে বা শুনতে পাবে; সে-আশাটিই হঠাৎ জেগে ওঠে। কাল্পনিক খাদ্যে মানুষের যেমন পেট ভরে না, তেমনি যা ধরতে পারে না ছুঁতে পারে না চোখ দিয়ে দেখতে সক্ষম হয় না—তাতে বিশ্বাস রেখেও মানুষের চিত্ত ভরে না।

যে-কান্না এত মানুষ শুনতে পায় সে-কান্নার কথা সত্যি অবিশ্বাস করা আর সম্ভব নয়; সে-কান্না সত্যের রূপই গ্রহণ করে—এমন একটি সত্য যা ব্যাখা করা যায় না। অবিশ্বাস করা যায় না বলে ভয়টিও বাড়ে, মনের গভীর আশঙ্কাটি ঘনীভূত হয়। কে কাঁদে? মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন যে-বিস্ময়কর কথাটি বলেছিল তা সবাই যথাসময়ে শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু তা কী করে সম্ভব হয়, নদী কী করে কাঁদে? এমন কথা বিশ্বাস্য কি অবিশ্বাস্য তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলাই নিছক বোকামির মতো মনে হয়। মানুষের মতো যৌবনকাল, তারপর প্রৌঢ়বয়স বার্ধক্য অতিক্রম করে একটি নদী মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে কিন্তু মানুষের মতো কাঁদবার ক্ষমতা রাখে না, ব্যথা, বেদনা প্রকাশ করতে পারে না, মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হলেও ক্ষীণতম প্রতিবাদ জানাতে পারে না, যে-দুটি তীরের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করেছে অবিচ্ছিন্ন একাত্ম ঘনিষ্ঠতায় সে-দুটি তীরের দিকে তাকিয়ে বিদায়কালে অস্ফুট নিঃশ্বাসও ত্যাগ করতে পারে না; নদীর পক্ষে কাঁদা সত্যি সম্ভব নয়। কিন্তু কে কাঁদে, কোথায় সে-কান্নার উৎপত্তি, কোন ব্যথাক্লিষ্ট খিদ্যমান হৃদয় থেকেই-বা তা ধ্বনিত হয়? এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে বুকের ভেতরটা শীতল হয়েই-বা ওঠে কেন? তা যদি শয়তানের কারসাজি হয়ে থাকে তবে খোদার নামও তার বিচিত্র ধ্বনি স্তব্ধ করতে পারে নি কেন? একদিন কারো মনে ভয়ঙ্কর একটি কথা এসে দেখা দেয়। প্রথমে মুখ ফুটে বলতে সাহস পায় নি, অবশেষে সহ্য করতে না পারলে সে বলেই ফেলে। বিস্ফারিত নেত্রে অস্ফুটকণ্ঠে বলে, হয়তো খোদাই কাঁদেন তাঁর বান্দার জন্যে। কিন্তু তেমন কথাতেই-বা কেউ শান্তি পাবে কেন? যিনি বিশ্বচরাচর চাঁদ সূর্য তারা পাহাড়-পর্বত সাগর-সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন, তিনিই যদি কাঁদতে শুরু করেন তবে মানুষের কী হবে, কোথায়-বা সে শক্তি পাবে?

হয়তো সকিনা খাতুনের বিচিত্র কথাটি বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না শেষপর্যন্ত। যে-প্রশ্নের উত্তর পায় না, দুর্বোধ্য কান্নার চেয়ে সে-প্রশ্নই অবশেষে তাদের নিকট অধিকতর ভয়জনক মনে হতে শুরু করে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার অন্য কোনো পথ তারা দেখতে পায় না, এবং মরিয়া হয়ে তারা অসম্ভব কথাটিই গ্রহণ করে : নদী কাঁদে, যে-কান্না শুনতে পায় তারা সে-কান্না মরণোন্মুখ নদীর বেদনার্ত শোকাচ্ছন্ন অন্তর থেকেই জাগে। এমন একটি কথা বিশ্বাস করা দোষণীয় হতে যাবে কেন? মানুষ কত কিছুতে বিশ্বাস করে, প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও কত কিছু সে বিনাপ্রশ্নে সত্য বলে গ্রহণ করে। বিশ্বাসের সীমা-সীমান্ত নেই।

BanglaBook.org

"মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে ঠিকই বলে। কে আর কাঁদবে, নদীই কাঁদে। নদী মরতে বসেছে না?" কাছারি-আদালতের সামনে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় চা-এর দোকানের সামনে একটি টুলে বসে টাউট মনিরুদ্দিন সহসা অনেকটা আপন মনে বলে ওঠে। পেটের দায়ে টাউটগিরি করলেও লোকটি পরহেজগার মানুষ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, দিন গুণে রোজা রাখে। কথাটি স্বাভাবিকভাবে বলে এবং শোনামাত্র স্বাভাবিক মনে হয়। তাইতো, কে আর কাঁদবে অমনভাবে? এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে বাকাল নদীটি মরতে বসেছে। মরণোন্মুখ নদীটিই কাঁদে রাতদিন। এই সাধারণ কথা এতদিন তারা বিশ্বাস করতে চায় নি কেন?

যে-প্রশ্ন কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের মনে অজানা ভয়ের সৃষ্টি করত তার একটি উত্তর পেয়ে তারা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, সহসা তাদের মনে হয় যে-বিচিত্র কান্নাটি তারা শুনতে পায় তার পশ্চাতে ভয়াবহ কিছু নেই। যে-নদীর দিকে কখনো তাকায় নি সে-নদী এবার তার অশ্রুতে তাদের অন্তর ভাসিয়ে দেয় প্রবল বন্যার মতো, মনে-প্রাণে যে-গভীর স্বস্তি বোধ করে তা নদীর ব্যথায় আর্দ্র হয়ে ওঠে, অকস্মাৎ তাদের এ-ও মনে হয় তারা এমনই একটি দুঃখের সম্মুখীন হয়েছে যার তুলনায় মানুষের দুঃখ নিতান্ত তুচ্ছ : যে-নদী দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সময়-কাল উপেক্ষা করে যুগযুগ ধরে প্রবাহিত হয়েছে সে-নদীর ব্যথা-বেদনার সামনে মানুষের নিদারুণ দুঃখও এক ফোঁটা অশ্রুমাত্র, একটি অশ্রাব্যপ্রায় দীর্ঘশ্বাস কেবল।

এবার আরেকটি বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে। যে-কান্নার শব্দ এক সময়ে তাদের ভয়ানক ভীত করত সে-শব্দেই তারা অপরূপ ভাববেগে অভিভূত হয়ে পড়তে শুরু করে।

একদিন দর্জি করিম বক্স বেশ রাত করে লণ্ঠনের আলোয় পুরাতন সেলাই-এর কলে ঘরঘর আওয়াজ তুলে সীবনকর্মে নিয়োজিত ছিল এমন সময়ে তার মনে হয় কোথাও যেন একটি বাণবিদ্ধ পাখি তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করছে। সেলাই-কাজ বন্ধ করে সে মনোযোগ দিয়ে শোনে, কারণ আওয়াজটি যে পাখির আর্তনাদ নয় তা বুঝতে তার দেরি হয় না। আওয়াজটি অবশেষে থামে, আহত পাখিটি যেন ডানা মেলে উড়ে গিয়ে দূর আকাশে চলে যায়। তার রেশটি কানের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে কি অমনি অত্যাশ্চর্য ধরনের অনুভূতিতে দর্জি করিম বক্সের মন-প্রাণ আপ্লুত হয়ে পড়ে। তার মনে হয়, দীর্ঘদিনের নির্বর্ষণের ফলে শুষ্ক উত্তপ্ত হয়ে-ওঠা জমির মতো প্রাণে স্নিগ্ধশীতল পানি এসে পৌঁছেছে যে-পানি ধীরে-ধীরে সমগ্র অন্তরে প্রবাহিত হয়ে তৃষ্ণা তো দূর করছেই, সমস্ত ময়লা-আবর্জনাও ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে কুচিন্তা হিংসাবিদ্বেষ ক্ষোভদুঃখ আফসোস।

যা শুনতে চাইত না, শুনলে ভয় পেত, তা-ই শুনবার জন্যে কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা অধীর হয়ে ওঠে সহসা। এমনকি, অনেকের কাছে তা শুনতে পাওয়া এক পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে হয় এবং অধীরচিত্তে শুনবার জন্যে অপেক্ষা করার পরও কিছু শুনতে না পেলে তাদের এই ধারণা হয় যে কোনো অজানা কারণে তা শোনার যোগ্য নয় তারা। অনেকে আবার তা শোনে নি স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করে বলে শুনেছে বলেই দাবি জানাতে শুরু করে বিবরণে কিছু রঙ লাগিয়ে; তাদের ভয় হয় অলঙ্কারশূন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণে দাবিটির সত্যতা সম্বন্ধে শ্রোতার মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। ফলে বিচিত্র কান্নার রূপ যেমন ক্রমশ বিচিত্রতর হয়ে ওঠে তেমনি কে শুনেছে কে শোনে নি—এ-বিষয়ে আর নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে কারো দাবি সত্য নয় মনে হলেও কেউ প্রশ্ন করে না : কান্নাটি যেন এমনই এক স্তরে উপনীত হয়েছে যেখানে মানুষের বিশ্বাস অসীমের সঙ্গে মিশে যায়, দিক্‌চক্রবাল পেরিয়ে নির্ভয়ে অজানার সন্ধান করে কিন্তু পশ্চাতে দৃষ্টি দেয় না। বস্তুত কান্নাটি এক রকমের বিশ্বাসে পরিণত হয়; বিশ্বাসীর বিশ্বাসে সন্দেহ বা প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

নদীর দিক থেকে কী-একটা কান্না শুনতে পায়—তা কল্পনা হোক, কোনো প্রকারের ভ্রম হোক, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এ-সময়ে শহরবাসীদের মধ্যে একটি বিষম পরিবর্তন এসে

BanglaBook.org

গিয়েছিল। দারোগা-পুলিশ হাকিম-সুবারা পরিবর্তনটি লক্ষ্য করেছিল, লক্ষ্য করে গভীরভাবে বিস্মিতও হয়েছিল, কারণ এ-সময়ে চুরি-ডাকাতি কমে গিয়েছিল, কাছারি-আদালতের সামনে ঘাঘু মামলাবাজদের ভিড়টাও পাতলা হয়ে উঠেছিল, এমন কি দু-একজন লোক সহসা বিপক্ষদলকে ক্ষমা করে বহুদিনের পুরানো মামলা পর্যন্ত তুলে নিয়েছিল। শত্রুরা তাদের শত্রুতা ভুলে গিয়েছিল, মানুষের মধ্যে অচিন্তনীয় ধরনের স্নেহপ্রীতি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল বা লম্পট-চরিত্র মানুষের দুরাত্মপনায় ভাটা পড়েছিল—এ-সব সত্য, কল্পনা নয়। এ-সময়ে মানুষেরা সুখের কথাও ভাবতে পারে নি। দু-একটি পরিবার তাদের সন্তানসন্ততির বিয়ের পাকা ব্যবস্থা পর্যন্ত ভেঙ্গে দিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে নদীর দুঃখের সময়ে সন্তানসন্ততির সুখের কথা ভাবা অন্যায়।

"এ-সব সত্যিই ঘটেছিল", তবারক ভুইঞা বলে।

মুহাম্মদ মুস্তফার কী হয়েছিল জানি না। হয়তো বাড়ির লোকেরা যা বলেছিল তা বিষের মতো দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ধীরে-ধীরে তার বুদ্ধিমত্তা, বিবেচনাশক্তি দুর্বল করে ফেলেছিল, হয়তো শত সাক্ষ্যপ্রমাণ সত্ত্বেও কোনো বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারে না বলে দশজন যা বলেছিল তাই অবশেষে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল সে। অথবা খোদেজা নয়, অন্য কোনো কারণ ছিল যা তার অতীত জীবনের গহ্বরে লুক্কায়িত ছিল। এবং যা সে-ও বোঝে নি, আমিও বুঝি নি। কারণ যাই হোক, নানা অকাট্য যুক্তি দিয়ে গঠিত সুরক্ষিত যে-বাঁধের সাহায্যে বাড়ির লোকেদের ভিত্তিহীন ধারণাটি ঠেকিয়ে রেখেছিল তা তারই অগোচরে ক্রমশ হীনবল হয়ে উঠে থাকবে এবং তবারক ভুইঞার ন্যায় নেহাৎ পরিচিত একটি লোকও বাড়ির লোকেদের মত পোষণ করে এই ধারণা হলে বালুর তৈরি জিনিসের মতো সেটি অতি সহজে ধসে পড়ে : যা এতদিন একেবারে অসত্য মনে হয়েছিল তা-ই সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার চোখে অবিসংবাদিত সত্যের রূপ গ্রহণ করে।

খোদেজা আত্মহত্যা করেছিল—তা আমি কখনো বিশ্বাস করি নি। এ-কথা সত্য যে মেজো চাচা খেদমতুল্লা একদিন একটি ওয়াদা করেছিল, কিন্তু মানুষ কত সময়ে কত কিছু-না ওয়াদা করে। করে, কারণ সামনের পথ সে দেখতে পায় না, জানে না অদৃশ্য ভবিষ্যতে কার জীবন কী রূপ নেবে, কোন খাতে প্রবাহিত হবে। কল্পনায় সুদূর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখালেও সে-ভবিষ্যতের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না, খরধার স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে-থাকা নৌকা যেমন হঠাৎ পেছন-মুখো হয়ে ঘুরে যায় তেমনি তার দৃষ্টি পশ্চাতের দিকে ফিরে আসে। ততদিনে খেদমতুল্লার মনে ছেলের বিষয়ে একটি উচ্চাশা দেখা দিয়ে থাকলেও তার পক্ষে ভবিষ্যৎটি পরিষ্কারভাবে দেখা সম্ভব ছিল না, সে ভাবতে পারে নি যে বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের মতো মুহাম্মদ মুস্তফা গ্রাম্যজীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সত্যিই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না। তেমনটা কি অসম্ভব ছিল? আমার বড় ভাই সোনা মিঞা কী করেছে? চাঁদবরণঘাটে গিয়ে মুড়িমুড়কির দোকান দিয়েছে। সে মুহাম্মদ মুস্তফারই সমবয়সী। ছোট চাচার একমাত্র সন্তান এবং নয়নের মণি হাতেম অলস বাপের পদাঙ্কানুসরণ করে জাত-আল্‌সেতে পরিণত হয়েছে, অন্নচিন্তাও তার কাছে শ্রমসাধ্য মনে হয়। আমিও অসময়ে পড়াশুনা বন্ধ করতে বাধ্য হই, যদিও দুই ক্রোশ হেঁটে পুকুরের ধারে দি মোসলেম খান হাই স্কুল নামক বিদ্যালয়ে বেশ কয়েক বছর যাতায়াত করেছিলাম এবং আরেকবার চেষ্টা করলে হয়তো ম্যাট্রিক পাস দিতে পারতাম। ইচ্ছা ছিল, হয়ে ওঠে নি। মনে হয় দরিদ্র পরিবারে যাদের জন্ম তাদের জন্যে আর্থিক বিপত্তির চেয়ে আরেকটি জিনিস বিষম অন্তরায় সৃষ্টি করে। সেটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে পশ্চাতে ফেলে যাওয়ার বিষয়ে দ্বিধা। জন্মদাতা যা পড়ে নি বা দেখে-শোনে নি তা পড়তে বা দেখতে-শুনতে দ্বিধাই হয় এবং একদিন ঘরে ফিরে দেখবে জন্মদাতা একটি নেহাৎ অজ্ঞমূর্খ মানুষ—তা ভাবতেই কোথাও যাবার সাধ নিমেষে স্তিমিত হয়। হয়তো মুহাম্মদ মুস্তফাও তেমন

BanglaBook.org

একটি বাধা বোধ করেছিল। যদি সে সে-বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং একমনা দৃঢ়সংকল্প নিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে বহুদূরে চলে গিয়ে থাকে, তার কারণ ছিল; দলবদ্ধ নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে থেকে সহসা একটি নক্ষত্র যদি ছিটকে অন্য কোথাও চলে যায় তার পশ্চাতে কোনো একটা কারণ থাকেই। তার ক্ষেত্রে কারণটি ছিল তার বাপ খেদমতুল্লা যার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ছায়া থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যেই এমন করে সে ধেয়ে চলে গিয়েছিল। হয়তো সে কোনো একটা পণও করেছিল—যে-পণ এমনভাবে তার সমস্ত চিন্তাধারা সমস্ত জীবন গ্রাস করেছিল যে একদিন তার বাপ সদ্য স্বামীহারা বোনের দুঃখে দুঃখিত হয়ে কী বলেছিল তা স্মরণ করে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। এবং সঙ্কল্প-দৃঢ় একাগ্রচিত্ত অনন্যমনা মুহাম্মদ মুস্তফার মুখের দিকে তাকিয়ে এক সময় অন্যেরা, এমনকি খোদেজাও সে-বিষয়ে আর ভাবতে সাহস পায় নি। একসময়ে আমারও মনে হত, বাইরে দেখা না গেলেও হয়তো মুহাম্মদ মুস্তফা এবং খোদেজার মধ্যে বুঝি একটি স্নেহমমতার বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে, হয়তো তারা কী-একটা অদৃশ্য কিন্তু গভীর যোগাযোগ বোধ করে। কিন্তু একদিন নিজেই বুঝতে পারি ধারণাটি সত্য নয়।

তবে সে-সময়ে আরেকটি কথাও বুঝতে পারি যা আমাকে বড় বিস্মিত করে। হয়তো আসলে সে জন্যেই খোদেজা যে মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যে আত্মহত্যা করেছিল তা কখনো বিশ্বাস করতে পারি নি।

তখন ভরা গ্রীষ্ম, মুহাম্মদ মুস্তফা ছুটি উপলক্ষে বাড়ি এসেছে। সে-সময়ে আর্থিক সমস্যায় বাপজান বড় বিব্রত, তার ওপর গ্রামের ছদু শেখ নামক সমবয়সী একটি লোক বেশ পয়সার গরম দেখাতে শুরু করেলে হিংসা বা ব্যর্থতাবোধের দরুন তার মনে সুখ ছিল না। কোনো প্রকারের সমস্যা-বিপত্তির সম্মুখীন হলে বাপজানের মেজাজ তিরিক্ষি ধরনের হয়ে ওঠে, খেদমতুল্লার মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বছর ধরে যে নিদারুণ মেজাজ তার চরিত্রগত হয়ে পড়েছিল অনেকটা সে-রকম হয়ে ওঠে বাপজানের মেজাজ। তখন পান থেকে চুন খসলে সে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে, নির্দোষীর সরল চেহারাও তার সহ্য হয় না, কেউ সামনে এলে ধমক খায়, আড়ালে গেলেও রেহাই পায় না। বস্তুত তার দাপটে-হুঙ্কারে-তর্জনে বাড়ির সকলের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম ঘটে। কী কারণে, খুব সম্ভব অকারণেই, একদিন দ্বিপ্রহরে বাপজান সর্বসমক্ষে খোদেজাকে ভয়ানক বকাবকি করে অবশেষে তার চুল ধরে টেনে দু-চারটে চড়-থাপড়ও লাগায়, এবং তারপর ভরা দুপুরে রোদ-মাথায় কোথাও বেরিয়ে যায়। প্রথমে খোদেজা টুঁ শব্দ করে নি, তবে বাপজান বেরিয়ে গেলে বাড়ির পশ্চাতে লেবুগাছটার তলে বসে কাঁদতে শুরু করে চিকন কণ্ঠে, কী-একটা নিঃসঙ্গ ব্যথায়। তখন খোদেজার বয়স পনেরো কি ষোলো। গায়ের রঙ গাঢ় শ্যামল, মাথাভরা চুল। মুখটা যেন কদাচিৎই দেখা যেত, কারণ সব সময়ে সে এ-কাজে সে-কাজে নুয়ে থাকত। যা চোখে পড়ত তা তার সিঁথি যা কখনো ভাঙ্গত না অসংযত হত না যদিও তাতে চিরুনির স্পর্শ লাগত না তেমন; লম্বা ধরনের মাথায় পেছন থেকে শুরু হয়ে সে-সিঁথি নৌকার ছই-এর মতো বাঁকা হাল্কা কেশগুচ্ছবেষ্টিত ছোট কপালে এসে শেষ হত। কথাও তেমন বলত না। শুধু সে-সময়ে তার কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যেত যখন সে উঠানের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য-হয়ে-যাওয়া হাঁস-মোরগ-মুরগিদের ডাকত, তাঁর মিহি গলায় স্নেহমিশ্রিত অন্তরঙ্গতার ভাব; হাঁস-মোরগ-মুরগির সঙ্গে সে একটি গভীর মিতালি বোধ করত। ক্বচিৎ কখনো পিতৃহীনা মেয়েটি মুখ তুলে তাকালে তার ঈষৎ অসমান চোখদুটির বিষাদছায়া নজরে পড়ত; দুঃখের কোনো প্রতিকার নেই—আপনা থেকে জেগে ওঠা এমন একটি জ্ঞান থেকে সৃষ্টি সে-বিষাদ অল্পবয়সেই তার চোখে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছিল।

খোদেজা কাঁদতেই থাকে : অনুচ্চকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতার মধ্যে একটি বিষণ্ন সুরের সৃষ্টি করে। আমি কিছুটা বিস্মিত হই, কারণ বাড়ির মেয়েরা যেমন গোস্বা-আহ্লাদ করে না তেমনি এমনভাবে কাঁদেও না। এ-সব কেউ সহ্য করে না, এ-সবের

BanglaBook.org

সময়ও নেই। দুনিয়া বড় কঠিন জায়গা। নানা প্রকারের দায়িত্ব এবং দুঃখকষ্টে নিপীড়িত বিড়ম্বিত মুরুব্বিরা কখনো হঠাৎ রাগের মাথায় বকাবকি বা মারধর করে কারো মনে যদি দুঃখের সৃষ্টি করে তা গাছের পাতার ওপর বৃষ্টির ফোঁটার মতোই ক্ষণস্থায়ী হয়; সে-সব কেউ মনে ধরে রাখে না, অন্তর্বেদনার বিষয়ে বিস্মৃত হয়ে অন্তহীন সাংসারিক কাজকর্মে পুনরায় মনোনিবেশ করতে দেরিও করে না। তবে সহসা আমার মনে হয়, খোদেজার অস্বাভাবিক আচরণের কারণ বুঝতে পেরেছি। মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যেই আড়ালে গিয়ে অমনভাবে কাঁদছে সে, তাকেই তার ব্যথা-অপমানের কথা জানাচ্ছে। তাকে না জানিয়ে কাকে জানাবে, কেই-বা তাকে সান্ত্বনা দেবে, তার চোখের পানি মুছে দেবে?

মানুষের কল্পনা বিচিত্র জিনিস, একবার তা লাগাম হারালে পথে-বিপথে কোথায় যে চলে যায় তার ঠিক নেই। আমার এবার মনে হয় : খোদেজার প্রতি যতই উদাসীন হোক না কেন, বাপদত্তা মেয়েটির কান্নায় তার অন্তরে কোথাও সুপ্ত স্নেহমমতা নিশ্চয়ই উথলে উঠেছে, এবং শীঘ্র সে বেরিয়ে আসবে, তারপর উঠান অতিক্রম করে বাড়ির পেছনে গিয়ে স্নেহভরে খোদেজাকে প্রবোধ দেবে, মিষ্টি কথা বলে ব্যথা-বেদনা দূর করবে। মুহাম্মদ মুস্তফা ততক্ষণে দক্ষিণ-ঘরে গিয়ে কঞ্চি দিয়ে ঠেলে অর্ধউন্মুক্ত করে রাখা জানালার পাশে তার বিছানার ওপর বই-খাতাপত্র নিয়ে বসেছে। সে-ঘরের জানালার দিকে নয়, দরজার দিকে তাকিয়ে আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, বুকটা কেমন দুরুদুরু করে কাঁপে। আমার আরো মনে হয়, বাড়ির সবাই আমারই মতো অপেক্ষা করছে, তারাও জানে মুহাম্মদ মুস্তফা চুপ করে খোদেজার কান্না শুনে যাবে না। মুহাম্মদ মুস্তফা বেরিয়ে আসছে না কেন? বাড়ির সবাই যে রুদ্ধশ্বাসে চোখ খুলে কান পেতে অপেক্ষা করছে—তা বুঝতে পেরে হয়তো সে সঙ্কোচবোধ করতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু সে বেরিয়ে আসবে, তার অন্তরে খোদেজার জন্যে যে-স্নেহমমতা উথলে উঠেছে তাতে সে-সামান্য সঙ্কোচ ভেসে যাবে।

মুহাম্মদ মুস্তফা বেরিয়ে আসে নি।

তারপর কী কারণে জানি না আমিই সহসা যন্ত্রচালিতের মতো হাঁটতে শুরু করি এবং শীঘ্র উঠান অতিক্রম করে বাড়ির পশ্চাতে গিয়ে হাজির হই। বাড়ির পশ্চাদ্‌দেশ স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে থাকা বাতাবি লেবুগাছটির তলে হাঁটুতে মাথা গুঁজে খোদেজা তখনো কাঁদছিল। বালিকা বয়সে সে-গাছের তলে বসে খোদেজা একা-একা খেলত। হয়তো সেখানে কল্পনার প্রাসাদ তৈরি করত, যে-প্রাসাদের কক্ষে-কক্ষে কত রাজপুত্র সখা-সখী এসে ভিড় করত। লেবুগাছের তলে ক্ষুদ্র একটি স্থান লেপেমুছে সাফ করে নিয়েছিল। স্থানটি এখনো যেন তকতক করে।

ঝোঁকের মাথায়, কী করছি তা না বুঝে খোদেজার সামনে উপস্থিত হলেও কয়েক মুহূর্ত কেমন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর কিছু বলেছিলাম। কী বলেছিলাম তা মনে নেই। হয়তো বলেছিলাম, আর কেঁদো না, ঘরে চলো। আমার কণ্ঠস্বর শুনে খোদেজা সহসা মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

সে-সময়েই বুঝেছিলাম। কখনো অতি সাধারণ কথা বুঝতে মানুষের কষ্ট হয়, আবার কখনো একটি বেশ দুর্বোধ্য কথা কী-কারণে নিমেষেই বুঝে ফেলে। তার জন্যে এক পলকের দৃষ্টি, ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘশ্বাস, ঈষৎ একটি মুখভঙ্গিই যথেষ্ট। হয়তো বুঝতে পেরেছিলাম অন্য একটি কারণে। বাল্যকাল অবধি আমিও কি খোদেজার প্রতি একটা বিশেষ স্নেহমমতা অনুভব করতাম না?

আমরা কখনো অন্যায়জনক কিছু করি নি। বস্তুত, তার দিকে তাকাতে আমার সাহসও হত না। সে উঠান দিয়ে যাচ্ছে বা কিছু করছে—তা কী করে জানতাম, তাকাতাম না। এ-ও জানতাম, না তাকিয়ে খোদেজাও জানে আমি কোথায়, কী করছি। বাড়ি থেকে কোথাও গেলে বুকটা কেমন করত, তবে কী একটা তৃপ্তিই পেতাম এই নিশ্চিত জ্ঞানে যে, আমি বাড়ি নেই

BanglaBook.org

বলে সে সুখী নয়। পরে বাড়ি ফেরবার জন্যে অধীর হয়ে পড়তাম এবং বাড়ি ফিরলে কী করে বুঝতে পেতাম সে-ও আমার প্রত্যাবর্তনের জন্যে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করেছিল। আমি প্রতিশ্রুতিটির কথাও কখনো ভুলতে পারতাম না; হয়তো প্রতিশ্রুতিটি কেবল আমার মনেই মহাসত্যের রূপে বিরাজ করত। ভাবতাম, মুহাম্মদ মুস্তফা খোদেজার প্রতি উদাসীন হলেও যথাসময়ে তাকে বিয়ে করবে, উপযুক্ত সময়ে যা তার প্রাপ্য তা দাবি করবে। তাদের একদিন বিয়ে হবে না—তা যেমন ভাবতাম, তেমন চাইতামও না।

মুহাম্মদ মুস্তফার উদাসীনতার কথা ভালোভাবে জানলেও মধ্যে-মধ্যে খোদেজার বিষয়ে একটি সন্দেহ জাগত মনে। বাগদত্তা মেয়ের মনের কথা কি বলা সহজ? হয়তো সে মুহাম্মদ মুস্তফার প্রতি গোপনে-গোপনে কী একটা ভাব পোষণ করে যা ছেলেখেলার জিনিস নয়, যা অন্তঃসলিলার মতো অদৃশ্য। তবে তার মৃত্যুর মাসকয়েক পূর্বে খোদেজা কিছু বলে যার পর বুঝতে পারি সে-ধারণাটিও অহেতুক।

তখন অগ্রহায়ণ মাস, কাটা-ধান মাড়ানো-ধানের গন্ধে বাড়ি-ঘর, মাঠ-ক্ষেত মাতোয়ারা। সেদিন সন্ধ্যায় পেছনের পুকুরের পাড় দিয়ে ঘরে ফিরছিলাম, এমন সময়ে কাচের চুড়ির মৃদু ঝঙ্কার শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। দেখি, খোদেজা। অনুচ্চ, বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি, "কী করছ এখানে?"

ততক্ষণে নিজেই বুঝে ফেলেছিলাম যে গতকাল থেকে যে-সাদা মুরগিটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সে-মুরগিটি খুঁজতে এসেছে পুকুরের পাড়ে। সেখানে বুনো ফুলের বন, কিছু ঝোপঝাড়। তার বিশ্বাস বন-ঝোপঝাড়েই মুরগিটি লুকিয়ে রয়েছে কিসের ভয়ে। আমিও একটু খুঁজে দেখি, কিন্তু কোথায় মুরগি? বলি, "শেয়ালে খেয়েছে।"

হঠাৎ খোদেজা হাতে মুখ ঢেকে একটু শব্দ না-করে কাঁদতে শুরু করে। আমি কয়েক মুহূর্ত অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকি, তারপর সহসা কী যেন ঘটে। হয়তো শীতের সন্ধ্যার গন্ধ নাকে এসে লাগলে মনে কী-একটা ভাবের সৃষ্টি হয়, হয়তো আবছা অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য-হয়ে-যাওয়া মুরগির ব্যথায় ব্যথিত মেয়েটির জন্যে বুকে বেদনা বোধ করি বা বাড়ির এত কাছে হলেও নির্জন পুকুরের পাড়ে সহসা মনে হয় খোদেজা এবং আমি ছাড়া সমগ্র দুনিয়ায় কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ তার হাত ধরে তাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু নিজেই সহসা কী-একটা উত্তাল ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ি। খোদেজাও এবার অসংযতভাবে কাঁদতে শুরু করে। এবারও কান্নার আওয়াজ শোনা যায় না, তার মুখও দেখা যায় না, কেবল সমগ্র দেহে সে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

তারপর কথাটি বলে। প্রথমে বুঝতে পারি নি, তার মুখের শব্দ, তার কান্না এবং দেহ-কম্পনের মধ্যে কেমন হারিয়ে গিয়েছিল।

'কী বললে?'

"মুস্তফা ভাইকে বড় ভয় করে।"

আমি বড় বিস্মিত হই : সাদা রঙের অদৃশ্য-হয়ে-যাওয়া মুরগি এবং মুহাম্মদ মুস্তফা তার মনে যে-ভাব জাগায়, এ-দুটির মধ্যে কী সম্বন্ধ? তারপর মনে হয়, যা বলেছে তা নয়, অন্য কোনো কথা আমাকে জানানো তার উদ্দেশ্য, কারণ মুহাম্মদ মুস্তফাকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করি,

"আমাকে ভয় করে না?"

সজোরে মাথা নেড়ে সে উত্তর দেয়,

"না।"

অনেক কথা হয়তো তাকে জিজ্ঞাসা করার বা বলার বাসনা জেগেছিল তখন, তবে আমি নির্বাকভাবে প্রস্তরবৎ মূর্তির মতো নিথর হয়ে থাকি, শুধু কোথাও কিছু ভয়ানকভাবে বাড়ি খেতে থাকে। হয়তো বুকচাপা কথা, হয়তো হৃৎপিণ্ড—কে জানে। গভীর নীরবতার মধ্যে

BanglaBook.org

পুকুরে কী-একটা অশ্রান্ত মাছ ঘাই দেয়।

তারপর বলি, "যাও।" ভয় হয়, কখন কেউ এসে পড়বে।

খোদেজা চলে গেলে বাড়িতে না-ঢুকে পুকুরের ওপারে গিয়ে অনেকক্ষণ তেঁতুল গাছের নিচে বসে থাকি। যখন উঠি তখন টুপটুপ করে শিশির ঝরতে শুরু করেছে।

খোদেজা মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যে আত্মহত্যা করেছে—তেমন কথা কী করে আমি বিশ্বাস করি?

অথচ সে-কথাই মুহাম্মদ মুস্তফার সহসা সত্য বলে মনে হয়, বিনিদ্র চোখে রাত কাটাবার পর সকালের দিকে তাতেই তার বিশ্বাস জন্মে।

পরদিন সে বড় বিষণ্ন বোধ করে, কী-একটা অস্থিরতাও তাকে থেকে-থেকে নিপীড়িত করে। তার মনে হয়, বাড়ির লোকদের কথাটি অস্বীকার করার সত্যি আর কোনো উপায় নেই। কী করে অস্বীকার করে তাদের কথা? প্রথমত, একজোট হয়ে সকলে একটি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা কাহিনী রচনা করেছে তা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এও সম্ভব নয় যে মেয়েটি যতই গোপনকারী হোক না কেন, যারা রাতদিন তার সঙ্গে বসবাস করেছে তারা তার মনের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি। বস্তুত মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু লক্ষ্য না করলেও তারা সব লক্ষ্য করেছিল, সব জানতে পেরেছিল। মেয়েটি যে প্রতিশ্রুতির কথা ভোলে নি শুধু তাই নয়, তাতে সমস্ত আস্থা-ভরসা স্থাপন করেছিল। মানুষের মন অবুঝ। পিতৃহীনা, আশ্রিতা মেয়েটির সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সব স্বপ্ন স্নেহমমতা পরজীবী উদ্ভিদের মতো মুহাম্মদ মুস্তফাকে ঘিরে গজিয়ে উঠেছিল, তাকে জড়িয়েই বেঁচেছিল, সে মুহাম্মদ মুস্তফার যোগ্য কিনা বা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে তার প্রতি কোন স্নেহমমতা ছিল কিনা—সে-সব প্রশ্ন একবারও তার মনে জাগে নি। সরলমনা মানুষ কিছুতে একবার বিশ্বাস করলে সে-বিশ্বাসে কোনো প্রশ্নের ক্ষীণতম তরঙ্গও জাগে না; সে-বিশ্বাস নিরেট, নিশ্ছিদ্র।

অনেক কথা সহজে সে বুঝতে সক্ষম হয়। বাড়ির লোকেরা যা লক্ষ্য করেছিল বা জানতে পেরেছিল—তা সে লক্ষ্য করে নি কেন, জানতে পারে নি কেন? কারণটা আর কিছু নয় : সে লক্ষ্য করতে চায় নি, জানতে চায় নি, ইচ্ছা করেই চোখ বুজেছিল সে। মেয়েটির দিকে কখনো তাকায় নি এই ভয়ে যে তার চোখে অনুচ্চারিত বিশ্বাসটি দেখতে পাবে, স্নেহমমতার আভাস নজরে পড়বে। প্রতিশ্রুতিটির কথা স্মরণ করতে সাহস পায় নি এই কারণে যে সে জানত প্রতিশ্রুতিটি কখনো রক্ষা করবে না। তবে হয়তো সে-বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। সেজন্যে বাড়ি আসবার সময় প্রতিবার খোদেজার জন্যে সে টুকিটাকি জিনিস নিয়ে আসত যেন প্রতিশ্রুতির কথা সে ভোলে নি, যথাসময়ে তা রক্ষাও করবে। তাই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করত না—তা সত্য নয়। তবে স্মরণ করত এ-জন্যে যে কীভাবে তা ভাঙতে পারে, কী করে তার হাত থেকে নিস্তার পেতে পারে—এসব নিয়ে তার চিন্তার অবধি ছিল না। তেমনি খোদেজার দিকে কখনো তাকাত না—তা-ও সত্য নয়। সে তাকাত, তবে তাকাত স্নেহমমতা নিয়ে নয়, কোনো আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয়, শুধু এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে যে অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়েটি সত্যি তার জীবন-সঙ্গিনী হবার যোগ্য নয়; তার অযোগ্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হবার জন্যেই মধ্যে-মধ্যে চকিতে আড়চোখে তার দিকে দৃষ্টি দিত, এবং অযোগ্যতা সন্ধান করত বলে তার অগোচরেই সর্বপ্রকার দোষঘাট দেখতে পেত হয়তো খোদেজার মধ্যে।

মুহাম্মদ মুস্তফার মনে হয়, সবকিছুই সে সহসা বুঝতে পেরেছে।

শ্রোতাদের মধ্যে কেউ সহসা জিজ্ঞাসা করে,

"আপনি নিজের কানে কিছু শুনেছিলেন?"

তবারক ভুইঞা উত্তর দিতে ঈষৎ দ্বিধা করে, তারপর বলে, "না, আমি নিজে কিছু

BanglaBook.org

শুনি নি। তবে অনেকের সত্যিই মনে হয়েছিল তারা কিছু শুনতে পায়।" একটু থেমে সে আবার বলে, "কিন্তু কানে শোনাই কি বড় কথা?"

"তারপর কী হয়েছিল?" লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করে।

"উকিল কফিলউদ্দিনই গোলমাল বাধায়।"

একদিন উকিল কফিলউদ্দিন স্থির করে, তার পক্ষে কুমুরডাঙ্গায় বাস করা আর সম্ভব নয়। তার মনে হয়, যে-শহরে আজীবন বসবাস করেছে সে-শহরই যেন তার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অথচ একদিন কত-না আশা-ভরসা নিয়ে এই শহরে ওকালতি শুরু করেছিল। তারপর কঠিন শ্রম-অধ্যবসায়ের ফলে ধীরে-ধীরে পেশায় নাম-যশ করতে সক্ষম হয়, সমাজের শীর্ষেও একটি বিশেষ স্থান দখল করে। সে-সময়ে এই আশাটিও দেখা দেয় যে একদিন কুমুরডাঙ্গারও উন্নতি হবে, সুনাম হবে। হয়তো আশাটি একেবারে নিঃস্বার্থ ছিল তা নয়, কিন্তু একটি মানুষ যে-স্থান তার কৃতকার্যতার পটভূমি বলে গ্রহণ করে নেয় তার জন্যে সে-স্থান কি অনেকটা আত্মীয়স্বজনের মতো নয়? একটি মানুষের কৃতকার্যতা যতই চমকপ্রদ হোক-না কেন, আত্মীয়-স্বজন দারিদ্র বা বিফলতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকলে তার কৃতকার্যতা সম্পূর্ণ হয় না, বরঞ্চ তা তাদের অসার্থকতায় নিয়ত ছায়াচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অকৃতকার্য আত্মীয়-স্বজন কৃতকার্য মানুষের সম্মান রক্ষা করতে পারে না যেমন মাটির ভোজনপাত্র মোঘলাই খানার মর্যাদা দিতে পারে না। তবে কারণ যাই হোক, কুমুরডাঙ্গা শহরের উন্নতির জন্যে আগ্রহ-উদ্যম-সহকারে সে কত কিছু-না করেছে। তারই উদ্যোগে শহরে মিনারগম্বুজ শোভিত সুদৃশ্য একটি মসজিদ উঠেছে, মেয়েদের জন্যে একটি মাইনর স্কুল বসেছে, কাছারি-আদালতের সামনে একটি ক্লাব-ঘরের পত্তন হয়েছে যেখানে শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায় সন্ধ্যার পর তাস দাবা খেলে গল্পগুজব করে সংবাদপত্র-মাসিকপত্র নেড়েচেড়ে সময় কাটাতে পারে। সে-ই খেলাধুলার প্রতি শহরবাসীদের মন আকৃষ্ট করেছে এবং মরহুম ওয়ালেদের নামে যে-ফুটবল টুর্নামেণ্টের প্রচলন করেছে তাতে প্রতিবছর আশেপাশের নানা জায়গা থেকে বিভিন্ন খেলোয়াড় দল এসে সোৎসাহে যোগদান করে। এ-অঞ্চলে প্রতি বছর মড়ক লেগে গৃহপালিত জীবজন্তু পালে-পালে ধ্বংস হত। সে-ই সরকারের কাছে জোরদার দাবি জানিয়ে কুমুরডাঙ্গায় পশু-ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছে। তবে এ-সব নয়, যা নিয়ে সত্যি সে গর্ব করতে পারে তা এই যে, তারই কড়া দৃষ্টির জন্যে শহরের নৈতিক চরিত্রের যেমন উন্নতি হয়েছে তেমনি সর্বপ্রকারের অনাচার-অনিয়ম শাসনে থেকেছে। কোনো সরকারি ডাক্তার বা দারোগা উৎকোচ-গ্রহণের ঈষৎ দুর্বলতা দেখাবামাত্র সে কুমুরডাঙ্গা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, কোনো হাকিম-মুনসেফের ন্যায়জ্ঞান বা নিরপেক্ষতা আদর্শনীয় মনে না-হলে সে-ও এ-শহরে বেশিদিন টিকতে পারে নি। তবে এত কিছু করেও একটি জিনিস উকিল কফিলউদ্দিন ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় নি : কুমুরডাঙ্গার অবনতি। তার চোখের সামনে ধীরে-ধীরে অনিবার্যভাবে শহরটি কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। হয়তো একবার কোনো শহরের ভিতে ঘুণ ধরলে ফুটবল খেলে স্কুল-ক্লাব বসিয়ে অবনতির মারাত্মক কীটের ক্রম-অগ্রসর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তবু সে কখনো আশা ছাড়ে নি, চতুর্দিকে অবনতির স্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পেলেও এই দৃঢ়বিশ্বাসে দিন কাটিয়েছে যে কোনো অত্যাশ্চর্য উপায়ে শহরটি সহসা জীবিত হয়ে উঠবে, তার ভাটা-পড়া স্রোতে জোয়ার আসবে, কোনো যাদু-যষ্টির স্পর্শে রূপকথার ঘুমন্তপুরীর মতো অকস্মাৎ জেগে উঠবে। সে-সব কিছু হয় নি, বরঞ্চ যে-টুকু অবশিষ্ট ছিল তা-ও শেষ হয়েছে এবং কুমুরডাঙ্গা এবার যেন মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন করেছে। এমন শহরে যশ-সুনামের মূল্য কী, সার্থকতারই-বা অর্থ কী?

তবে উকিল কফিলউদ্দিন সাহেব নিজেই বুঝতে পারে, এ-কারণেই যে সে স্থির করেছে কুমুরডাঙ্গায় আর থাকা সম্ভব নয়—তা নয়। আসল কারণ অন্য কিছু। সে-টি এই যে, হঠাৎ যদি মওতের ডাক এসে পৌছায় তবে তার আদুরে মেয়ে হোসনার মুখ না-দেখেই তাকে

BanglaBook.org

শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে। মৃত্যুর কথা সে ভাবতে ভালোবাসে না, তবু তার মনে হয় এবার না ভেবে উপায় নেই, এবং একবার তা ভাবতে শুরু করলে হোসনার স্নেহময় দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করার সম্ভাবনা সহসা তাকে ভয়ানকভাবে সন্ত্রস্ত করে তোলে। তারপর অকূল সমুদ্রের মধ্যে নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত মানুষ যেমন সে-দ্বীপ ত্যাগ করার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে তেমনি কুমুরডাঙ্গা ছেড়ে চলে যাবার জন্যে উকিল সাহেব অধীর হয়ে ওঠে।

কফিলউদ্দিন ঝোঁকের মানুষ : একবার কিছু ঠিক করলে ভালো-মন্দ বড় একটা ভাবে না। তাছাড়া যে-শহরে সে দীর্ঘদিন কাটিয়েছে, যে-শহর তার জন্মস্থান—সে-শহর ছেড়ে যাওয়ার পথে কোনো বাধাও দেখতে পায় না। কিসের বাধা? সে ভাবে, সে উকিল, যেখানে সে যাক-না কেন তার সঙ্গে যাবে আইনের বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান, ওকালতির ক্ষেত্রে তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। সে আর যুবক নয়, যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য নেই, কিন্তু সে-সবের বদলে পেয়েছে জ্ঞান অভিজ্ঞতা। সুনামও-বা কম কী—যে-সুনাম কুমুরডাঙ্গাতেই সীমাবদ্ধ নয়; সদরেও লোকেরা তাকে চেনে। সেখানে একবার গিয়ে বসলে দেখতে-না-দেখতে তার পসার গড়ে উঠবে। পসার না হলেও ক্ষতি কী? সাংসারিক সব দায়িত্ব শেষ হয়েছে ভালোভাবেই। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছেলে দুটিও আর তার মুখাপেক্ষী নয়। এক ছেলে ঢাকায় ডাক্তারি করে, আরেক ছেলে ভালো সরকারি চাকরি নিয়ে এ-স্থানে সে-স্থানে ঘুরে বেড়ায়। তারা দুটি মাত্র মানুষ, সে এবং তার স্ত্রী, তাদের পসার বা পয়সার কোনোটারই প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তাদের দু-জনেরই জীবন দিগন্তের দিকে হেলে পড়েছে : বাকি কয়েকটি দিনের জন্যে অত ভাবনা কী?

একবার দ্রুতসঞ্চারী একখণ্ড মেঘের ছায়ার মতো একটি কথা দেখা দেয় তার মনে। সে-টি এই যে, কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের প্রতি তার কি কোনো দায়িত্ব নেই? কিন্তু কথাটি মনে আসতেই সে আপন মনে রেগে ওঠে, যেন শহরবাসীদের কেউ প্রশ্নটি তুলেছে। দায়িত্ব আবার কিসের? সে কি সারা জীবন তাদের খেদমত করে নি, তাদের উন্নতির জন্যে ভালোর জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নি, নিজের চিন্তা ছেড়ে তাদের চিন্তায় কত সময়ে বিনিদ্ররজনী কাটায় নি? তাছাড়া সমাজ বা ধর্ম যা দাবি করতে পারে তার কাছ থেকে সে-দাবি অনুযায়ী অক্ষরে-অক্ষরে সে তার কর্তব্য পালন করেছে। তাদের প্রতি দয়ামায়া বিবেচনা দেখিয়েছে, সাহায্য করেছে নানা উপায়ে, পাই-গণ্ডা হিসেব করে ছদ্‌কা জাকাৎ দিয়েছে, ফকির-মিসকিন খাইয়েছে। এর বেশি কেউ তার কাছে দাবি করতে পারে না—না ধর্ম না সমাজ।

তবে একটি কথা বেশ কিছুক্ষণের জন্যে তাকে কেমন বিষণ্ন করে তোলে। কুমুরডাঙ্গা ছেড়ে গেলে সে-শহরে তার সমস্ত পদচিহ্ন সহসা শেষ হয়ে যাবে না কি? হয়তো সেটা এক রকমের মৃত্যুই হবে যে-মৃত্যুর মধ্যে তার এতদিনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এত আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধ-স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যে-জীবন গড়ে তুলেছে সে-জীবনে অকস্মাৎ যতি পড়বে, দীর্ঘকাল ধরে যে-একটি পথরেখা সৃষ্টি করেছে সে-পথরেখা থেমে যাবে আকস্মিকভাবে। একবার বিষণ্ন ভাবটি এমন ঘনীভূত হয়ে ওঠে যে তার মনে হয় জীবিত অবস্থাতেই সে যেন তার মৃত্যুশোকে সমাকুল হয়ে পড়েছে। তবে শীঘ্র সে মনের বিষণ্ন ভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। মনকে আশ্বস্ত করে এই বলে যে, কখনো-কখনো মানুষের জীবনে আচম্বিতে যতি পড়ে, যা নিতান্ত অটল-অনড় মনে হয় তাও নিমেষে চোরাবালিতে পরিণত হয়, নদীর যে-তীরে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মানুষ স্নেহমমতার এবং আশ্রয়ের নীড় বাঁধে সে-তীরও হঠাৎ নদীগর্ভে অদৃশ্য হয়ে যায়। মানুষ তখন সুপরিচিত পথঘাট ছেড়ে বুকে কিছু ক্ষোভ ব্যথা বেদনা নিয়ে কিন্তু আবার নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নূতন পথ ধরে।

উকিল কফিলউদ্দিন অতিশয় ব্যস্তসমস্ত হয়ে যাবার উদ্যোগ-আয়োজন করতে শুরু করে, এবং তার প্রাসাদসম বাড়ির প্রথম মালিকের অনুকরণেই গ্রামের বাড়ি থেকে বিশ্বাসী

BanglaBook.org

কিন্তু অলসপ্রকৃতির একটি ভাইপোকে ডেকে পাঠায় শূন্য বাড়িটা পাহারা দেবার জন্যে। এবার কারো জানতে বাকি থাকে না যে উকিল কফিলউদ্দিন কুমুরডাঙ্গা ত্যাগ করে যাবে। তবে কেন একটি লোক বৃদ্ধবয়সে নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে—তা কেউ বুঝত পারে নি। তাদের কেমন মনে হয়, কী-একটা অজানা কারণেই যেন সে কুমুরডাঙ্গায় আর থাকতে ভরসা পাচ্ছে না।

একদিন দুপুরে উকিল কফিলউদ্দিন যখন সস্ত্রীক ঘাটে এসে উপস্থিত হয় ততক্ষণে সেখানে বিস্তর লোকের সমাগম হয়েছে। ইতিমধ্যে ভাড়া-করা একটি বজরা এবং একটি গয়না নৌকায় মালপত্র চড়ানো হয়েছিল। সংক্ষিপ্তভাবে বিদায় নিয়ে খোদার নাম উচ্চারণ করে উকিল কফিলউদ্দিন বজরায় উঠতে যাবে এমন সময়ে সর্পদষ্ট মানুষের মতো পা তুলে নেয় সে। কিছুক্ষণ সে বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এদিক-ওদিক তাকায় যেন কোথাও কিছু সন্ধান করে, তারপর কেমন স্তব্ধ নিথর হয়ে পড়ে। এবার ঘাটের সমবেত লোকের মনে হয়, নদীর দিকে তাকিয়ে সে যেন কী শুনছে। ক্রমশ তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, তারপর সমস্ত মুখ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। অবশেষে অদৃশ্য কোনো হিংস্র জন্তুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যেই যেন আবার ক্ষিপ্রভঙ্গিতে বজরায় উঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু এক পা মাত্র উঠিয়ে সহসা বেসামাল হয়ে ধরাশায়ী হয়—দেহের অর্ধেক পানিতে অর্ধেক জমিতে। কেউ যখন তাকে তুলবার চেষ্টা করে তখন উকিল কফিলউদ্দিনের ধড়ে আর প্রাণ নেই।

উকিল কফিলউদ্দিন নূতন একটি পথ ধরতে সক্ষম হয় বৈকি, কেবল সে-পথ জীবিতদের জানা নেই, সে-পথের ব্যথা-বেদনা বা আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা নেই।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে আবার রোদ ঝলমল করে উঠলে মুহাম্মদ মুস্তফা আপিস অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ে। কিছুদূর গিয়েছে এমন সময়ে পথে একটি ক্ষীণতনু নারীমূর্তি দেখতে পেলে সে চমকে ওঠে। মাথার ওপর নত করে রাখা একটি মস্ত কালো ছাতার জন্যে মুখটি ঠিক দেখতে পায় না, তবু তার মনে হয় সে যেন খোদেজা : একই শারীরিক গঠন, একই হাঁটার ভঙ্গি, চিবুকের যে-অংশটি নজরে পড়ে তাও মৃত মেয়েটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সাদৃশ্য তাকে ভয়ানক বিস্মিত করে, এবং নিষ্পলক দৃষ্টিতে ধীরপদে এগিয়ে-আসতে-থাকা মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে। এমনভাবে কোনো মেয়েমানুষের দিকে কখনো তাকায় নি বলে সে লজ্জা বোধ করে কিন্তু তবু দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে না। শীঘ্র তার দিকে তাকিয়ে থাকতে তেমন বাধেও না, কারণ তার মনে হয় যে-মেয়ে দেখতে ঠিক খোদেজার মতো তার দিকে তাকালে ক্ষতি নেই। তাছাড়া, ক্ষতি আছে কি ক্ষতি নেই, কাজটি ঠিক কি বেঠিক—এ-সব ভাবা হয়তো সম্ভবও হয় না; মানুষের পক্ষে সব সময়ে ন্যায়-অন্যায়ের কথা ভাবা সম্ভব কি?

মেয়েটি ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসে, হাঁটার ভঙ্গিটা ঈষৎ মাজা-ভাঙা ধরনের। ছাতার নিচে গভীর ছায়া, ছায়ার বাইরে উজ্জ্বল সূর্যালোক। ছায়ার মতো, মরীচিকার মতো সে এগিয়ে আসে মুখশূন্যভাবে। যতই নিকটে আসে ততই সে কেমন অস্পষ্ট হয়ে ওঠে : মুহাম্মদ মুস্তফা কেবল একটি আকার দেখতে পায়।

তবু এক সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফা তাকে চিনতে পারে। প্রখর সূর্যালোকের মধ্যে কালো ছাতার নিচে যাকে ছায়ার মতো একটি অস্পষ্ট আকারের মতো দেখতে পায় সে কি মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে নয় যে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে, যে সর্বপ্রথম কী-একটা বিচিত্র কান্না শুনতে পেয়েছিল, এবং বাজারের পথে যাকে নিয়ে একদিন কী একটা ঘটনাও ঘটেছিল? সেদিন কে যেন মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

তবে তাকে চিনতে পারলেও সে নিরাশ হয় না, যেন একই মেয়ের পক্ষে দুটি ভিন্ন মানুষ হওয়া সম্ভব, যেন একটি সত্য হলে আরেকটি সত্য হবে না তার কোনো মানে নেই।

BanglaBook.org

ছাতার তলে ছায়াটি নাচে, অস্পষ্টতা থেকে থেকে শূন্যতার মধ্যে মিলিয়ে যায়। তবে ছাতাটি ভেসেই থাকে স্রোতের ওপর ভাসমান বৃক্ষপল্লবের মতো। মেয়েটি আরো এগিয়ে আসে, পূর্ববৎ ধীর-মন্থর গতিতে, নিঃশঙ্কচিত্তে। দু-জনের মধ্যে এখন কয়েক গজের ব্যবধান মাত্র।

নিজেরই অজান্তে মুহাম্মদ মুস্তফা কখন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একবার সে নড়বার চেষ্টা করে কিন্তু তা নিদ্রাচ্ছন্ন স্বপ্ন-দেখতে-থাকা মানুষের চেষ্টার মতো কোনো ফল প্রদান করে না; তার নড়বার ক্ষমতা নেই, সে যেন মাটিতে শিকড় গেড়েছে। বুকে হৃৎপিণ্ড প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়। মেয়েটি আরো কাছে এসে পড়লে তার সান্নিধ্য হাওয়ার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো কিছু সৃষ্টি করে এবং তারই সূক্ষ্ম কণা সহস্র ধারায় অদৃশ্যভাবে মুহাম্মদ মুস্তফাকে আঘাত করে; সে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে সে যখন বুঝতে পারে পেছনের দিকে ছাতা হেলিয়ে মেয়েটি বিস্ময়ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তখন সে সহসা সমগ্র মনে একটি ভয় বোধ করে, কারণ তার মনে হয় কী-একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটবে। একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটেও। কোথাও সে একটি প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পায়, ক্ষণকালের জন্যে মনে হয় সে রোষমত্ত বজ্রনিনাদ শুনছে। তবে তার অতিশয় ভীতবিহ্বল মনও আওয়াজটি চিনতে পারে : প্রচণ্ড শব্দটি অদূরে একটি বাড়ির টিনের ছাদে বৃষ্টি পড়ার শব্দ, যা শিলাবৃষ্টির মতো উচ্চ-উৎকট আওয়াজ ধারণ করেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবল বৃষ্টি নেবেছে মেঘশূন্য আকাশ থেকে বর্ষণের মতো। চমকিত হয়ে ওপরের দিকে তাকালে বড়-বড় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির পানি সোজাসুজি মুহাম্মদ মুস্তফার চোখে প্রবেশ করে এবং সহসা সে যেন দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য শীঘ্র দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে, মেয়েটিকে আবার দেখতে পায়, তবে স্পষ্টভাবে নয়, এবং এবার তার মনে হয় মেয়েটি যেন একটি ঝর্নাধারার ওপাশে দাঁড়িয়ে। মুখটি ঠিক দেখতে পায় না, দেখতে পায় কেবল এক জোড়া স্থির চোখ। মানুষের চোখ সদা ঘোলাটে, সদা অপরিচ্ছন্ন, মানুষের চোখ যখন নির্ভাবনায় শূন্য হয়ে থাকে তখনো স্রোতহীন পানির মতো পঙ্কিলতায় ঘনীভূত হয়ে থাকে। তবে মেয়েটির চোখ যেন পরিস্রুত, সর্বদোষ বিনির্মুক্ত। এমন চোখে আবার ক্রোধ-বিদ্বেষ পরিষ্কারভাবেই ধরা পড়ে। তার চোখে যেন ক্রোধ-বিদ্বেষ, হয়তো-বা ঘৃণাও।

ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ে, তবে কেমন নিঃশব্দেই পড়ে যেন; কোথাও যেন কোনো শব্দ নেই, অদূরে টিনের ছাদও যেন নীরব। মেয়েটিকে সে আর দেখতে পায় না, কারণ ততক্ষণে হয়তো বৃষ্টির জন্যে হয়তো কোনো কারণে আপনা থেকেই তার চোখ নিমীলিত হয়ে পড়েছে।

মুহাম্মদ মুস্তফা তখনো মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে—এমন সময় সাইকেলে করে একটি লোক হুড়মুড় করে প্রায় তাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে; বোধহয় প্রবল বৃষ্টির জন্যে সে তাদের দেখতে পায় নি। তাছাড়া কুমুরডাঙ্গা শহরে সাইকেলের তেমন প্রচলন নেই বলে যারা সাইকেল ব্যবহার করে তারা অনেকদিন চালিয়েও দুটি মাত্র চাকার ওপর দেহভার রক্ষা করার কায়দাটি কখনো করায়ত্ত করতে পারে না, এবং তাই তারা সামনের চাকার দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কেমন সর্পিলভঙ্গিতে অগ্রসর হয়; হয়তো তাদের ধারণা সামনের চাকাটির ওপর চোখ না রাখলে সেটি সহসা অবাধ্য ঘোড়ার মতো কোথাও ছুটে পালিয়ে যাবে।

সচকিত হয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা লোকটির দিকে তাকায়, এবং সহসা তার চমক ভাঙ্গে বলে ঘোর বৃষ্টির মধ্যেও তাকে চিনতে পারে; সাইকেলের আরোহী কাছারির প্রসেস সার্ভার আবদুল গনি।

প্রসেস সার্ভার আবদুল গনি কয়েক মুহূর্ত অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে এক পা অর্ধচক্রাকারে ঘুরিয়ে ঝুপ্ করে সিটে বসে প্রথমে বেসামালভাবে, তারপর অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে কিন্তু বেশ দ্রুতগতিতে প্রস্থান করে।

নিজের আচরণে নিজেই ভয়ানকভাবে বিস্মিত হয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা কাছারিতে হাজির হয়। কিছু সংযত হলে সে লজ্জা বোধ করে। তার মনে হয়, অপরিচিত মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

াকার খবর প্রসেস সার্ভার আবদুল গনির মারফতে ইতিমধ্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং া নিয়ে সকলে বলাবলি করতে শুরু করেছে। খারাপটাই সর্বপ্রথম মানুষের মনে আসে। কে ানে কীভাবে প্রসেস সার্ভার আবদুল গনি খবরটি বিতরণ করেছে এবং নানা মুখে কী রঙ না াড়েছে তাতে। তবে লোকেরা কী বলাবলি করছে তা নয়, তার নিজের আচরণ আবার তাকে চিন্তিত করে। এর অর্থ কী? তাছাড়া এবার সে বুঝতে পারে, যে-মেয়েটির মধ্যে খোদেজার াদৃশ্য দেখতে পেয়েছিল সে তাকে কেমন ভীতিবিহ্বল করে তুলেছিল। তার অর্থই-বা কী?

সে কিছু বুঝতে পারে না। তবে শীঘ্রই এসব চিন্তা জোর করে মন থেকে দূর করে। এবার তার স্মরণ হয় বন্ধু তসলিমের চিঠির কথা। ক-দিন ধরে চিঠিটা পকেটে নিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত জবাব দেওয়া হয় নি। চিঠিটা বের করে পড়ে আরেকবার। তসলিম লিখেছে : স্টিমার বন্ধ হবার জন্যে এবং তারপর ভয়ানক জ্বরে পড়ার জন্যে তোমার যে আসা হয় নি তা আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন। তবু তোমার বিয়েতে দু-দু'বার বাধা পড়েছে। সব কিছু বুঝলেও তিনি যেন সন্তুষ্ট নন, মনে যে খট্‌কা লেগেছে, সহসা যেন প্রথম বার বিয়ে স্থগিত রাখার কারণটি এখন আর বুঝতে পারছেন না; একবার মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দিলে পূর্বের নির্দোষ ঘটনাগুলিও সন্দেহের উদ্রেক করে থাকে। সে-দিন বলেই ফেলেছিলেন : হ্যাঁ, বাপ-মা ভাইবোন অন্য কথা, কিন্তু ফুফাতো বোনের মৃত্যুর জন্যে বিয়ের পাকা দিন ভাঙ্গার কথা কখনো শোনেন নি। থেকে-থেকে এ-ও বলছেন, এবার বিয়ের দিনটা তাঁর পীরের উপদেশ নিয়েই স্থির করবেন। পীর আবার এ-দেশে থাকে না, তার বাস ভাগলপুর না বহরমপুর এমন কোনো জায়গায়। সত্য বলতে কী, লক্ষণটা ভালো মনে হচ্ছে না। আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেবকে তেমন দোষও দেয়া যায় না। মেয়ের বিয়ের ধার্য দিন দু-দু'বার ভাঙতে হয়েছে বলে লোকেরা নানা কথা তুলতে পারে—এই ভয়েও চিন্তিত হয়ে পড়বেন তা আশ্চর্য কী। তোমার সত্বর আসা দরকার, সামনাসামনি বাতচিত হলে তাঁর মনের সব খট্‌কা দূর হবে।

তসলিমের চিঠির উত্তর দেয় নি কেন? সে যা লিখেছে তা অতিশয় ন্যায্য, আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেব অনেক সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন যার জন্যে কৃতজ্ঞতা বোধ না-করেও পারা যায় না। আর বিলম্ব করা সত্যিই সমীচীন হবে না। যা হবার হয়ে গিয়েছে, তা আর শোধরানো যাবে না। খোদেজা তারই জন্যে আত্মহত্যা করলেও সে আর কী করতে পারে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সহসা তার রাগও হয় : সে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গতে উদ্যত হয়েছে দেখেই খোদেজা আত্মহত্যা করবে এ কেমন কথা? তাছাড়া খোদেজা যদি নির্বুদ্ধির কাজ করে থাকে তবে সে-ই দায়ী হবে কেন? বুদ্ধিহীনা মেয়েটির প্রতি রাগ দেখা দিলে বিচিত্র উপায়ে সে সুস্থির বোধ করে। সে ঠিক করে, আগামীকাল ছুটির জন্যে দরখাস্ত করে দেবে এবং সম্ভব হলে দু-তিন দিনের মধ্যে ঢাকা রওনা হয়ে পড়বে। তার মনে এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে সে যদি তৎপরতা না দেখায় তবে আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেব সত্যিই বিগড়ে যাবেন।

সে-দিন সন্ধ্যায় সে বেশ উৎফুল্ল বোধ করে। একজন সহকর্মী টর্চ হাতে ছড়ি ঘুরিয়ে তার বাসায় উপস্থিত হলে সমকর্মীটির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে, তারপর সহকর্মীটি আবার টর্চ হাতে ছড়ি ঘুরিয়ে অন্য কোনো বাড়ির অভিমুখে রওনা হলে এবার সে রাতের খাওয়াদাওয়া সারে। পরে বারান্দায় গিয়ে বসেছে, এমন সময় তবারক ভুইঞা এসে দেখা দেয়। আজ তার সঙ্গে সানন্দচিত্তেই কথা বলে, যেন তার প্রতি যে-একটি জড়তার ভাব দেখা দিয়েছিল সে-ভাবটি কেটেছে।

এক সময়ে সে তবারক ভুইঞাকে বলে,

"দু-তিন দিনের মধ্যে ঢাকায় যাব। ভালো দেখে একটা নৌকা ঠিক করে দেবেন।"

কথাটি বলে মনে কেমন হাল্কা-হাল্কা বোধ করে। তবারক ভুইঞা কেমনভাবে যেন তার দিকে দৃষ্টি দেয়, কিন্তু তা তাকে বিব্রত করে না।

BanglaBook.org

তারপর এক সময় তবারক ভুইঞা চলে যায়। এবার সে হয়তো তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং এক সময় কী-একটা আওয়াজে জেগে ওঠে। তবারক ভুইঞা আবার এসেছে নাকি? সে কিছুক্ষণ পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন সেখানে অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটি ছায়া জেগে উঠবে। তবে তেমন কিছু ঘটে না। হয়তো সে কিছু স্বস্তিই বোধ করে। একটু পরে দূরে আলো দেখা দেয়। আলোটি শীঘ্র নিকটে এলে দুটি মানুষের মূর্তি জেগে ওঠে, আলোটি লণ্ঠনের রূপ ধারণ করে; লণ্ঠনের আলোয় দ্রুতভঙ্গিতে হাঁটতে-থাকা দুটি মানুষের পায়ের কিছুটা এবং তাদের বস্ত্রের নিম্নাংশ নজরে পড়ে। অত রাতে কী অজানা কারণে দ্রুতভাবে হেঁটেই মানুষ দুটি বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায়, আলোটিও এক সময়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। অন্ধকার আবার জমজমাট হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পরে সে-অন্ধকারের মধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফা একটি চকিত, তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পায়। নিঃসন্দেহে পথের ওপাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটি ব্যাঙ কোনো অপেক্ষমাণ, ক্ষুধার্ত সাপের নির্মম চোয়ালে ধরা পড়ে গিয়েছে। ব্যাঙের ভীত আর্তনাদটি তেমন জোরালো নয়, উন্মুক্তও নয়। সমগ্র মন দিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা অসহায় ব্যাঙটির আর্তনাদ শোনে যে-আর্তনাদ রহস্যময়ভাবে রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে; অন্ধকার কাঁপে হাওয়া-আন্দোলিত বাঁশের ডগার মতো; অদৃশ্য, নিঃশব্দ সাপটি কম্পমান সে-অন্ধকারের মধ্যে বিকট রূপ ধারণ করে। আওয়াজটি মুহাম্মদ মুস্তফার সুপরিচিত, তবু তার মনে হয় সাপের মুখে ধরা-পড়া ব্যাঙের আর্তনাদ কখনো সে শোনে নি, সাপের শীতল-কঠিন নির্দয়তাও এমনভাবে কখনো অনুভব করে নি। ব্যাঙের আওয়াজ তখনো থামে নি, তবে ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। তারপর সহসা আওয়াজটা থামে : সাপের মুখে নয়, সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যেই যেন ব্যাঙটির ক্ষুদ্র প্রাণের সমাপ্তি ঘটে। কেমন নিথর হয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা পথের ওপাশে ঝোপঝাড়ের প্রতি তাকিয়ে থাকে। কে জানে হয়তো সাপের কবল থেকে ব্যাঙটি প্রাণ নিয়ে মুক্তি পেয়েছে, হয়তো আবার পায় নি; নীরব অন্ধকারের মধ্যে সে-প্রশ্নের উত্তর নেই। রাতের অন্ধকার তার অদৃশ্য হাতে সুন্দর সত্য নির্মম সত্য— সবই নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।

এবার রাত যেন আদিম রূপ ধারণ করে; এমন রাত মানুষ চেনে না। দূরে দিগন্তের কাছে কয়েকবার বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে ওঠে, তবে নিঃশব্দ সে-বিদ্যুৎঝলক চোখ ঝলসে দিলেও কেমন অসত্য মনে হয়। একটু পরে একটি বাদুড় এসে নিকটে বার-কয়েক ঘুরপাক খায়, তারপর রাতের অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কখন মুহাম্মদ মুস্তফা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকবে, কারণ তার মনে হয় সে যেন কুমুরডাঙ্গা নামক একটি মফস্বল শহরের অন্যতম সরকারি বাড়ির বারান্দায় বসে নেই, বসে রয়েছে একটি নৌকার ওপর। নৌকা ঈষৎ দুলছে, থেকে-থেকে পানি থেকে ছলছল শব্দও আসছে। খালের পথ। তবে সে চাঁদবরণঘাটে স্টিমার ছেড়ে ছাপরশূন্য নৌকায় উঠেছে। দুপাশে সুপরিচিত মাঠ-ক্ষেত, দূরে গাছপালায় ঘেরা ছায়াশীতল গ্রাম। তারপর অনেক সময় কাটে; পথটি যেন বেশ দীর্ঘ। শীঘ্র কোনো কারণে সে বিস্মিত হয়। সে ভাবে : চাঁদবরণঘাটে স্টিমার থেকে নেবে খালের এ-পথ দিয়ে চিরদিনই কি তাকে যেতে হবে? তবে তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষ বিস্ময়কর কথাও বেশিক্ষণ ভাবে না, ভাবছে মনে হলেও তার ভাবনা অগাধ পানির ওপর সমীরণ-আলোড়িত ঈষৎ তরঙ্গমালার মতো হাল্কাভাবে খেলা করে, নিচে তন্দ্রা অগাধ পানির মতোই স্থির হয়ে থাকে। কিন্তু খাল কোথায়? এ যে পুকুর, শ্যাওলা-আবৃত ডোবার মতো ছোট পুকুর যার পাড় অসমান, যেন বিশালাকার কোনো প্রাণী নখাঘাতে পাড়টির ঐ অবস্থা করেছে। তবে পুকুরের পাড়ের দিকে বা পাড়স্থিত গাছপালার দিকে তার দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি একটি মুখের ওপর যে-মুখ সে-পকুরের পানি থেকে ভেসে উঠে এসেছে। সম্পূর্ণভাবে নয়, কারণ ওপরে এসেও আবার কিছু ডুবে রয়েছে যে-জন্যে তা অপরিচিত মনে হয়। তবু সে-মুখটি অপরিচিত মনে হবে কেন? সে কি খোদেজার মুখ ইতিমধ্যে ভুলে গিয়েছে? শুধু তার মুখ নয়, ভাবভঙ্গিও

BanglaBook.org

অপরিচিত ঠেকে; এমন ভাবভঙ্গি খোদেজার মুখে কখনো লক্ষ্য করে নি। ঠোঁটের পাশে কেমন বিদ্রূপাত্মক হাসি, সামান্য তিরস্কারের আভাস—যা খোদেজার মুখে কখনো দেখে নি। না, বিদ্রূপাত্মক হাসি বা তিরস্কারের ভাব নয়, তার মুখে গভীর দরদের ছায়া, এবং যে-বড়-বড় চোখ খোদেজার চোখের মতো ঠিক নয় সে-চোখে উৎকণ্ঠা। তবে কি কিছুই হয় নি? সে কোনো অন্যায় করে নি, খোদেজারও মৃত্যু হয় নি? সবই কি দুঃস্বপ্ন মাত্র?

এ-সময়ে কী একটা প্রবল ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে মুহাম্মদ মুস্তফার তন্দ্রা ভাঙ্গে। তবে বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করলে সে বুঝতে পারে দুঃস্বপ্নটি ঘুমতন্দ্রার জগতের নয়, আসল জীবনেরই একটি অংশ যার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। এবার সে তন্দ্রাহীন চোখে বসে থাকে অর্থ-উদ্দেশ্যহীনভাবে। তারপর এক সময় তার মনে হয় সে যেন একা নয়, অন্ধকারের মধ্যে কে যেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ তবারক ভুইঞার কণ্ঠস্বর যেন কানে পৌছায় নি, স্মৃতির চোখে যে-নিরাকার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার জেগে উঠেছিল সে-অন্ধকারে সমস্ত কিছু, এমনকি মানুষের কণ্ঠস্বরও বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তবে শীঘ্র আবার সকর্ণ হই। তার কথা না-শুনে উপায় কি? এখনো সে মুহাম্মদ মুস্তফার বিষয়ে কিছু বলে নি বটে তবু হয়তো এমন এক সময় আসবে যখন তার কথা না-বলে পারবে না। হয়তো কুমুরডাঙ্গার কাহিনীটা বলার উদ্দেশ্য অবশেষে মুহাম্মদ মুস্তফার সম্বন্ধে যা বলবে তারই জন্যে একটি উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা, যথাযোগ্য পটভূমি তৈরি করা। অথবা তার বিশ্বাস কুমুরডাঙ্গা মুহাম্মদ মুস্তফাকে প্রভাবিত করেছিল, তাই সে-শহরে যা ঘটেছিল তা প্রথমে না বললে মুহাম্মদ মুস্তফার কথা সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাবে না।

তবারক ভুইঞা কার মৃত্যুর কথা যেন বলে। শীঘ্র স্মরণ হয়, কুমুরডাঙ্গার গণ্যমান্য উকিল কফিলউদ্দিন শহর ছেড়ে যাবার জন্যে ঘাটে উপস্থিত হয়েও যেতে পারে নি, বজরায় উঠবার সময়ে হঠাৎ তার মৃত্যু ঘটে। তবারক ভুইঞা বলে, একটি বৃদ্ধ মানুষের আকস্মিক মৃত্যুও মানুষকে বিস্মিত করে না, কারণ বয়সের ভারে যার জীবনগতি শত রকমে ধীর-মন্থর হয়ে পড়েছে তার মৃত্যুর দিন যে আর দূরে নয় তা সকলে তাদেরই অগোচরে মেনে নেয়। তবে উকিল কফিলউদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যুর খবর শহরময় প্রচারিত হলে সবাই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে, যেন তার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, জরা-বার্ধক্য সে-মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়। কাছারি-আদালতে, কাছারি-আদালতের সামনে ঘাসশূন্য ধুলাচ্ছন্ন মাঠে, বাজারের পথে, সে-পথের দুপাশে দোকানগুলিতে, মানুষের বাড়িতে উঠানে সর্বত্র একটি থমথমে ভাবের সৃষ্টি হয়। সকলের মনে একটি প্রশ্নই ঘোরাফেরা করে : বজরায় উঠতে গিয়ে উকিল সাহেব সর্পদষ্ট মানুষের মতো ক্ষিপ্রবেগে পা তুলে নিয়েছিল কেন, কীই-বা শুনতে পেয়ে এমন ভীতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল? ডাক্তার বোরহানউদ্দিন বলে, ঘাটে পৌছাবার পর বৃদ্ধ মানুষটির হৃৎপিণ্ড হঠাৎ বিকল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এ-ব্যাখ্যায় কেউ সন্তুষ্ট হয় না। সবারই মনে হয়, ডাক্তার বোরহানউদ্দিন আসল কথাটা বুঝতে পারে নি : হৃৎপিণ্ড বিকল হলেও কেন হয়েছিল, সে-কথা। নিঃসন্দেহে উকিল সাহেব কিছু শুনতে পেয়েছিল, বজরায় উঠতে যাবে এমন সময়ে কী-একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ তার কানে ফেটে পড়েছিল। এবং তা নদীর কান্না ছাড়া আর কী?

উকিল কফিলউদ্দিন বিচিত্র কান্নাটি শুনতে পেয়েছিল বলেই সর্পদষ্ট মানুষের মতো বজরা থেকে পা তুলে নিয়েছিল, সে-জন্যেই তার চোখ বিস্ফারিত এবং মুখ রক্তশূন্য হয়ে পড়েছিল—সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলে কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের মনে পূর্বের আশঙ্কাটি ফিরে আসে, কী-একটা কথা অস্পষ্টভাবে মনের প্রান্তে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করে।

পরদিন ফজরের নামাজের পর হবু মিঞা মুহুরি বাইরের ঘরে বসে ছিল। নিত্য এ-সময়ে সে বাইরের ঘরে এসে বসে, রোগ-ব্যাধিতে শয্যাশায়ী না হলে এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না কোনোদিন। শীতের দিনে গায়ে আলোয়ান, গ্রীষ্মের দিনে নগ্ন গা, মাথার চুল এলোমেলো, ঈষৎ

BanglaBook.org

স্ফীত চোখে-মুখে গভীর প্রশান্তি, কিছু বিমনস্কভাব। দিন-রাতের মধ্যে এ-সময়টাই তার সবচেয়ে প্রিয়। বাইরের ঘরে তখন ভালোমতো আলো প্রবেশ করে না, তবে যে-অন্ধকার তখনো জমে থাকে তা যেন রাতেরও নয় দিনেরও নয়; সে-অন্ধকার অনেকটা দিঘির গভীর তলদেশের অন্ধকারের মতো। সে-সময়ের নির্জনতাও বিশেষ ধরনের যা মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করা যায়, কারণ সে-নির্জনতাও যেন রাতের বা দিনের অংশ নয়; সে-নির্জনতার মধ্যে মানুষের মন ধীরে-সুস্থে কোথাও কোনো তাগিদ-তাড়া বোধ না করে দিঘির পানির গভীরে মাছের মতো শ্লথগতিতে অনায়াসে সঞ্চরণ করে। বস্তুত ফজরের এই সময়ে কিছুই সে ভাবে না, এমন কি যে-ছেলেটি কোনোদিন আরোগ্য লাভ করবে না তার আসন্ন, অনিবার্য মৃত্যুও তার মনে কোনো ছায়া সঞ্চার করে না।

তবে আজ হবু মিঞা মুহুরির মনে গভীর অশান্তির জ্বালা; কী-একটা কথা সে সমগ্র মন দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে, কিন্তু সক্ষম হয় না বলে মনে অস্থির-অস্থির বোধ করে।

যখন সে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজ্ঞান হয় তখন সূর্য উঠেছে, ক্ষুদ্র বারান্দা অতিক্রম করে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে রোদ লুটিয়ে পড়েছে ধুলাচ্ছন্ন ফাটলধরা মেঝের ওপর। নির্জন ঘরেই সে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে,

"কান্নাটি শোনামাত্র উকিল সাহেব তার অর্থ বুঝতে পেরেছিল।"

উকিল কফিলউদ্দিন কান্নাটির মধ্যে কী দেখতে পেয়েছিল সে-কথা অন্যেরা যখন জানতে পারে তখন তারা বিস্মিত হয় না। সে-কথা তারা নিজেরাই কি জানে না? জানে, সব বোঝে, কেবল এ-কদিন নিজেদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছে কারণ এমতক্ষেত্রে আর কী করা যায়? তারা ভাবে কান্নাটি শুনবার জন্যে তাদের আগ্রহের সীমা নেই, তা শুনবার জন্যে অধীর হয়ে রয়েছে, কিন্তু আসলে তা শুনতে পাবে এই ভয়ে তারা কি সদা-সন্ত্রস্ত নয়? তারা ভাবে কান্নাটি শুনতে পেলে কী-একটা অপরূপ ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে, বা মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন যা বলে তা নিতান্ত উদ্ভট হলেও সম্ভব, বা কান্নাটি কোনোরকমের কানের ভুল কিম্বা বড়জোর একটি দুঃস্বপ্ন। কিন্তু এ-সব কি একটি নিদারুণ সত্য ঢেকে রাখার ফিকিরফন্দি নয়? কিন্তু কতদিন আর ঢেকে রাখা যায়? এ-সব কলাকৌশল বা মন-ভুলানোর কারসাজিতে এ-কথা কি ঢেকে রাখা সম্ভব যে শীঘ্র কুমুরডাঙ্গায় ভয়ানক কিছু ঘটবে এবং কান্নার আওয়াজটি তারই পূর্বসঙ্কেত?

কীভাবে, কী বিচিত্র যুক্তির সাহায্যে এমন একটি বিশ্বাস তাদের মনে বাসা বেঁধেছিল কে জানে, কিন্তু এবার তারা সহসা একেবারে নিশ্চিত হয়ে পড়ে যে নদীর দিক থেকে অনেকে যে-কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় তা ভয়ঙ্কর কোনো বিপদের পূর্বসঙ্কেত। হয়তো দুঃখকষ্টে জর্জরিত নিপীড়িত মানুষ তারই অগোচরে কেয়ামত বা এমন কিছু সর্বনাশী প্রলয়কাণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করে কারণ চতুর্দিকে যা সে দেখতে পায় তার অস্তিত্বের মধ্যে কোনো অর্থ খুঁজে পায় না, এবং তাই তার ধ্বংসই কামনা করে।

কুমুরডাঙ্গায় শীঘ্র ভয়ানক কিছু হবে, কিন্তু কী হবে? যে-ভয়ঙ্কর বিপদ গুটিগুটি পায়ে কুমুরডাঙ্গার দিকে এগিয়ে আসছে, সে-বিপদের রূপটা কী রকম? তা কি এমন কোনো মহামারী যা সমগ্র শহর উজাড় করে দেবে? বা কোনো মহাপ্লাবন যা দুরন্তবেগে ছুটে এসে মানুষের ঘরবাড়ি গোলা-গোয়াল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে? অথবা কোনো প্রচণ্ড ভূমিকম্প যা নিমেষের মধ্যে পায়ের নিচের শক্ত জমিকে বিশালকায় কোনো জন্তুর মুখগহ্বরে পরিণত করবে? কী হবে তা কারো পক্ষে পরিষ্কারভাবে ভাবা সম্ভব হয় না, এবং হয় না বলে আশঙ্কাটি কোনো নির্দিষ্ট আকারের মধ্যেও ধরে রাখা সম্ভব হয় না; সে-আশঙ্কা সকলের মনে যে-গভীর ভীতির সৃষ্টি করে তার মধ্যে সমস্ত চেতনা শুষ্ক ছোবড়ার মতো নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে।

তারপর কেউ কান্নার কথাটি আর উল্লেখ করে নি : কেউ শুনে থাকলেও কথাটি গোপন করে রাখে। এক সময়ে যা শুনতে পাওয়া কারো-কারো নিকট সৌভাগ্যের বিষয় মনে হয়েছে,

BanglaBook.org

যা শুনলে গর্বের সঙ্গে সকলকে বলেছে, না শুনলেও শুনেছে বলে মিথ্যা দাবি জানিয়েছে- তা এখন গোপন করে রাখাই তাদের সমীচীন মনে হয়। কে শুনতে চায় সে-কান্নার কথা যে-কান্না কোনো অভাবনীয় প্রলয়কাণ্ডের অগ্রধ্বনি, কোনো ধ্বংসলীলার পূর্বাভাস? কেবল কান্নার কথা ঢেকেও কেউ ঢাকতে পারে নি, কারণ সবাই বুঝতে পারে সে-বিষয়ে আকস্মিক নীরবতার মানে এই নয় যে তা থেমে গিয়েছে : বস্তুত কান্নার বিষয়ে আকস্মিক নীরবতায় কান্নাটির আওয়াজ যেন আরো উচ্চতর হয়ে ওঠে, যা ছিল সবিরাম ধ্বনি, যা মধ্যে-মধ্যেই কেবল শোনা যেত, তা অবিরাম ধ্বনিতে পরিণত হয়।

কুমুরডাঙ্গায় ভয়ানক কিছু একটা ঘটবে এ-বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে পড়লে শহরবাসীরা আরো অনেক কিছুতে আসন্ন বিষম বিপদের পূর্বচিহ্ন দেখতে পায়, অনেক সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা তাদের চোখে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে। কারো হাতের চুড়ি ভেঙ্গে গেলে, কলসিটা উত্তরদিকে হেলে পড়লে, বা সহসা কোনো মৃত লোক স্বপ্নে দেখা দিলে মনে প্রশ্ন জাগে : এ-সবের অর্থ কী ? পাশের বাড়িতে হয়তো একটি শিশু বায়ুশূলের বেদনায় তারস্বরে কাঁদতে শুরু করেছে। শিশুটি কেন এমনভাবে কাঁদে? সন্ধ্যাকাশে অশ্রান্তভাবে উড়তে থাকা একঝাঁক পাখি দেখা দিয়েছে। পাখিগুলি এমন অস্থির হয়ে উঠেছে কেন? গোয়ালের গরুর দুধ কমে গিয়েছে। তার কারণ কী? অনেক কিছু অস্বাভাবিকও মনে হয়। দূর আকাশে মেঘগর্জন শোনা গেলে মনে হয় এমনভাবে মেঘ কখনো ডাকে না। নিঃশব্দ নিথর হাওয়াশূন্য রাতে হঠাৎ গাছের শাখায় অস্ফুট মর্মরধ্বনি জাগলে সে-আওয়াজ কানে অপরিচিত ঠেকে; গাছের পাতা এমনভাবে কোনোদিন যেন শব্দ করে নি। কাছারি-আদালতের পাশে অবস্থিত ট্রেজারি থেকে ঢন্‌ঢন্ করে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় সময় ঘোষণা করা হয়। সে-আওয়াজ আচম্বিতে কর্ণগোচর হলে মনে হয় সুপরিচিত ঘণ্টাটি কেমন বেসুরোভাবে বাজছে। গভীর রাতে নীরবতা প্রগাঢ় হয়ে উঠলে মনে হয় সে-নীরবতা নীরবতা নয়, অন্য কিছু; হয়তো শ্বাসরুদ্ধ করা অপেক্ষা মাত্র। মানুষের কণ্ঠস্বর, চলাফেরার ধরন, তাকানোর ভঙ্গি—এ সবও কেমন-কেমন ঠেকে।

কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের মতিভ্রমই হয়ে থাকবে, কারণ যারা কান্নার কথাটি পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করে নি তারাও একটি অস্ফুট আশঙ্কার হাত থেকে রেহাই পায় নি। কোনো-কোনো সময়ে মানুষের কাছে যুক্তির অস্ত্র অকেজো মনে হয়। ভয়ানক কিছু-একটা ঘটবে—এমন একটি ধারণা যদি কারো মনে দেখা দিয়ে থাকে তা কোনো যুক্তির সাহায্যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেয়া যায় কি? সমস্ত সৃষ্টি কি একদিন অচিন্তনীয় একটি সংঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে না, সূর্যচন্দ্র তারানক্ষত্র নীহারিকার দল বিলুপ্ত হবে না একটি আকস্মিক তুমুল বিপর্যয়ের মধ্যে? আজ হবে না কাল হবে, কাল নয় সুদূর ভবিষ্যতে কোনো একটি দিনে কল্পনাতীত ঘটনাটি ঘটবে—এই বলেই কি মনকে প্রবোধ দেয়া যায়? অদৃশ্য ভবিষ্যতের বুকে যা লুক্কায়িত তার বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না : নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের কার্যকলাপ নিতান্ত আকস্মিক, তার সম্মুখে মানুষ একেবারে অসহায়। স্নেহমমতা, সুখশান্তির পশ্চাতে ছুটে মানুষ ভবিষ্যতের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু নির্মম ভবিষ্যৎ সে-সব বিনাখবরে বিনাকারণে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে। বস্তুত, যারা বুদ্ধিমত্তা বা যুক্তির দ্বারা নিজেকে আশঙ্কামুক্ত করার চেষ্টা করে তাদের শীঘ্র মনে হয় সে-সব চেষ্টা বৃথা : দুর্বল-ডানা ক্ষীণশক্তি একটি পাখি অকূল সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে না, একটি প্রদীপ অসীম অন্ধকার দূর করতে পারে না।

তবে কোনো আশা নেই বুঝলেও মানুষ আত্মরক্ষার জন্যে কিছু-না-কিছু করেই, বুদ্ধিতে যা কুলায়, যা ভীতবিহ্বল মনে সমীচীন মনে হয় তা করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরাও কিছু একটা করে।

একদিন সন্ধ্যার দিকে দর্জিপাড়ার রহমত শেখ একটি নবজাত বাছুরকে বুকে জড়িয়ে এবং হাতে একটি ধারালো ছুরি নিয়ে নদীর দিকে ছুটতে শুরু করে। রহমত শেখ চিরদুঃখী।

BanglaBook.org

বহুদিনের নৈরাশ্য এবং অর্থকষ্টের পর ইদানীং কাছারি-আদালতের কাছে সে একটি পানবিড়ির দোকান খুলতে সক্ষম হয়েছে,—যে-দোকান নিয়ে তার গৌরব এবং আশার অন্ত নেই। তবে কুমুরডাঙ্গা শহরে অজানিত ভয়টি নেবে আসার পর থেকে তার মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে সে-দোকানটি সে হারাবে এবং তারপর আবার শুরু হবে তার অসহ্য অর্থকষ্ট, অন্তহীন কঠোর পরীক্ষা যার শেষে কোনো পুরস্কার বা প্রতিদান নেই।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। পথে-ঘাটে তখন মানুষের চলাচল কমেছে। যারা তাকে দেখতে পায় তাদের কেউ-কেউ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, ছুটতে-থাকা লোকটির দিকে বিস্মিতনেত্রে তাকিয়ে থাকে, কেউ-কেউ আবার সে কেন এমনভাবে ছুটছে তা জানবার জন্যে উদ্যম কৌতূহল বোধ করলে তার পিছু ধরে। কাজেই রহমত শেখ যখন নদীতীরে এসে উপস্থিত হয় ততক্ষণে ছোটখাটো একটি ভিড় জমে গিয়েছে তারে চতুষ্পার্শ্বে। তবে তাদের বিষয়ে তাকে সচেতন মনে হয় না, যে-উদ্দেশ্যে সে নদীতীরে উপস্থিত হয়েছে সে-উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্যে উদ্যত হয় ক্ষিপ্রভঙ্গিতে। প্রথমে সে ধারালো ছুরি দিয়ে বাছুরটির গলা কাটে, ফিনকি দিয়ে তাজা উষ্ণ রক্ত উঠে তার দেহ এবং বস্ত্রের খানিকটা রঞ্জিত করে, যার উগ্র রঙের তুলনায় সন্ধ্যাকাশের রক্তিমাভা ফিকা-পানসে মনে হয়। তারপর রহমত শেখ রক্তাক্ত, মস্তকছিন্নপ্রায় বাছুরটি আবার বুকে জড়িয়ে ধরে তীর বেয়ে নিচে নেবে যায়, চোখে-মুখে নিথর ভাব। পানিতে নেবে সে হাঁটতে থাকে; হাঁটু, কোমর, তারপর বুক পর্যন্ত সে-পানি উঠে আসে। এবার সে বাছুরটিকে শ্লথগতি স্রোতে ছেড়ে দেয়, চতুর্দিকে নদীর পানি গাঢ় হয়ে ওঠে।

দর্জিপাড়ার রহমত শেখ যে-অদ্ভুত কাণ্ডটি করে বসে তার মর্মার্থ কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা প্রথমে বুঝতে পারে নি; শুরুতে কাজটি নিতান্ত অর্থহীন মনে হয়ে থাকবে তাদের কাছে। কিন্তু শীঘ্র তারা বুঝতে পারে। এবং একবার বুঝতে পারলে তাদের আর ধরে রাখা যায় না, কেউ ধরে রাখার চেষ্টাও করে না। দলে-দলে তারা নদীর তীরে উপস্থিত হতে শুরু করে, হাতে এটা-সেটা। যে যা পারে, যা যার কাছে মূল্যবান মনে হয়, তাই নিয়ে আসে : হাঁড়ি-পাতিল, জামা-কাপড়, চাল-ডাল, টাকা-পয়সা, এমনকি সোনা-রূপার গহনাও। এ-সব তারা নদীর পানিতে ছুঁড়তে শুরু করে।

এমনিতে দরিদ্র নিঃস্ব মানুষেরা দু-দিনে আরো দরিদ্র নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তাদের নানা প্রকারের মূল্যবান অমূল্যবান দরকারি-বেদরকারি জিনিস মরণোন্মুখ নদীর বুকে আশ্রয় গ্রহণ করে চিরতরে, অর্থহীনভাবে।

সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে খোদেজা একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মায় পরিণত হয়েছে যে-আত্মা সারা জীবন তাকে পদে-পদে অনুসরণ করবে, অদৃশ্যভাবে, ছায়ার মধ্যে মিশে থেকে, হয়তো-বা তাকে এক সময়ে ধ্বংসও করবে। সেদিন রাতে সে যখন তন্দ্রাহীন চোখে বারান্দায় বসে ছিল তখন খোদেজারই উপস্থিতি অনুভব করেছিল। ভয়টাও তখন জেগেছিল—এমন ভয় যা মানুষের চোখের সামনে থেকে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

প্রথমে মুহাম্মদ মুস্তফা বুঝে উঠতে পারে না কী করবে সে। প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মার বিরুদ্ধে কীই-বা করতে পারে মানুষ? জীবিত মানুষকে বোঝানো যায়, অন্যায়-অবিচার করলে তার কাছে মাফ চাওয়া যায়, ক্ষতিপূরণ খেসারত দেয়া যায় তাকে, কিন্তু যে কায়াহীন আত্মায় পরিণত হয়েছে তার কাছে কী করে মাফ চাওয়া যায়, কী করেই-বা ক্ষতিপূরণ-খেসারত পৌঁছানো যায়? জীবন্ত মানুষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করাও সম্ভব কারণ তার শক্তি যতই দুর্দান্ত হোক-না কেন সে-শক্তি তার দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু দেহহীন আত্মার শক্তির সীমা নেই। তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া দুষ্কর।

BanglaBook.org

দু-দিন পরে মুহাম্মদ মুস্তফা একটি ভয়ানক সিদ্ধান্ত নেয়। সেদিন হয়তো রবিবার ছিল, হয়তো সে আপিসে যায় নি। সেদিনের কথা কিছু কিছু তার মনে পড়ে, কিছু কিছু একেবারেই মনে পড়ে না। এ-কথা বেশ মনে পড়ে, তবারক ভুইঞা বার বার এসেছিল সেদিন। হয়তো তার মনে কেমন একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, এবং সে-জন্যে তার কৌতূহলও অদম্য হয়ে উঠেছিল। তবে তার কৌতূহল মুহাম্মদ মুস্তফাকে আর বিচলিত করত না। অন্য একটি অদৃশ্য দৃষ্টিও কি সর্বক্ষণ তার ওপর নিবদ্ধ নয়, তার পদক্ষেপ কেউ কি লক্ষ্য করে দেখে না প্রতিমুহূর্তে? শুধু তার প্রত্যেক বাহ্যিক আচরণ কার্যকলাপ নয়, মনের ক্ষীণতম আন্দোলন অস্ফুট বাসনা-কামনাও সেই নিরন্তর দৃষ্টির হাত থেকে নিস্তর পায় না। সে-দৃষ্টির তুলনায় তবারক ভুইঞার দৃষ্টি তেমন কিছু নয়। তাছাড়া কতখানিই-বা সে দেখতে পায়? তার কৌতূহল অস্বাভাবিকও মনে হয় না। অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার করবে কিনা এবং স্বীকার করবার পর তার মনে অনুতাপ-অনুশোচনা বা ভীতি দেখা দেবে কিনা—এ-সব বিষয়ে কৌতূহল স্বাভাবিক। সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে বিচারক অপরাধীর অপরাধ সাব্যস্ত করে কেবল, অপরাধী তার মনের নিভৃতে অপরাধ স্বীকার করেছে কিনা, তার জন্যে অনুতপ্ত বা ভীত হয়েছে কিনা—সে-জন্যে তার কৌতূহল নেই কারণ সে-সবের ওপর অপরাধ বা শাস্তির কমতি-বাড়তি নির্ভর করে না। কিন্তু সে-সবে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। বস্তুত সে আরো কিছু জানতে চায়। অনুতাপ, অনুশোচনা বা ভীতির কি একটি পরিণতি নেই? মেঘ জমলে বর্ষণ হয়, বীজ রোপণ করলে গাছ হয়, বাঁধ ভাঙ্গলে ধরে-রাখা পানি নিঃসৃত হয়; অনুতাপ অনুশোচনা ভীতিরও পরিণতি থাকে। তবারক ভুইঞা জানতে চায় এবার মুহাম্মদ মুস্তফা কী করবে, তার অনুতাপ অনুশোচনা বা ভীতি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে। কিন্তু শুধু সে নয়, অদৃশ্য দৃষ্টিও সে-সব জানতে চায়। তবারক ভুইঞা তাকে বিচলিত করবে কেন? তাছাড়া একবার রঙ্গমঞ্চে নাবলে দর্শক সম্বন্ধে অভিনেতা আর তেমন সচেতন থাকে না : দর্শক তখন ছায়ার মতো অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবারক ভুইঞা ছায়ার মতো কোথাও দেখা দিলেও তার বিষয়ে সে আর তেমন সচেতন হত না।

এক সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফা বোধ হয় ঘুরঘুর করতে শুরু করে—এ-ঘরে, সে-ঘরে, বারান্দায়। যে-কাজ করবার জন্যে মনস্থির করেছে তার জন্যে উপযুক্ত একটি জায়গা খুঁজছিল নিশ্চয়। এ-জীবনে সব কিছুর জন্যেই প্রথমে উপযুক্ত জায়গা ঠিক করতে হয় : কোথায় পুকুর খনন করতে হবে, কোথায় চারা লাগাতে হবে, কোথায় একটি শিশুর জন্ম হবে, কোথায় ঘর-সংসার পাতবে, কোথায় অন্তিম শয্যায় শায়িত হবে। তবে নিচের কোনো ঘর হয়তো পছন্দ হয় নি, কারণ সিঁড়ি ভেঙ্গে সে ওপরে চিলেকোঠায় উঠে আসে। খড়খড়ি-দেয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন চিলেকোঠায় সে কতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টি দেয়। ঘরটি নোংরা। মেঝেতে ছড়ানো কাগজপত্র, অনেকদিনের সঞ্চিত ধুলা, পাখির বিষ্ঠা বা পরিত্যক্ত পালক, এক কোণে কবে কার ছেড়ে যাওয়া অতিশয় পুরাতন ছেঁড়া জীর্ণ একটি তোশক। দেয়ালে দরজায় আগের বাসিন্দাদের ছেলেমেয়েদের কাঁচাহাতের হিজিবিজি লিখন, একটি মানুষের নকশা : গোলাকার মুখে মস্ত দুটি চোখ, নাকের দুটি ছিদ্র চোখের চেয়েও বড়, হাত-পা কিন্তু চারটি রেখা টেনে কোনো মতে শেষ করা। ঘরের অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হলে এ-সব সে ধীরে-ধীরে দেখতে পায়।

চিলেকোঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফা সহসা খোদেজার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়। রাতদিনই সে তাকে অনুসরণ করে। এবারও তাকে অনুসরণ করে ওপরে উঠে এসেছে এবং পেছনে কোথাও ছায়ার মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখছে। একটু পরে সে চুড়ির ঝঙ্কারও শুনতে পায়, এবং সে-আওয়াজ তেমন সুস্পষ্ট না হলেও তার শিরদাঁড়া শীতল হয়ে ওঠে। একবার ইচ্ছা হয় পেছনে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু না-নড়ে সে পূর্ববৎ স্থির হয়ে থাকে। তবে না-তাকালেও সে খোদেজাকে যেন দেখতে পায়, যদিও তেমন

BanglaBook.org

পরিষ্কারভাবে নয়। তাছাড়া তার মুখটি যেন মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ের মতো—যাকে সেদিন পথে দেখেছিল। হয়তো সে-জন্যে সহসা ক্ষণকালের জন্যে কী-একটা ভাবে সে অভিভূত হয়ে পড়ে, কারণ তার মনে হয় খোদেজার মৃত্যু হয় নি, পথে-দেখা মেয়েটির মতোই সে জীবিত। তারপর ভাবে : খোদেজা তাকে দেখছে দেখুক। সে কি একটি ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত নেয় নি? একসময়ে খোদেজা দেখতে পাবে, মনভরে প্রাণভরে দেখতে পাবে। সে সুস্থির হয়।

সে-বার হয়তো বেশিক্ষণ চিলেকোঠায় থাকে নি। হঠাৎ তার মনে হয়, তবারক ভুইঞা এসেছে। তখন সে দড়িটা লুকিয়ে ফেলে; সেটি ব্যবহার করবার সময় এখনো আসে নি। তবে তাড়াতাড়ি করে লুকিয়ে ফেলেছিল বলে খুঁজে বের করতে পরে কষ্টই হয়েছিল।

হয়তো দড়িটা যখন লুকাবার চেষ্টা করছিল তখনই নেহাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কলিজাটির কথা মনে পড়েছিল। না, তখন নয়। যখন কলিজাটির চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন সে শোবার ঘরে চৌকির ওপর চুপচাপ করে বসে, দৃষ্টি মেঝের দিকে। বহুদিন আগে গ্রামের একটি মেয়েলোকের কাছে কলিজাটির কথা প্রথম শুনেছিল। মেয়েলোকটি বলত, খোদা কলিজার মতো দেখতে, কলিজার মতোই অবিরত থরথর করে কাঁপে। একবার তার কথা শুনে বড় চাচা বা বাপ খেদমতুল্লা আহত পশুর মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল। তারপর থেকে মেয়েলোকটি গোপনে-গোপনে তাকে কলিজার কথা বলত, কারণ সে জানত ভয় পেলেও মুহাম্মদ মুস্তফা তা বিশ্বাস করে। খোদা যে নিরাকার—তা একদিন সম্পূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করলেও মুহাম্মদ মুস্তফা কলিজাটির কথা অনেক দিন ভুলতে পারে নি এবং কখনো-কখনো সেটি আপনা থেকেই কোত্থেকে সহসা তার মনশ্চক্ষুতে এসে দেখা দিয়ে থরথর করে কাঁপত। রঙটা লাল। তবে টাটকা লাল নয়; তাতে যেন কালচে ধরেছে। মানুষের মনে সত্য এবং অসত্য নির্বিবাদে পাশাপাশি বাস করতে পারে একবার যদি উভয়ের অস্তিত্ব গোপন করার কৌশলটা করায়ত্ত করে নেয়া যায়।

কলিজাটি বহুদিন পরে তার মনশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে বলে সে গভীর কৌতূহল বোধ করে, একটু ভয়-ভয়ও করে, এবং শীঘ্র এমনও মনে হয় সেটি যেন বাস্তবরূপ ধারণ করেছে, যেন সত্যি তা দেখতে পাচ্ছে : তার চোখের সামনে শূন্যে ঝুলে থাকা কলিজাটি কাঁপতে থাকে থরথর করে, অশ্রান্তভাবে, নির্দয়ভাবে। নির্দয়ভাবে কারণ সে কলিজার কম্পন কখনো যেন থামবে না, কখনো শান্ত হবে না; সেটি এমনই কিছু যার শেষ নেই, যা অমর।

সে যেন আবার সিঁড়ি ভেঙ্গে চিলেকোঠায় উঠে এসেছে। সে-বারই কি জানলার খড়খড়ি দিয়ে পেছনের বাড়ির উঠানের দিকে তাকিয়েছিল? ঠিক মনে নেই। প্রথমবার যখন সে-বাড়ির উঠানের দিকে তাকায় তখন রোদটা যেন পড়ে এসেছে। হয়তো সে-বার দড়ির সন্ধানে ওপরে উঠে এসেছিল। তখনো খাওয়াদাওয়া করে নি, দ্বিপ্রহরের প্রখর রোদ নির্মমভাবে খাঁ খাঁ করছে। দড়িটা খুঁজে পায় নি। পরে একটু বিরক্ত হয়ে খেতে বসে পেছনের বারান্দায়, পাটির ওপর। ঝুঁকে পড়ে দ্রুতভাবে খায়, যেন খাওয়া শেষ হলে দূরে কোথাও যাবে। তাই অন্য দিনের তুলনায় গোগ্রাসে অনেক খায়। প্রথমে পুঁটিমাছগুলি মস্ত মস্ত লোকমার সঙ্গে গলাধঃকরণ করে, তারপর গোস্তের ছালন এবং ডালের সাহায্যে দু-তিন বাসন ভাত খতম করে। খাওয়া শেষ হলে ভরা পেটে বারান্দার প্রান্তে হাতমুখ ধুতে বসে অনেকক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে থাকে, কারণ সহসা বন্ধু তসলিমের চিঠির কথা তার মনে পড়ে। সে-চিঠির জবাব দেয় নি। চিঠির পর একটি তারও এসেছে; তার নীরবতায় বন্ধু তসলিম বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবে। সে-তারেরও জবাব দেয় নি। কী উত্তর দেবে? বন্ধু তসলিম দু-চার দিনের মধ্যে খবরটা পাবে, তখন সব বুঝতে পারবে সে। হয়তো প্রথমে সে বড় দুঃখিত হবে, আফসোসও হবে তার। সে ভাববে, এতদিন এত কষ্ট করে সে পড়াশুনা করেছিল এই জন্যেই কি? পরে সে বুঝবে। তবে তার চিঠি বা টেলিগ্রাম, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, এমনকি দেশের বাড়ি আপনজন সবই বহু দূরে মনে

BanglaBook.org

হয় ; সে যেন কোথায় একটি নদী পেরিয়ে চলে এসেছে সে-সব পেছনে ফেলে।

না, অপরাহ্নের দিকেই চিলেকোঠার জানলার খড়খড়ি দিয়ে পেছনের বাড়ির উঠানের দিকে তাকিয়ে থাকবে। মনে পড়ে, সে-বাড়ির উঠানে তবারক ভুইঞাকে দেখতে পেলে সে ভয়ানকভাবে চমকে উঠেছিল। সে জানত পেছনে কোথাও তবারক ভুইঞা থাকে, কিন্তু তার বাড়ি যে সরকারি বাংলোর পেছনের দেয়াল ঘেঁষেই—তা কখনো ভাবে নি।

উঠানের একধারে নিমগাছের তলে খালি গায়ে হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গি তুলে পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে তবারক ভুইঞা কাঠি জাতীয় কিছু দিয়ে নতমাথায় মাটি খুঁড়ছিল। লেপা-জোপা তক্‌তকে পরিচ্ছন্ন উঠান। ছোটখাটো বাড়িটির ভেতরের বারান্দাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বারান্দার প্রান্তে একটি পিঁড়ি, পিঁড়ির পাশে পেতলের বদনা। বদনাটাও মাজাঘষা, ঝকঝকে। ভেতরটা নজরে পড়ে না ঠিক, তবু মনে হয় সেটি স্বচ্ছ পানিতে ভরা। নিঃসন্দেহে সে-পানি উঠানের অন্যধারে কুয়াটি থেকেই এসেছে। কুয়াটি তেমন উঁচু নয়, তবু একপাশে একটা ধাপের মতো। কুয়ার ওপরে একটা বালতি। বালতিটিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

পরে সে-বাড়ির উঠানে বউটিকে দেখতে পায়। তাকে প্রথমে দেখে নি, তাই বুঝতে পারে নি কোথেকে সে এসেছে। মুহাম্মদ মুস্তফার বাড়ির দেয়ালের দিকে আরেকটা ছোট-খাটো ঘর, যার ছাদটাই কেবল নজরে পড়ে। বোধহয় রান্নাঘর। হয়তো সেই রান্নাঘর থেকে বউটি বেরিয়ে এসেছে। সে কি তবারক ভুইঞার স্ত্রী? উঠানের মধ্যখানে এসে দাঁড়িয়ে সে থামে, তারপর এধার-ওধারে কিছু যেন খুঁজে হাত তুলে একবার খোলা চুল ঝাড়ে। পিঠভরা চুল, ভেজা, রোদে তাই চিকচিক করে। এদিকে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে মুখটা দেখা যায় না, তবে মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী, নিটোল দেহের গঠনটা ভালো। পরনে ডোরাকাটা শাড়ি, পা খালি। কী কারণে নিষ্পলক দৃষ্টিতে বউটির দিকে মুহাম্মদ মুস্তফা তাকিয়ে থাকে। তারপর ভেতর থেকে একটি বৃদ্ধ মানুষ ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে পিঁড়িতে বসে। তবারক ভুইঞা নড়ে না, কিন্তু মাথায় ঘোমটা টেনে বউটি কোথাও অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপর থেকে সেদিন মুহাম্মদ মুস্তফা অনেকবার চিলেকোঠায় এসে জানলার খড়খড়ি দিয়ে সে-বাড়ির উঠানের দিকে তাকিয়ে থাকবে। পরে তবারক ভুইঞাকে দেখে নি, কিন্তু বউটিকে বার বার দেখেছে। মেয়েটির গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল, দূর থেকেও কেমন মনে হয় মুখটা মন-খোলা মুখ। দ্রুতপায়ে হাঁটে, কিন্তু যখন দাঁড়ায় তখন এক পায়ে ভর করে দাঁড়ায় বলে মাজার এক পাশে খাঁজ পড়ে, দেহটা একটু বেঁকে যায়। তবে সে যেন সদা কর্মব্যস্ত। এই এসে উঠানে দেখা দেয়, এই আবার অদৃশ্য হয়ে যায় রান্নাঘরে বা বাসঘরে, আবার বেরিয়ে এসে কুয়ার ধারে যায়। যেন উদ্দেশ্যহীন ভাবেই ঘুরে বেড়ায়। তবে তেমনটা মনে হয় কারণ মুহাম্মদ মুস্তফা দেখতে পায় না বা বুঝতে পারে না কেন সে ঘোরাঘুরি করে। উদ্দেশ্য থাকলেও সে-উদ্দেশ্য কী তা জানবার জন্যে কোনো কৌতূহল বোধ করে না সে, মেয়েটির আসা-যাওয়াই সে কেবল লক্ষ্য করে দেখে। যখন মেয়েটিকে দেখতে পায় না তখন সে নিরাশ বোধ করে না : সে অপেক্ষা করে। তাছাড়া তাকে দেখতে না পেলেও মনে হয় সে যেন অদৃশ্য হয়ে যায় নি, উঠানে, বাড়ির বারান্দায়, কুয়ার পাশে, নিমগাছের তলে—সর্বত্র তার স্পর্শ।

পরে একবার মনে হয়েছিল, পেছনের বাড়ির উঠানে ডোরাকাটা শাড়ি-পরা মেয়েটিকে দেখার পর একবারও সে চিলেকোঠার জানলা থেকে নড়ে নি। হয়তো ধারণাটি ভুল নয়। বউটির আকর্ষণেই সে যে অমনি করে জানলার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল তা ঠিক নয়, নিঃসন্দেহে প্রতিবেশীর বাড়ির তক্‌তকে উঠানে, ছোট কুয়াটিতে, নিমগাছের ছায়ায়, রান্নাঘরের ছাদে, এমনকি বারান্দায় পিঁড়ি-বদনায় সে এমন কিছু দেখতে পেয়েছিল যা তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে থাকবে। সে জন্যে জানলা থেকে সে নড়তে পারে নি। হয়তো তাও সত্য নয়। সত্য এই যে, চিলেকোঠার জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকাবার পর

BanglaBook.org

যে-অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে সে দাঁড়িয়েছিল সে-ঘরের দিকে দৃষ্টি দিতে তার মন চায় নি। এবং সে-জন্যে নিদারুণ সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করার চেষ্টায় বিলম্বও হয়েছিল।

তারপর কখন উঠানটি সহসা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ে। রাত হয়েছে তা প্রথমে সে বুঝতে পারে নি কারণ ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে-আসা, লেপাজোকা তকতকে উঠানে ছায়া জমে ওঠা—এ-সব লক্ষ্য করে নি। বিহ্বলতা কাটলে সে ভাবে, তবে রাত্রি নেবেছে, যে-রাত এমনিভাবে অন্যত্রও নেবেছে : তার দেশের বাড়ির সামনে ধানক্ষেতে, দূরে শান্ত খালটিতে, আরো দূরে চাঁদবরণঘাটের পাশে বড় নদীর বুকে। অকারণে এ-সময়ে মা আমেনা খাতুনের কথাও একবার তার মনে পড়ে, যার কথা কদাচিৎ মনে হয় তার; মাতা-পুত্রের মধ্যে যদি স্নেহের ধারা প্রবাহিত হয়ে থাকে সে-ধারা ভূমিগর্ভস্থ ধারার মতোই অদৃশ্য—তা চোখে দেখা যায় না, তার কলতানও কানে পৌঁছায় না। তবে সে-ধারাটি দৃশ্যমান হলেও কয়েক মুহূর্তের জন্যেই হয় কেবল।

কখন চিলেকোঠা থেকে নেবে এসেছিল মনে নেই, যদিও চিলেকোঠা থেকে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেবে আসতে কিছু কষ্ট হয়ে থাকবে। যা মনে পড়ে তা এই : লণ্ঠনের পলতেটা উঁচিয়ে আলোটা বাড়িয়ে শোবার-ঘর এবং ভেতরের বারান্দার চৌকাঠের পাশে লণ্ঠনটি স্থাপন করে চৌকিতে এসে বসেছে, দৃষ্টি মেঝের দিকে। তবে দৃষ্টি মেঝের দিকে হলেও কলিজাটি সে সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছে : কলিজাটি কাঁপছে থরথর করে, আগের মতোই অশান্তভাবে, তবে আগের চেয়ে আরো জোরে। কিছুক্ষণ চৌকির ওপর স্থির হয়ে বসে থাকার পর সে বুঝতে পারে কলিজাটির মতো চৌকিটিও যেন কাঁপতে শুরু করেছে, প্রথমে মৃদুভাবে, তারপর প্রবলভাবে।

চৌকিটা অবশেষে স্থির হয়। এবার সে ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি দেয়, যেন সে-ঘর এবং সে-ঘরের জিনিসপত্র আগে দেখে নি। ঘরে বিশেষ কিছু নেই। চৌকিটা ছাড়া আসবাবপত্রের মধ্যে একটি ছোট টেবিল, ওধারে একটি আলনা যেখান থেকে কিছু কাপড়চোপড় ঝোলে। আলনার কাছে একজোড়া ইংরেজি জুতা। জুতাজোড়াটি নূতন, কুমুরডাঙ্গায় আসার কিছুদিন আগে কিনেছিল, এখনো তা পরে হাঁটলে পায়ের গোড়ালির পেছনে ব্যথা করে। জুতাজোড়ার পাশে একটি গাঢ় খয়েরি রঙের চামড়ার সুটকেস। সেটিও নূতন। তার ভেতরে কী, সে জানে। একটি চারখানা নকশার লুঙ্গি, একটি শার্ট, একটি সবুজ রঙের আলোয়ান, এবং দু-একটা পুরাতন বই। একটি বই বেশ পুরাতন। সেটি ইংরেজি অভিধান, অনেকদিনের সম্পত্তি। মলাট ছেঁড়া, প্রথম দু-চারটি পাতা কবে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তবে এখনো মনে পড়ে, একদিন অভিধানটির প্রথম কি দ্বিতীয় পাতায় সে একটি লম্বা ধরনের নাম সযত্নে বড় বড় অক্ষরে লিখেছিল। তার পিতৃদত্ত নাম মুহাম্মদ মুস্তফা, তবে সে যখন নবম শ্রেণীতে উঠেছে তখন ঝোঁকের মাথায় নিজের নামে বাহার তুলে বই-খাতাপত্রে লিখতে শুরু করে : চৌধুরী আবু তালেব মুহাম্মদ মুস্তফা। তারা চৌধুরী নয়, আরবি শব্দ নিয়ে খেলা করার পাণ্ডিত্যও তার নেই, তাছাড়া এ-ও তার অজানা ছিল না যে অনেকে নামের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে নিজের দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করলেও মানুষ আবার যা অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত তা দ্বিরুক্তি না করে প্রত্যাখ্যান করে বলে লম্বা নামধারী লোকেরা অতি সংক্ষিপ্ত, এমনকি দুদু মিঞা সোনা মিঞা এ-সব বাল্যকালের হাস্যকর উপনামেই পরিচিত হয়ে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে। তবে তাতে সে দমিত হয় নি।

সুটকেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এমন সময় সেটি অকস্মাৎ কাঁপতে শুরু করে : সুটকেসটি যেন একটি শুষ্করক্ত গাঢ় রঙের কলিজায় পরিণত হয়েছে। সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। হয়তো এবার দরজার নিকটে স্থাপিত লণ্ঠনের দিকে তাকায়। তবে কলিজাটি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেখানেও হাজির হয় এবং আকারে সহসা ছোট হয়ে লণ্ঠনের গায়ে পতঙ্গের মতো ডানা ঝাপটাতে শুরু করে। মুহাম্মদ মুস্তফা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এই আশায় যে,

BanglaBook.org

পতঙ্গটি পুড়ে মারা যাবে, তার চঞ্চল ক্ষুধার্ত ডানা স্তব্ধ হবে, কিন্তু পতঙ্গটি স্তব্ধ হয় না। এবার মেঝের দিকে তাকালে সেখানেও কলিজাটি দেখতে পায়; মেঝের ওপর সেটি ডাঙায় তোলা মাছের মতো ধড়ফড় করছে যেন। সে আশা করে পানির অভাবে শীঘ্র মাছটির ধড়ফড়ানি শেষ হবে, তার দেহ স্থির হয়ে পড়বে, কিন্তু তাও হয় না, পতঙ্গের মতো মাছটিও ধড়ফড় করতে থাকে। বিচিত্র কলিজাটি সত্যই অমর : আগুনে তা দগ্ধ হয় না, দম বন্ধ হলেও তার শ্বসনকার্য থামে না।

হয়তো অমর কলিজাটির কথা ভুলবার জন্যেই এবার সে কিছু ভাববার চেষ্টা করে, যা মনে আসে তাই, অনির্দিষ্ট তুচ্ছ কথা। প্রতিবেশীর বাড়ির উঠানের কথা, সে-বাড়ির বউ-এর কথা, তার দাঁড়াবার ভঙ্গির কথা। তারপর গরুটির কথা ভাবে; সেদিন সকালে খুঁটিবাঁধা একটি গরু কী করে মুক্তি পেয়ে গলায় দড়ি নিয়েই পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকেছিল। তার সে উকিলটিকে দেখতে পায় : শীর্ণ চোয়াল-উঁচু মুখ, কানের নিচে গলা পর্যন্ত মস্ত জন্মদাগ, চোখে অশ্রান্ত ধূর্ততা। এবার আরেকটি মানুষের মুখ দেখতে পায় যাকে সে চেনে না; পথেই তাকে দেখে থাকবে। লোকটির মুখভরা বসন্তরোগের চিহ্ন, চোখে হাবাগোবা ভাব, থুতনির নিচে হাল্কা দাড়ি। তবে যাই সে ভাবুক, যে-চিত্র বা দৃশ্য তার চোখে ভেসে উঠুক না কেন, থরথর করে কাঁপতে থাকা বস্তুটির হাত থেকে নিস্তার পায় না : সেটি যেন চোখের পর্দায় স্থান পেয়েছে। সেটি তার বুকেও স্থান পায় নি কি? মনে হয় কলিজাটি তার বুকের মধ্যে ধুকধুক করে কাঁপতে শুরু করেছে ; কলিজাটি তার হৃৎপিণ্ডকে আঁকড়ে ধরেছে। হয়তো অনেক রাত হয়েছে, চতুর্দিকে গভীর নীরবতা। সে-নীরবতার মধ্যে কলিজার স্পন্দন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে, যেন একনাগাড়ে কেউ ঢেঁকি চালিয়ে যাচ্ছে। অদূরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে খোদেজা অপেক্ষা করে।

তখনই কি তাবিজগুলি খুলতে শুরু করে? সময়টা মনে নেই। তবে মনে পড়ে তাবিজগুলি খুলতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। পুরাতন গিঠটা খুলতে পারে নি, কালো রঙের সূতাটা অনেক পুরানো হলেও তা লোহার শৃঙ্খলের মতো শক্ত মনে হয়েছিল। হাতের পেশিতে বিপুল শক্তি প্রয়োগ করে অবশেষে সূতাটি ছিঁড়ে ফেলতে সক্ষম হয়। তারপর আরেকটি দৃশ্য মনে পড়ে। শোবার ঘরের পাশের কামরায় ওপরে কড়িকাঠে লাগানো হুকটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে—যে-হুক্ থেকে এ-বাড়ির আগের বাসিন্দারা শীতের দিন শেষ হলে লেপ-কম্বল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত। মনে হয় শোবার ঘর থেকে টেবিলটা এনেছিল, সে-টেবিলের ওপর একটি কাঠের চেয়ারও তুলেছিল। দড়িটার কথা মনে নেই। নিঃসন্দেহে দড়িটাও এনে থাকবে।

তবে সে-সময়েই সে ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করে। কী ভীষণ সে-কাঁপুনি। দেখতে-না-দেখতে সমস্ত দেহ একটি অদম্য কাঁপুনিতে পরিণত হয়—যে-কাঁপুনিতে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্ত্র-তন্ত্র মাংসপেশি স্নায়ু শিরা-উপশিরা আলগা হয়ে পড়ে, ভেঙে যায়। তারপর সে আর কিছু করতে পারে নি, কিছু দেখতেও সক্ষম হয় নি।

পরদিন বেশ সকালে-সকালে সে কুমুরডাঙ্গা ত্যাগ করে।

তবারক ভুইঞা বলছিল : কখনো-কখনো মানুষের বিশ্বাসে পর্বত জাগে, মরুভূমিতে পদ্মা-যমুনার মতো বৃহৎ ধারার সৃষ্টি হয়। বাকাল নদীর বুকে নানা প্রকার মূল্যবান-মূল্যহীন জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলার কয়েক দিনের মধ্যেই শহরবাসীদের সহসা মনে হয়, ফাঁড়া কেটেছে। সঙ্গে-সঙ্গে যে-আশঙ্কায় ক-দিন ভীতবিহ্বল হয়েছিল সে-আশঙ্কাও কমে। ধীরে-ধীরে কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা ভয়মুক্ত হয়, একটি কাল্পনিক বিপদের সম্ভাবনা তাদের মনে যে-ছায়ার সঞ্চার করেছিল, সে-ছায়া দূর হয়। তবু সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিস্থ হতে তাদের কিছু সময় লাগে, যেন ঘটনাটি কোথাও একটি গভীর ক্ষত রেখে গিয়েছে। তারা নিস্পৃহ নিরানন্দ হয়ে থাকে, ভয় কাটলেও কোথাও আশার কিছু দেখতে পায় না, দুশ্চিন্তা দূর হলেও সুখচিন্তার কারণ খুঁজে পায় না।

BanglaBook.org

তারপর নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ-হয়ে-যাওয়া স্টিমারঘাটের স্টেশনমাস্টার খতিব মিঞা কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের মধ্যে জীবনসঞ্চার করে।

একদিন খতিব মিঞা খবর পায়, কোম্পানির চাকুরি থেকে তাকে অবসর দিয়ে দেয়া হয়েছে। খবরটা তাকে গভীরভাবে বিচলিত করে। তবে শেষরাতে উঠে হুঁকা ধরিয়ে ভেতরের উঠানে বসে আপন মনে বিষয়টা ভেবে দেখে স্থির করে, সেটি তেমন দুঃখের কথা নয়। অবসরের সময় ঘনিয়ে এসেছিল, কেবল বছরখানেকের মতো বাকি ছিল চাকুরির মেয়াদ, যা কাল হত তা না-হয় আজ হয়েছে। বড় কথা এই যে, কোম্পানি শূন্য-হাতে বিদায় দিচ্ছে তা নয়, নিয়মমাফিক ক্ষতিপূরণ দেবে। বলতে গেলে ব্যাপারটি বেশ লাভজনকই। হাতে কিছু কাঁচা টাকা পাবে; এত টাকা একসঙ্গে জীবনে কখনো সে দেখে নি। তাছাড়া বিনাকাজে পাবে বলে তা মুফতে-পাওয়া টাকার মতোই মনে হবে। এত বছর ধরে যাদের খেদমত করেছে গভীর আনুগত্যের সঙ্গে, যাদের নুনও খেয়েছে, তাদের বিবেচনাজ্ঞান ন্যায়পরতার প্রমাণে খতিব মিঞার চোখ কৃতজ্ঞতায় একটু সজল হয়ে ওঠে।

তবে একটি বিষয় তাকে বড়ই চিন্তিত করে তোলে। এবার কোথায় যাবে, কোথায় তার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাবে? সে জানে, তিন ঘাট দূরে তালগাছের পাশে ডোবার ধারে তার দেশের বাড়িতে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। সেখানে তার জায়গা কোথায় ? গ্রামবাসী দুটি ভাই-এর ক্রমবর্ধমান পরিবার কোথাও একটু ফাঁক রেখেছে কি? তাছাড়া বহুদিন স্টিমার-কোম্পানির চাকুরির উপলক্ষে বাইরে-বাইরে জীবনযাপন করার ফলে পৈতৃক বাড়ির ওপর একদিন যে স্বত্বাধিকার ছিল তা যেন কী করে হারিয়ে ফেলেছে। তা দাবি করা যায় বটে কিন্তু দাবি করার সাহস হবে না। অবশ্য পৈতৃক ভিটার পাশে কিছু জমি কিনে আস্তানা গাড়ার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু কী কারণে তাও সম্ভব মনে হয় না। আসল কথা, ভাইদের সঙ্গে কি পাশে বাস করতে পারবে না। কথাটি আগে পরিষ্কারভাবে ভেবে দেখার অবকাশ হয় নি, প্রয়োজনও পড়ে নি, কিন্তু আজ না-ভেবে উপায় নেই। ভাইদের সঙ্গে তেমন আর মিল কোথায়? এতদিন কোম্পানির চাকুরি করার ফলে তাদের রুচি আর এক নয়। তার বড় ছেলেটা বি. এ. ফেল হলেও পাটের কলে চাকুরি নিয়েছে, মেয়েটাও কিছু পড়াশুনা করেছে, ভাইদের ছেলেমেয়েদের মতো অজ্ঞ মূর্খ বা চাষাভুষা থেকে যায় নি। কয়েক বছর আগে বৃদ্ধা গর্ভধারিণীর মৃত্যু ঘটলে তার দাফন-জানাজার জন্যে খতিব মিঞা সেই যে একবার দেশে গিয়েছিল তারপর আবার যাবার সুযোগ হয় নি, প্রবৃত্তিও হয় নি। হয়তো সে-বারই বুঝেছিল সেখানে আর কখনো ফিরে যেতে পারবে না। না, দেশের বাড়ি চিরতরেই ছেড়েছে।

কিন্তু কোথায় যাবে, কোথায়-বা জীবনের শেষ কয়েকটি দিন অতিবাহিত করবে? সে বেশ ভাবিত হয়ে পড়ে, কারণ সপ্তাহখানেকের মধ্যে নদীর তীরে কোম্পানির যে-বাড়িতে গত পাঁচ বছর বসবাস করেছে তা ছেড়ে দেবার পর কোথায় যাবে তা ভেবে উঠতে পারে না। এবার অবসরপ্রাপ্তি ভয়াবহ রূপই ধারণ করে।

যখন খতিব মিঞার মনে হয় যাবার কোনো জায়গা নেই তখনই সহসা সে ভাবে, কোথাও যাবে না, কুমুরডাঙ্গাতেই থেকে যাবে। এ-শহরে তার জন্ম হয় নি, বাড়িঘর নেই, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব বলেও কেউ নেই, তবু একনাগাড়ে পাঁচ-পাঁচটি বছর কাটিয়েছে। এ-শহরে থেকে গেলে ক্ষতি কী?

রাতের গুমোট ভেঙে হঠাৎ ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে শুরু করে, যে-হাওয়া চিন্তায় টান্-হয়ে-থাকা কপালে এসে লাগলে সহসা খতিব মিঞার মনে হয় জ্বর ছেড়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আপন মনে বলে, না, কোথাও যাবে না, কুমুরডাঙ্গায় থেকে যাবে, এ-শহরেই কোথাও একটু জমি কিনে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করবে। পূর্বাকাশে যখন প্রত্যুষের ক্ষীণ ধূসর আলো দেখা দেয় তখন খতিব মিঞা মনে-প্রাণে শান্ত বোধ করে, অবসরপ্রাপ্তি আর ভয়াবহ মনে হয় না।

BanglaBook.org

তখন বেশ বেলা হয়েছে। কী খেয়ালে ঈদ-মিলাদের জন্যে শোভনীয় পোশাক পরে, কানের পেছনে একটু আতর লাগিয়ে খতিব মিঞা বেরিয়ে পড়ে কাছারি-আদালত এবং বাজার অভিমুখে, মাথায় ছাতা, পদক্ষেপ ধীরস্থির; অবসরপ্রাপ্ত মানুষের আবার তাড়াহুড়া কিসের? নদীর ধার দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর পথটি নদীর তীর ছেড়ে হঠাৎ সোজা হয়ে পাকা সড়কের রূপ ধারণ করে, নদীর দিকে কয়েকটি বাড়িঘর দেখা দেয়। তবে কাছারি-আদালতের সামনে পৌঁছুলে সে-সব বাড়িঘর আবার অদৃশ্য হয়ে পড়ে; আদিগন্ত দৃষ্টি ছুটে যেতে আর বাধা থাকে না। তবে নদীর পানে সে তাকায় না; বহুদিন নদীর তীরে বসবাস করেছে বলে নদীতে তার কৌতূহল নেই। তাছাড়া নদীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি চিরতরে ছিন্ন হয় নি? নদীর দিকে নয়, এবার যে-কাছারি-আদালত এবং তার সামনে যে-মাঠটি দেখতে পায় সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে সে একটু ইতস্তত করে থেমে পড়ে, যেন এগুতে কেমন ভয় হয়। তবে শীঘ্র আবার হাঁটতে শুরু করে। মাঠে নাবার আগে আরেক দফা থেমে একটি পান-সিগারেটের দোকান থেকে পান কেনে, একটু ভেবে এক বাণ্ডিল বিড়িও খরিদ করে নেয়। এ-সময়ে সে কয়েক জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, কিন্তু কেউ কিছু না বললে মাঠে নেবে কাছারি-আদালতের দিকে রওনা হয়। সে জানে, কাছারি-আদালতের সামনে পরিচিত লোকের অভাব হবে না। এ-শহরে পাঁচ বছর কাটিয়েছে, কত লোক তার হাতে টিকিট কিনেছে, কত লোক তারই সঙ্গে স্টিমারের জন্যে অপেক্ষা করেছে। তবে সে যে-কোনো বিশেষ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে কোনো ইচ্ছা বোধ করে তা নয়। তার মনে হয় কুমুরডাঙ্গার যে-কোনো লোক হলেই চলবে, যা তার বলার সাধ জেগেছে তা কোনো বিশেষ কারো জন্যে নয়, সমস্ত শহরের জন্যে; এ-শহরের সকলের মধ্যেই সে কি বাস করবে না ? সে আর কোম্পানির লোক নয়, বিদেশীও নয়, তাদেরই একজন।

বার-লাইব্রেরির নিকটবর্তী হলে খতিব মিঞা বুঝতে পারে তাকে দেখে অদূরে কে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে দেখে, উকিল আরবাব খান। বয়স বেশি নয়, তবে ইতিমধ্যে আরবাব খান বিচক্ষণ উকিল হিসেবে নাম অর্জন করেছে। কেমন অন্তরবিদ্ধ-করা ধারালো দৃষ্টিতে উকিল তার দিকে তাকিয়ে, স্বাভাবিক নীরস গম্ভীর মুখে একটা বিরূপভাব সুস্পষ্ট। তাকে দেখেই যে উকিলের মুখে বিরূপভাব দেখা দিয়েছে সে-বিষয়ে খতিব মিঞার সন্দেহ থাকে না। স্টিমার-কোম্পানি তাদের প্রতি একটি গুরুতর অবিচার করেছে—এমন একটি ভুল ধারণার জন্যে স্টিমার-কোম্পানি এবং কোম্পানির কর্মচারীদের ওপর শহরবাসীদের মনে যে-রাগ দেখা দিয়েছিল সে-রাগ হয়তো সম্পূর্ণভাবে কাটে নি।

"ছুটি পেলাম।" হেসে তাড়াতাড়ি বলে খতিব মিঞা।

"মানে?"

"আমার অবসর হয়ে গেল। স্টিমারঘাট বন্ধ হল, আমার চাকুরিজীবনও শেষ হল।" এবার উকিল আরবাব খান কিছু না বললে আবার দ্রুতকণ্ঠে বলে, "অবসর হত একদিন, তা হয়েছে। সে-কথা নয়। ঠিক করেছি কুমুরডাঙ্গায়ই থেকে যাব।"

উকিল আরবাব খানের চোখে কী-একটি ছায়া দেখা দেয়। হঠাৎ খতিব মিঞা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। সে বুঝতে পারে, আজ সকাল থেকে নিজেকে সহসা কুমুরডাঙ্গার অধিবাসী বলে গণ্য করতে শুরু করলেও এ-শহরের অধিবাসীদের চোখে সে বিদেশী মাত্র। এ-শহরে পাঁচ-পাঁচটি বছর কাটালেও এ-শহরে ঠিক বাস করে নি, কারণ ডাঙায় থেকেও সে ঠিক ডাঙায় থাকে নি। তাছাড়া এ-শহরের সমাজে যদি একটি ছোটখাটো স্থান দখল করেছিল, কিছু মানসম্মানের অধিকারী হয়েছিল, সে-সবের সূত্র ছিল স্টিমার-কোম্পানি; সে-সূত্র ছিন্ন হয়েছে। এখন কোম্পানির রক্ষাবর্ম ছাড়া শুধুমাত্র খতিব মিঞা হিসেবে একাকী কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের একজন বলে, তারা তাকে গ্রহণ করুক—এই প্রার্থনা নিয়ে। তার সহসা ভয় হয়, তারা কি তাকে আশ্রয় দেবে, তাদেরই

BanglaBook.org

একজন বলে গ্রহণ করবে ?

উত্তেজিত হলে বা মনে কোনো আশঙ্কা দেখা দিলে খতিব মিঞার জবানে তোতলামির ভাব জাগে। তো-তো করে সে আবার বলে, "বুঝলেন না, এ-শহরে মন পড়ে গিয়েছে। সে-জন্যেই ঠিক করেছি এ-শহরে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব।"

উকিল আরবাব খানের মুখভাবে কোনো পরিবর্তন হয় না, তবে ছায়াটি যেন কাটে; হয়তো বিরূপভাবটি ঈষৎ নরম হয়।

কাছারি-আদালতের সামনে কিছু সময় কাটিয়ে খতিব মিঞা আবার বাজারের দিকে রওনা হয়। বাজারের পথে প্রবেশ করার আগে সে-ই থমকে দাঁড়ায়, কারণ সে দেখতে পায় ডাক্তার বোরহানউদ্দিন এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে খতিব মিঞার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কারণ সে জানে লোক হিসেবে ডাক্তার বোরহানউদ্দিন বড় ভালো, তার মধ্যে কোনো কুটিলতা নেই, দেমাগ-অহঙ্কার নেই। তার সামনাসামনি হলে খতিব মিঞার মুখ দিয়ে অজস্র শব্দ বেরিয়ে আসে আথালি-বিথালিভাবে। তার অবসরপ্রাপ্তি, ক্ষতিপূরণের বিষয়ে বিবেচনাজ্ঞানশীল ষ্টিমার-কোম্পানির সিদ্ধান্ত, অবসরজীবন সম্বন্ধে নানা পরিকল্পনা, পাটকলের কর্মচারী-ছেলের ভবিষ্যৎ—কত কথাই-না সে বলে। হয়তো তার এই খেয়াল হয়, কুমুরডাঙ্গা শহরের অন্তরে স্থান পেতে চাইলে সে-শহরের অধিবাসীদের প্রথমে তার অন্তর উন্মুক্ত করে দেখানো দরকার। তবে কুমুরডাঙ্গার বিষয়ে বলতে গিয়ে সে সহসা বেসামাল হয়ে পড়ে।

"প্রথম দিনই শহরটা ভালো লেগেছিল। বুঝলেন না, এ-শহরে বড় মায়া পড়ে গিয়েছে। কী করে কুমুরডাঙ্গা ছেড়ে যাই বলুন?"

অবশেষে ডাক্তার বোরহানউদ্দিনকে রেহাই দিয়ে খতিব মিঞা বাজারের পথে পা বাড়ায়। ততক্ষণে মনে-প্রাণে বেশ উৎফুল্ল বোধ করতে শুরু করেছে, কী-একটা উত্তেজনায় পদক্ষেপ দ্রুত হয়ে উঠেছে। কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময়ে নম্রকণ্ঠের সম্ভাষণে ফিরে তাকিয়ে দেখে অপরিচিত একটি যুবক স্মিতমুখে তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়িয়ে। যুবকটি তার পরিচয় দিলেও তাকে চিনতে পারে না, কিন্তু উচ্চকণ্ঠে বলে, "কেন চিনব না, খুব চিনি আপনাকে। ধরতে গেলে আমি এ-শহরেরই মানুষ। যা বাকি ছিল তা এবার পূর্ণ হল। বুঝলেন না, এ-শহরেই থাকব ঠিক করেছি। যাবার জায়গার অন্ত নেই, তবে এ-শহরে যেন শিকড় গজিয়ে ফেলেছি।" হঠাৎ থেমে অপ্রত্যাশিতভাবে যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করে, "এদিকে লোকেরা পানের বরজ করে নাকি?"

প্রশ্নটি অপ্রত্যাশিত হলেও অর্থহীন নয়। বাল্যকাল থেকে পানের বরজের প্রতি খতিব মিঞার একটি দুর্বোধ্য আকর্ষণ। সময়-অসময়ে খবরাখবর নিয়ে কোমলপ্রাণ পানপাতার লালন-পালনের কলাকৌশল সম্বন্ধে বেশ কিছু জ্ঞান অর্জনও করেছে এই আশায় যে একদিন সুযোগ পেলে বরজ দেবার স্বপ্ন কার্যে রূপান্তরিত করবে। হঠাৎ পুরাতন শখটি জাগে তার মনে। ভাবে, কুমুরডাঙ্গায় কিছু জমি নিয়ে বাড়ি করতে পারলে একটা পানের বরজ দেবে। "বুঝলেন না, এ-জমিতে যা লাগাবেন তাই ফলবে। সোনার জমি আর কি।"

বাজারের পথের দু-পাশে এ-দোকানে সে-দোকানে কিছু কিছু সময় কাটায় খতিব মিঞা, কিন্তু ছলিম মিঞার সাইকেলের দোকানেই আড্ডা জমে যায়; হয়তো দুজনেই অবিলম্বে পরস্পরের গাছ-লতাপাতা করবার শখটি আবিষ্কার করে। তবে শীঘ্র পানের বরজের কথা ভুলে গিয়ে খতিব মিঞা আবার কুমুরডাঙ্গা সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে এমন সব কথা বলতে শুরু করে যা আগে কখনো তার মাথায় আসে নি, এবং যা বলতে গিয়ে নিজেই কী-একটা ভাগাবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে।

"বুঝলেন না, সারা জীবন এখানে-সেখানে ঘরছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, এবার এক জায়গায় আরাম করে বসতে পারব। তবে সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা, যে-জায়গায়

BanglaBook.org

একবার মানুষের মন পড়ে যায় সে-জায়গায় বাস করার সুযোগ পেলে সে আর কিছু চায় না। কিন্তু যে-সে জায়গায় কি আবার মন পড়ে? জায়গা এমন হওয়া চাই যার মাটি মনে ভয় সৃষ্টি করে না। কুমুরডাঙ্গায় পা দিয়েই বুঝেছিলাম এ-মাটিতে ভয় নেই। মৃত্যুর পর এমন মাটির বুকে আশ্রয় নিতে পারা বড় সৌভাগ্যের কথা।"

ছলিম মিঞার ভ্রূর মধ্যস্থ গভীর রেখাগুলি পূর্ববৎ জেগে থাকলেও তাদের গভীরতা হ্রাস পায় যেন। অল্পক্ষণ নীরবতার পর সে জিজ্ঞাসা করে,

"কোম্পানির বাড়ি ছাড়ার পর কোথায় যাবেন ?"

খতিব মিঞা এ-পর্যন্ত সে-বিষয়ে একবারও ভাবে নি। কিছু অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দেয়, "একটা ছোটখাটো বাড়ি ভাড়া করে নেব। বাড়ি তোলা পর্যন্ত— "

মেঝের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ছলিম মিঞা সহসা মুখ তোলে, যেন কোনো ব্যাপারে সে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

"মনের মতো ভাড়াটে বাড়ি যতদিন না পান ততদিন আমার ওখানেই থাকবেন। দুটিমাত্র প্রাণী, ছেলেপুলে নেই। আপনাদের কোনো তকলিফ হবে না।"

অল্প সময়ের জন্যে অবসরপ্রাপ্ত স্টেশনমাষ্টার খতিব মিঞা বাক্যহারা হয়ে পড়ে, তারপর তার চোখের প্রান্তে হয়তো অশ্রুর আভাস দেখা দেয় বলে সেখানে ঈষৎ উজ্জ্বল কিছু নজরে পড়ে। পরে একটু ভাঙ্গা গলায় উত্তর দেয়, "তা আপনার ওখানেই থাকব।" এবার তার চোখের পানি পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

শুধু খতিব মিঞার নয়, শহরের অনেক লোকের চোখ সেদিন অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, কারণ খতিব মিঞা কুমুরডাঙ্গা সম্বন্ধে তার মাটি সম্বন্ধে যে-সব কথা বলে বেড়ায় তা অবিলম্বে সকলের কর্ণগোচর হয়; কুমুরডাঙ্গা সম্বন্ধে এমন সব কথা কেউ কখনো বলে নি। সহসা সেদিন থেকে সকলের মধ্যে নূতনভাবে জীবনসঞ্চার হয়, নৈরাশ্য নিরানন্দভাব দূর হয়।

দূরে রাতের অন্ধকারে সহসা ঘাটের আলো জেগে ওঠে : অনেক নদনদী অতিক্রম করে এ-ঘাট সে-ঘাটে থেমে যে-ষ্টিমারটি সেই সকাল থেকে চলছে তার চলা শেষ হতে আর দেরি নেই। ঘাটে আলো দেখে যাত্রীরা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে, যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগারে অকস্মাৎ আলোকরশ্মি এসে পড়লে দরজা খুলে গিয়েছে বুঝে কয়েদিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। নিমেষের মধ্যে তাদের কণ্ঠস্বরে ষ্টিমারের এ-মাথা থেকে ও-মাথা মুখরিত হয়ে পড়ে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে তারা স্থলে অবতরণ করার জন্যে তৈরি হয়। এবার তবারক ভুইঞা থামে, তারপর তার সামান্য তল্পিতল্পা গুছিয়ে নেবার জন্যে উদ্যত হয়।

আমি একটু নিরাশ হয়ে ভাবি : তবে মুহাম্মদ মুস্তফার নামটি একবারও উল্লেখ না করে তবারক ভুইঞা চলে যাবে। তার সঙ্গে হয়তো আবার কখনো দেখা হবে না; যে-ঘাটে আমরা দুজনেই নাবব সে-ঘাটে শুধুমাত্র একটি দিন কাটিয়ে পরদিনই আমার ফিরে যাবার কথা।

মুহাম্মদ মুস্তফার বিষয়ে তার এই মৌনতার কারণ কী? কুমুরডাঙ্গা নামক শহরের যে-বিচিত্র কাহিনী সে আমাদের বলে শুনিয়েছে তার সঙ্গে হয়তো মুহাম্মদ মুস্তফার কোনো যোগযোগ ছিল না, তবু কোনোপ্রকারে তার নামটি কি একবার মুখে নিতে পারত না? সে কি তার কথা ভুলে গিয়েছে, না কোনো কারণে এসব লোকের নাম-ধাম-বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ স্মৃতিপটেও তাকে স্থান দেয় নি? ইচ্ছা হয় সরাসরি জিজ্ঞাসা করি মুহাম্মদ মুস্তফার কথা তার মনে পড়ে কিনা, পড়লে কুমুরডাঙ্গা ছেড়ে যাবার পর তার কী হয়েছিল, সে কী করেছিল—তা জানে কিনা। তবে জিজ্ঞাসা করা হয় না, কারণ মনে হয় মুহাম্মদ মুস্তফার বিষয়ে তার মৌনতা অনিচ্ছাকৃত নয়। সে সব জানে এবং সব জানে বলেই, তার নাম নিতে পারে নি। হয়তো তার কথা সে ভালোভাবে বোঝেও না; মানুষ যা বোঝে না সে-বিষয়ে সে কিছু বলতে চায় না। হয়তো কে জানে, যা ঘটেছিল তার জন্যে সে নিজেকে কোনো প্রকারে দায়ী মনে করে।

BanglaBook.org

মুহাম্মদ মুস্তফা কুমুরডাঙ্গা থেকে ঢাকা যায় নি, তার সুহৃদ বন্ধু তসলিম বা আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে নি, সোজা দেশের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল—চোখে ঘুমাভাবের রুক্ষতা, মুখে কী-একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। বেশভূষায় নূতন হাকিমের কোনো চিহ্ন ছিল না : মাথার চুল উস্কখুস্ক, পরনের লুঙ্গির প্রান্তভাগ কর্দমাক্ত, ছাত্রবয়সে কখনো-কখনো যেমন হাতে জুতা নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হত তেমনি হাতে একজোড়া নূতন জুতা। চেহারা দেখেই বুঝেছিলাম কিছু একটা হয়েছে। মা-জান পরে বলেছিল, সে যখন সন্ধ্যার কিছু আগে নিঃশব্দে উঠানের প্রান্তে দেখা দেয় তখন কী কারণে বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল। তবে আমার বা বাড়ির অন্য কারো সাহসে কুলায় নি জিজ্ঞাসা করি তার কী হয়েছে, কেন এমন চেহারা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। তার মা আমেনা খাতুন সে-রাতেই তার জন্যে ভাপা পিঠা বানাতে বসে। তবে হাতে কেমন জড়তা বোধ করেছিল বলে সেবার তা তেমন মুখরোচক হয় নি।

আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি। জানতাম, মুহাম্মদ মুস্তফা নিজে থেকে না বললে তার কাছ থেকে কিছু জানতে পারা সহজ নয়। এ-ও জানতাম, বলবার কিছু থাকলে বা বলবার ইচ্ছা হলে এক সময়ে আমাকেই বলবে।

হয়তো দ্বিতীয় দিন সে বলে। বলে ধীরে-ধীরে, একটু-একটু করে, এমনভাবে যেন অন্য কোনো মানুষের কথা বলছে, বা যা-বলছে তা নিজের কাছেই অসম্ভব মনে হয়। সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল তা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারে নি। প্রথমে আমাকে আন্দাজ-অনুমান করতে হয়, পরে খণ্ড-খণ্ড কথা একত্র করে অত্যাশ্চর্য কথাটি বুঝতে সক্ষম হই। তবে তা সত্য মনে হয় নি, নিদারুণ ভীতির জন্যে কাজটি করতে পারে নি তাও বিশ্বাস করি নি; মূল কথায় বিশ্বাস না হলে আনুষঙ্গিক কথায় কি বিশ্বাস হয়? হয়তো-বা আমার মনে হয়, সে যদি আত্মহত্যার চেষ্টা করেও থাকে তাহলেও গোড়া থেকেই জানত শেষপর্যন্ত তাতে সফল হবে না কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল যে-কাল্পনিক প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মা তাকে ভীতিবিহ্বল করে তুলেছিল তাকেই ফাঁকি দেয়া : ফাঁকি দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয় জেনেও কোনোপ্রকারে ফাঁকি দিতে সক্ষম হবে—এমন একটা আশা মানুষ কখনো ছাড়তে পারে না।

তবে একটি কথায় বড়ই বিস্মিত হই। সেটি এই যে, খোদেজা তার জন্যে আত্মহত্যা করেছে—বাড়ির লোকেদের এই ভিত্তিহীন অমূলক ধারণাটি কী করে মুহাম্মদ মুস্তফা বিশ্বাস করে নিয়েছে। কিন্তু কেন বিস্মিত হয়েছিলাম? সে কি সব কথাই নির্বিবাদে মেনে নেয় না? সে যে তা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিল, তাই কি অস্বাভাবিক নয়? কে জানে, খোদেজা তার জন্যে আত্মহত্যা করেছে—এমন কথা সে বিশ্বাস করে তা আমার পছন্দ হয় নি।

আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম, তবে প্রথমে মুহাম্মদ মুস্তফার মনের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারি নি : কারো চিন্তাধারা কোনো বিশেষ সীমানা অতিক্রম করে গেলে সে কীভাবে কেন ভাবে—এ-সব বোঝা দুষ্কর। আমি অনেক কথাই বুঝতে পারি নি। এ-কথাও বুঝতে পারি নি যে আমিই তাকে রক্ষা করতে পারব—এই বিশ্বাসে মরিয়া হয়ে সে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে।

আমার অবিশ্বাস্য মনে হলেও সে সত্যিই আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল। এমন একটি নিদারুণ কাজ করতে বসেছিল তা নিজেই উপলব্ধি করলে সে ভয়ানকভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে, এ-ও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে তার মধ্যে সাংঘাতিক কিছু না-ঘটলে এমন একটি কাজ করার কথা ভাবতেও পারত না। কিন্তু তার মানসিক বিভ্রান্তি যদি ঘটে থাকে তার কারণ কী ? সে কেবল একটি উত্তরই খুঁজে পায়। তার মনে হয় যে-মেয়েটি আত্মহত্যা করে একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মায় পরিণত হয়েছে, তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে শুরু করছে, সে-ই দায়ী তার বিভ্রান্তির জন্যে, সে-ই তাকে মৃত্যুর দ্বারে নিয়ে গিয়েছিল; তার কার্যকলাপ

BanglaBook.org

আর তার ক্ষমতার অধীন নয়, মেয়েটির আত্মা তার মন দখল করে তার ইচ্ছাশক্তি কাবু করে ফেলেছে, তাকে পরিচালিত করেছে নির্দয় ধ্বংসকারিণীর রূপ নিয়ে। চমকিত হয়ে সে এবার অনেক কিছুর মধ্যে গূঢ় অর্থ দেখতে পায়। যে-দিন বিয়ে করার উদ্দেশ্যে কুমুরডাঙ্গা থেকে স্টিমারযোগে ঢাকা অভিমুখে রওনা হবে সে-দিনই কেন স্টিমার-চলাচল বন্ধ হবে, পরদিন কি বন্ধ হতে পারত না? তারপর সহসা তার জ্বরে পড়া, আরোগ্যলাভ করেও ঢাকা যাওয়ার বিষয়ে গড়িমসি বা হচ্ছে-হবে ভাব, পরে তসলিমের চিঠি বা তারের জবাব না দেয়া। এ-সবের পশ্চাতে সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মার ইচ্ছাই নিহিত : তার মনে হয় এ-সবের অন্য কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। যে-মেয়ে মৃত্যুর পর অবিমিশ্র জিঘাংসায় পরিণত হয়েছে, তার ক্ষমতা দেখে মুহাম্মদ মুস্তফা এবার অতিশয় ভীত হয়ে পড়ে। হয়তো এ-সময়ে সে কিছু সম্বিৎ ফিরে পায়, একটু সুস্থিরভাবে ভাবতে সক্ষম হয়। সে বুঝতে পারে তাকে কিছু করতেই হবে, যে করে হোক নিজেকে বাঁচাতে হবে। সহসা তার মনে হয়, আমার সঙ্গে দেখা করা একান্ত প্রয়োজন। আমি কী ভাবি? আমিও কি বিশ্বাস করি খোদেজা আত্মহত্যা করেছিল? আমাকে কথাটা আগে জিজ্ঞাসা করে নি, জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও বোধ করে নি। হয়তো আমি জানি তা সত্য নয়। এবং আমি যদি বলি তা সত্য নয়, বাড়ির লোকেদের ধারণাটির পশ্চাতে উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছু নেই, তবেই খোদেজার নামে কী-একটা দুরাত্মা যে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে, তাকে কী-একটা অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—তার হাত থেকে মুক্তি পাবে।

আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করার জন্যেই সে এমনভাবে কুমুরডাঙ্গা ছেড়ে বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল।

তবে আমার যেন কী হয়েছিল, সত্য উত্তর মুখে এসেও মুখেই থেমে গিয়েছিল। কেবল বলেছিলাম,

"কী করে বলি? আমি তখন বাড়ি ছিলাম না।"

এমনভাবেই উত্তরটি দিয়েছিলাম যেন খোদেজা আত্মহত্যা করেছে তা আমি নিশ্চিতভাবে জানি, কিন্তু তা মুখ ফুটে বলা সম্ভব নয়।

কেন সত্য কথাটি বলি নি, যা একেবারে ভিত্তিহীন বলে জানতাম তা ভিত্তিহীন বলে দ্বিধাশূন্য কণ্ঠে ঘোষণা করি নি কেন? আমার মনেও কি অবশেষে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল? না, সন্দেহ নয়, মনে সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার প্রতি ভয়ানক ক্রোধ বোধ করেছিলাম; তার প্রতি কখনো এমন ক্রোধ বোধ করি নি। ক্রোধ বোধ করেছিলাম এই দেখে যে খোদেজা আত্মহত্যা করেছে তেমন একটা বিশ্বাস হলেও মুহাম্মদ মুস্তফার মনে একটু অনুতাপ নয়, মৃত মেয়েটির প্রতি ঈষৎ স্নেহমমতা নয়, সামান্য বিয়োগশোক নয়, নিদারুণ ভীতিই দেখা দিয়েছে। হয়তো তাও সহ্য হত যদি সরলা নিষ্পাপ খোদেজা তার চোখে একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ দুষ্ট আত্মায় পরিণত না হত। তা কিছুতেই সহ্য হয় নি। বোধ হয় সে-জন্যেই সত্য কথা বলা সম্ভব হয় নি।

তবু বলতাম যদি জানতাম সত্য কথা না বললে কী পরিণতি হবে, যদি বুঝতাম ইতিমধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফা একটি অতল গহ্বরের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে : যারা তেমন একটি গহ্বর থেকে বহুদূরে তারা তার অস্তিত্বের কথা ভাবতেও পারে না।

পরদিন তখনো সূর্য ওঠে নি, এমন সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফার মা আমেনা খাতুনের মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনতে পাই। তেমন একটি আর্তনাদ শুনেছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে, চাঁদরবণঘাটে : সেদিনও আমেনা খাতুনই আর্তনাদ করে উঠেছিল। আর্তনাদ শোনামাত্র বুঝতে পারি। তবে তখন আর করার কিছু ছিল না; কেউ আর কিছু করতে পারত না।

যখন বাড়ির পশ্চাতে উপস্থিত হই তখন দেখতে পাই, যে-তেঁতুলগাছের তলে বাল্যবয়সে একটি অদৃশ্য সীমারেখা পেরিয়ে গিয়েছিল সে-গাছ থেকে মুহাম্মদ মুস্তফার নিষ্প্রাণ

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দেহ ঝুলছে, চোখ খোলা। সে-চোখ শ্যাওলা-আবৃত ডোবার মতো ক্ষুদ্র পুকুরে কী-যেন সন্ধান করছে।

সহসা সচকিত হয়ে দেখি তবারক ভুইঞা উঠে পড়েছে। উঠে পড়েও কয়েক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখে অন্যমনস্ক ভাব, চোখের কোণে ক্ষীণ হাসিটি আর নেই। তারপর গা-মোড়া দিয়ে আলস্য ভেঙে সে বলে,

"নদী কি তার নিজের দুঃখে কেঁদেছিল ? নদী কেঁদেছিল তাদের দুঃখেই।"

যাত্রীদের অনেকে নিচের পথ ধরেছে। আমিও তাদের দলে ভিড়ে পড়ি।

পরে স্টিমার ঘাটে ভিড়বার জন্যে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি তখন তবারক ভুইঞার শেষোক্তিটি সহসা মনে পড়ে। কিছুক্ষণ আগে ওপরে সে বলেছিল, নদী যদি কেঁদে থাকে তবে নিজের দুঃখে নয়, কুমুরডাঙ্গার অসহায় অধিবাসীদের দুঃখেই কেঁদেছিল। হয়তো সবই সে জানে, হয়তো কথাটি বলবার সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফার কথাই সে ভেবেছিল।

স্টিমার ধীরে-ধীরে ঘাটের পাশাপাশি হয়, তার চতুষ্পার্শ্বে উচ্ছৃঙ্খল পানি শতশত হিংস্র সরীসৃপের মতো গর্জন করে। তবে সহসা আমার মনে হয় নদী যেন নিষ্ফল ক্রোধেই কাঁদছে। হয়তো নদী সর্বদা কাঁদে, বিভিন্ন কণ্ঠে, বিভিন্ন সুরে, কাঁদে সকলের জন্যেই। মনে মনে বলি : কাঁদো নদী, কাঁদো।

সমাপ্ত